এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ

শিরোনাম

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা

(Political Consciousness in Faiz Ahmad Faiz's Poetry)

গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক

ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া

অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মোছাঃ আলপনা আকতার

এম.ফিল গবেষক

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০২৩-২০২৪

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ০৩৫/ ২০২৩-২০২৪

যোগদানের তারিখ ঃ ১৪/০৮/২০২৩

উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জুলাই, ২০২৬

Dhaka University Institutional Repository

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা

(Political Consciousness in Faiz Ahmad Faiz's Poetry)

এম.ফিল অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোছাঃ আলপনা আকতার
এম.ফিল গবেষক
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০২৩-২০২৪
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ০৩৫/ ২০২৩-২০২৪
যোগদানের তারিখ ঃ ১৪/০৮/২০২৩
উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

জুলাই, ২০২৬

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ***ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা (Political Consciousness in Faiz Ahmad Faiz's Poetry)*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। এটি কোনো যুগ্মকর্ম নয় ; বরং আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য প্রণীত হয়েছে। আমি আমার এই গবেষণাকর্ম পূর্ণ বা এর অংশবিশেষ কোথাও কোনো ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

আলপনা
২১.০৭.২০২৬

(মোছাঃ আলপনা আকতার)
এম.ফিল গবেষক
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০২৩-২০২৪
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ০৩৫/ ২০২৩-২০২৪
উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

Department of Urdu
Faculty of Arts
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone: 029661900, Ext.6161(office)
www:du.ac.bd

উর্দু বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০. বাংলাদেশ।
ফোন: ০২৯৬৬১৯০০/৬১৬১(অফিস)
E-mail: urdu@du.ac.bd

Ref:

Date: 20 July 2026
০৫ শ্রাবণ ১৪৩৩

প্রত্যয়নপত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের এম.ফিল গবেষক মোছাঃ আলপনা আকতার কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত ***ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা (Political Consciousness in Faiz Ahmad Faiz's Poetry)*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় লেখা হয়েছে। এই গবেষণাকর্ম গবেষকের একক গবেষণার ফল। অন্য কেউ এর কোনো প্রকার অংশীদার নয়। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও এই শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি এবং এই গবেষণাকর্মের সামগ্রিক বা আংশিক অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

আমি অভিসন্দর্ভটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করেছি। এর মৌলিকত্ব বিচার করে গবেষককে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের অনুমতি প্রদান করছি।

20/7/2026

(ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া)
অধ্যাপক ও গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা শীর্ষক মৌলিক অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজ সম্পন্ন করতে পেরে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া। তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের নির্দেশনা ও আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ কঠিন কাজটি সম্পন্ন করা সহজ হতো না। তাই আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের আমার সম্মানিত শিক্ষক অধ্যাপক ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া, ড. মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, ড. মোঃ ইস্রাফীল, ড. রশিদ আহমদ, ড. মো: রেজাউল করিম, সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো: গোলাম মাওলা, সহযোগী অধ্যাপক জনাব হুসাইনুল বান্না ও সহকারী অধ্যাপক হাফসা আক্তার সহ আরো অনেকের কাছ থেকে পেয়েছি প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগীতা। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

এ গবেষণাকর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, উর্দু বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি ইত্যাদি ব্যবহার করেছি। এ সকল লাইব্রেরির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আমাকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানা ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তাদের সহযোগিতার ফলে বর্তমানে গবেষণাটি পূর্ণতা পেয়েছে বলে আমি মনে করি। এজন্য আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় বাবা-মা ও ভাই-বোনদের প্রতি যাদের দু'আ ও আন্তরিকতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা আমার এ কাজকে করেছে আরো বেগবান আরো শাণিত। মহান আল্লাহ পাকের কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা করছি। আমীন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষক

জুলাই, ২০২৬

Dhaka University Institutional Repository

Abstract (সার-সংক্ষেপ)

উর্দু কবিতার ইতিহাসে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ (১৯১১-১৯৮৪) এক অনন্য নাম। তিনি ছিলেন কবি, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং সমাজকর্মী। তাঁর জীবন এবং সাহিত্য একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। পাকিস্তানের স্বাধীনতার স্বপ্ন, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সবই তাঁর কবিতার প্রাণভূমি। ফয়েজ তাঁর কবিতায় প্রেম, সৌন্দর্য, প্রকৃতি ইত্যাদিকে স্থান দিয়েছেন বটে, কিন্তু এসব আবেগকেও তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ফলে তাঁর কবিতা কেবল নান্দনিক উপভোগের উপাদান নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তিরও হাতিয়ার।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জন্ম ১৯১১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। পাকিস্তানের শিয়ালকোটে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষিত এক পরিবারে তাঁর বেড়ে ওঠা। বাবার নাম সুলতান মুহাম্মদ খান, মা ফাতেমা সুলতান। মৌলভি ইবরাহিম মিরের হাতে মক্তব থেকে শুরু ফয়েজের লেখাপড়া। এরপর স্কচ মিশন স্কুল, শিয়ালকোট ম্যারি কলেজ, লাহোর সরকারি কলেজ, লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজ ইত্যাদিতে ফয়েজের পড়াশোনা। উর্দুর পাশাপাশি ফারসি, আরবি, ইংরেজি ভাষায় ছিল তার সাবলীল দক্ষতা। ১৯ বছর বয়সে বিয়ে করেন ব্রিটিশ তরুণী এলিসকে। অমৃতসর এমএও কলেজে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৩৫ সালে। এরপর যান লাহোর হ্যালি কলেজে। সাহিত্যিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত থেকেছেন বরাবরই। ১৯৩৬ সালে যোগ দেন লেখক সংঘে, হন পাঞ্জাবের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৩৯ সালে সমগ্র ভারতে পাশ্চাত্যের অনুকরণে কাব্য-সাহিত্যে যে প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারা প্রবাহিত হয় ফয়েজ ছিলেন এই আন্দোলনের একজন অগ্রপথিক। ১৯৪২ সালে শুরু করেন সৈনিক জীবন। ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আর্মির উচ্চপদে হন আসীন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ত্যাগ করে লাহোরে এসে শুরু করেন সাংবাদিকতা। পাকিস্তান টাইমসের হন প্রধান সম্পাদক। এছাড়াও তিনি যুক্ত হন দৈনিক, সাপ্তাহিক বিভিন্ন পত্রিকার সাথে। ১৯৫৮ সালে আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের হন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সাংবাদিকতার পাশাপাশি রাজনীতিতেও হন সক্রিয়। ছিলেন পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়নের সহকারী প্রধান। প্রতিবাদী ও লড়াকু ভূমিকার জন্য কারাগারে কাটাতে হয় কয়েকবার। ১৯৫১ সালে কবিতার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে হন অভিযুক্ত। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সাল এবং ১৯৫৮ সালে তাকে খাটতে হয়েছে জেল। ১৯৫৯ সালে সম্পাদক হন পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলের। ১৯৬২ সালে ভূষিত হন লেনিন শান্তি পুরস্কারে । সাংবাদিকতা ছেড়ে করাচির আবদুল্লাহ হারুন কলেজের অধ্যক্ষ হন ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধকালে যোগ দেন পাকিস্তান তথ্য অধিদফতরে। ১৯৮৪ সালের ১০ নভেম্বর এ মহান কবি প্রিয় জন্মভূমি লাহোরে চিরনিদ্রায় শায়িত হন। মৃত্যু অবধি তিনি সর্বদা শাসকদের বৈরিতার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

থেকেছেন। কোনো জনবিরোধী সরকারই তাকে শেষ পর্যন্ত সুনজরে দেখতে পারেনি। শোষক ব্যবস্থা ও গণবিরোধী শাসকদের সাথে তার অব্যাহত লড়াইয়ের রাজসাক্ষী তাঁর বহু কবিতা।

রাজনৈতিক চেতনা বলতে সাধারণত সেই সচেতনতাকে বোঝায় যা মানুষকে সামাজিক ব্যবস্থার অবিচার, শোষণ, শ্রেণী বৈষম্য, এবং ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে সজাগ করে। সাহিত্যে রাজনৈতিক চেতনা শুধু রাজনৈতিক ঘটনা বর্ণনা করে না, বরং সেই ঘটনাগুলির মূলে থাকা কাঠামোগত অবিচার ও মানব মর্যাদার হননের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে প্রকাশ পায়। ফয়েজের কবিতায় এই চেতনা এক অনন্য কাব্যিক রূপ নেয়। তিনি কখনও সরাসরি রাজনৈতিক স্লোগান ব্যবহার করেননি, কখনও কঠোর রাজনৈতিক ভাষাও ব্যবহার করেননি। বরং কাব্যের ভাষায়, প্রতীকের মাধ্যমে, এবং মানব অনুভূতির গভীরতায় রাজনৈতিক বার্তা প্রচার করেছেন।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ছিলেন রাজনীতি সচেতন কবি। সমকালীন রাজনীতির বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ তাঁর মনোজগতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল যা তাকে রাজনীতি সচেতন হতে সহায়তা করেছিল। ফলে রাজনীতি ফয়েজের কবিতায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ফয়েজের রাজনীতি নির্ভর কবিতা পাঠ করলে তার রাজনীতি সচেতনতার উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়। তিনি চেয়েছিলেন সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য দূর হয়ে মানবতার জয় হউক এবং মানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হউক। বিশ্বব্যাপি চলমান অরাজকতা, অনাচার, শোষণ, বৈষম্য ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণে ফয়েজ আহমদের ফয়েজের কবিতা আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তাঁর এই সকল কবিতা জন্ম দেবে মানুষের মধ্যে মনুষত্ব্যবোধের এবং সহায়তা করবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষকে বেঁচে থাকার শক্তি যোগাতে।

মার্কসবাদে বিশ্বাসী কবি ফয়েজ পাকিস্তানের নিজস্ব ধ্রুপদি আবহে যোগ করেন পশ্চিমা আধুনিকতা। তৈরি করেন উর্দু কবিতার নতুন আঙ্গিক ও নতুন সুর। তাঁর কবিতা প্রথম পর্যায়ে রোমান্টিকতার জগতে ডুবে থাকলেও পরবর্তিতে যুক্ত হয়েছে বাস্তব জগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাত। গযল থেকে বেরিয়ে তিনি একটি প্রগতিশীল ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং বিশ্ব জগতের সার্বজনীন সুরের সাথে নিজের সুর মিলিয়ে দেন। এ সময় তার কবিতায় ফুটে উঠে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা বিষয়। রাজনৈতিক চেতনায় ভাস্বর ফয়েজের কবিতাগুলো তাঁর কাব্যজগতকে যেমন আলোকিত করেছে তেমনি আসীন করেছে উচ্চ আসনে।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের নাম বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন, বিশ্বশান্তির সপক্ষের আন্দোলনে দারুণভাবে যুক্ত। চার দশকের অধিককাল তিনি উর্দু কাব্যচর্চার প্রতিটি মুহূর্তে বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আফ্রো-এশীয় মানুষের মুক্তি ও শান্তির সপক্ষে সংগ্রাম করে গেছেন। জেল খেটেছেন, দেশত্যাগী হয়েছেন কিন্তু নিজের সংকল্প ও আদর্শ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন ধ্বনিত হয়েছে মানব প্রেমের

Dhaka University Institutional Repository

সুর অন্যদিকে ধ্বনিত হয়েছে দ্রোহের সুর। তিনি সবসময় সামগ্রিকভাবে মানব কল্যাণের প্রত্যাশি ছিলেন। নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের পক্ষে ছিল তাঁর জোরালো কণ্ঠস্বর। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণীবৈষম্য এবং দেশে দেশে গৃহযুদ্ধ- এ সবকিছুর বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। সমতা ভিত্তিক সত্য সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। এ সমস্ত ভাবনা ও কল্পনাগুলো ফয়েজ তাঁর কর্মে ও কবিতায় ব্যাপকভাবে প্রকাশ করে গেছেন।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ছিলেন নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর এবং দ্রোহের প্রতীক। তার কবিতায় রাজনীতি কোনো আলাদা অনুষঙ্গ নয়, বরং তার শিল্পসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি রোমান্টিকতাকে বিপ্লবের সাথে এমনভাবে মিশিয়েছেন যে, তার বিরহগাথাগুলো শেষ পর্যন্ত গণমানুষের অধিকারের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা শীর্ষক অভিসন্দর্ভে চারটি অধ্যায় রয়েছে। যেমন- প্রথম অধ্যায় : ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জীবন-কথা, দ্বিতীয় অধ্যায় : ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ. তৃতীয় অধ্যায় : ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চিত্র এবং চতুর্থ অধ্যায় : ফয়েজের সমকালীন কয়েকজন উর্দু কবি-সাহিত্যিক।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জন্ম ও বংশ পরিচয়, শিক্ষা জীবন, কর্মজীবন, সাংবাদিক জীবন, প্রগতিশীল লেখক সংঘে যোগদান, সৈনিক জীবন, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান, বৈবাহিক জীবন, কারাগারের জীবন, আফ্রো-এশিয় লেখক সংঘে যোগদান, সাহিত্যে ক্যারিয়ার, ফয়েজের কাব্য সাধনা, গদ্য চর্চা, মৃত্যু ইত্যাদিসহ জীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ আলোচনা করা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়টি। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ জন্মগ্রহণ করেন (খ্রি. ১৯১১) ইতিহাসের এমন এক ক্রান্তিলগ্নে যখন উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল পরিবর্তনশীল ও আন্দোলন মুখর। রাজনৈতিক সংকটের এহেন পরিস্থিতিতে গড়ে উঠেছিল ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জাতীয় মানস। এই পরিবেশই ছিল তাঁর চিন্তাধারা গঠনের মৌলিক ও প্রারম্ভিক পটভূমি। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর মানসিক অভিযাত্রা। মানুষ পারিপার্শ্বিকতার উর্ধে নয় ; কম বেশি প্রত্যেকটি মানুষ আপন পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফয়েজ আহমদ ফয়েজের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগ ঃ ব্রিটিশ শাসন অর্থাৎ স্বাধীনতাপূর্ব সময়কাল ১৯০০-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগ ঃ স্বাধীনতাউত্তর সময়কাল ১৯৪৭-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত। স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা উত্তর বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলী যেমন- ব্রিটিশ শাসন, বঙ্গভঙ্গ, মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

লীগ প্রতিষ্ঠা, মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন, বঙ্গভঙ্গ রদ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, লক্ষ্ণৌ চুক্তি, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, বেঙ্গল প্যাক্ট, সাইমন কমিশন, ভারত শাসন আইন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, লাহোর প্রস্তাব, দেশভাগ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, প্রাদেশিক নির্বাচন, সামরিক শাসন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি, জেনারেল জিয়া-উল-হকের শাসনামল প্রভৃতি নানা বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায় হল ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চিত্র। ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জ্বল। তিনি প্রেমকে রূপান্তরিত করেছেন সামাজিক চেতনায়, দেশপ্রেমকে পরিণত করেছেন সংগ্রামের মন্ত্রে, আর স্বাধীনতাকে করেছেন ন্যায়বিচারের প্রতীকে। তাঁর কবিতা মানুষের অন্তরকে নাড়া দেয়, সংগ্রামে উজ্জীবিত করে এবং ন্যায়বিচারের জন্য লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত করে। তাই তাঁর কবিতা কেবল সাহিত্য ইতিহাসেরই নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসেরও অমূল্য সম্পদ। ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চিত্রের মূলে বেশ কিছু উৎস ছিল। সে উৎসগুলো তাকে একজন রাজনৈতিক সচেতন বিপ্লবী কবি হতে বাধ্য করেছিল। ফয়েজের রাজনৈতিক চিত্রের উৎসগুলো এবং তাঁর কবিতায় এর প্রভাব ও প্রতিফলন এক এক করে দেখানো হয়েছে এই অধ্যায়ে।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ফয়েজ আহমদের সমকাল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম, দেশভাগ, নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থান, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা, সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ। এগুলো ব্যক্তি ও সমাজের পাশপাশি সাহিত্যকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই পরিবর্তনশীল সময়ে উর্দু কবিতা ও গদ্যসাহিত্য কেবল নান্দনিক চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং সমাজবাস্তবতা, মানবমুক্তি, শ্রেণিসংগ্রাম, প্রেম, বেদনা, নির্বাসন, স্বাধীনতা ও প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছিল। ফলে আধুনিক উর্দু সাহিত্যে এমন এক প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে, যাঁদের সাহিত্যকর্মে একই সঙ্গে রোমান্টিকতা, বাস্তববোধ, মানবতাবাদ এবং বিপ্লবী চেতনার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

এই প্রেক্ষাপটে উর্দু সাহিত্যে গড়ে উঠে প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন। এটি উর্দু সাহিত্যে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। ১৯৩৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলন সাহিত্যকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে এবং লেখক ও কবিদের মধ্যে একটি নতুন আদর্শিক চেতনার সঞ্চার ঘটায়। এর প্রভাবে সাহিত্যিকেরা মানুষের জীবনসংগ্রাম, দারিদ্র্য, শোষণ, বৈষম্য এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তাঁদের সৃষ্টির কেন্দ্রে স্থান দেন। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ একটি উজ্জ্বল ও প্রভাবশালী নাম হলেও তিনি একক কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিভা ছিলেন না; বরং তাঁর চারপাশে এমন এক শক্তিশালী সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল যারা তাঁদের স্বতন্ত্র সৃজনশীলতা ও চিন্তাধারার মাধ্যমে উর্দু সাহিত্যের ভাণ্ডারকে

Dhaka University Institutional Repository

সমৃদ্ধ করেছেন। ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সমকালীন উর্দু কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ শুধু একজন কবি নন, বরং একজন চিন্তাবিদ, মানবতাবাদী, সামাজিক ন্যায়বিচারের সংগ্রামী এবং রাজনৈতিক চেতনার প্রতীক। তাঁর কবিতা শুধু ভাব ও ভাষার সৌন্দর্যে সীমাবদ্ধ নয় ; বরং তা সমাজের অবিচার, শোষণ, অসাম্য এবং মানব মর্যাদার লড়াইয়ের প্রতিধ্বনি। তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা এমন এক গভীর স্তরে প্রবেশ করেছে যে, তাঁর কবিতাগুলি শুধু সাহিত্য নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা **১-৩**

প্রথম অধ্যায় **৪-৪৮**

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জীবন-কথা

দ্বিতীয় অধ্যায় **৪৯-৭৪**

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

তৃতীয় অধ্যায় **৭৫-১০৯**

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চিত্র

চতুর্থ অধ্যায় **১১০-১৪৫**

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সমকালীন কয়েকজন উর্দু কবি-সাহিত্যিক

উপসংহার **১৪৬**

পরিশিষ্ট **১৪৭-১৫১**

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও পত্র-পত্রিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

উর্দু কবিতার ইতিহাসে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ (১৯১১-১৯৮৪) এক অনন্য নাম। তিনি ছিলেন কবি, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং সমাজকর্মী। তাঁর জীবন এবং সাহিত্য একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। পাকিস্তানের স্বাধীনতার স্বপ্ন, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সবই তাঁর কবিতার প্রাণভূমি। ফয়েজ তাঁর কবিতায় প্রেম, সৌন্দর্য, প্রকৃতি ইত্যাদিকে স্থান দিয়েছেন বটে, কিন্তু এসব আবেগকেও তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ফলে তাঁর কবিতা কেবল নান্দনিক উপভোগের উপাদান নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তিরও হাতিয়ার।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জন্ম ১৯১১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। পাকিস্তানের শিয়ালকোটে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষিত এক পরিবারে তাঁর বেড়ে ওঠা। বাবার নাম সুলতান মুহাম্মদ খান, মা ফাতেমা সুলতান। মৌলভি ইবরাহিম মিরের হাতে মক্তব থেকে শুরু ফয়েজের লেখাপড়া। এরপর স্কচ মিশন স্কুল, শিয়ালকোট ম্যারি কলেজ, লাহোর সরকারি কলেজ, লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজ ইত্যাদিতে ফয়েজের পড়াশোনা। উর্দুর পাশাপাশি ফারসি, আরবি, ইংরেজি ভাষায় ছিল তার সাবলীল দক্ষতা। ১৯ বছর বয়সে বিয়ে করেন ব্রিটিশ তরুণী এলিসকে। অমৃতসর এমএও কলেজে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৩৫ সালে। এরপর যান লাহোর হ্যালি কলেজে। সাহিত্যিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত থেকেছেন বরাবরই। ১৯৩৬ সালে যোগ দেন লেখক সংঘে, হন পাঞ্জাবের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৩৯ সালে সমগ্র ভারতে পাশ্চাত্যের অনুকরণে কাব্য-সাহিত্যে যে প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারা প্রবাহিত হয় ফয়েজ ছিলেন এই আন্দোলনের একজন অগ্রপথিক। ১৯৪২ সালে শুরু করেন সৈনিক জীবন। ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আর্মির উচ্চপদে হন আসীন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ত্যাগ করে লাহোরে এসে শুরু করেন সাংবাদিকতা। পাকিস্তান টাইমসের হন প্রধান সম্পাদক। এছাড়াও তিনি যুক্ত হন দৈনিক, সাপ্তাহিক বিভিন্ন পত্রিকার সাথে । ১৯৫৮ সালে আফ্রো-এশীয় লেখক সঙ্ঘের হন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সাংবাদিকতার পাশাপাশি রাজনীতিতেও হন সক্রিয়। ছিলেন পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়নের সহকারী প্রধান। প্রতিবাদী ও লড়াকু ভূমিকার জন্য কারাগারে কাটাতে হয় কয়েকবার। ১৯৫১ সালে কবিতার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে হন অভিযুক্ত। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সাল এবং ১৯৫৮ সালে তাকে খাটতে হয়েছে জেল। ১৯৫৯ সালে সম্পাদক হন পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলের। ১৯৬২ সালে ভূষিত হন লেনিন শান্তি পুরস্কারে । সাংবাদিকতা ছেড়ে করাচির আবদুল্লাহ হারুন কলেজের অধ্যক্ষ হন ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধকালে যোগ দেন পাকিস্তান তথ্য অধিদফতরে। ১৯৮৪ সালের ১০ নভেম্বর এ মহান কবি প্রিয় জন্মভূমি লাহোরে চিরনিদ্রায় শায়িত হন। মৃত্যু অবধি তিনি সর্বদা শাসকদের বৈরিতার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

থেকেছেন। কোনো জনবিরোধী সরকারই তাকে শেষ পর্যন্ত সুনজরে দেখতে পারেনি। শোষক ব্যবস্থা ও গণবিরোধী শাসকদের সাথে তার অব্যাহত লড়াইয়ের রাজসাক্ষী তাঁর বহু কবিতা।

মার্কসবাদে বিশ্বাসী কবি ফয়েজ পাকিস্তানের নিজস্ব ধ্রুপদি আবহে যোগ করেন পশ্চিমা আধুনিকতা। তৈরি করেন উর্দু কবিতার নতুন আঙ্গিক ও নতুন সুর। তাঁর কবিতা প্রথম পর্যায়ে রোমান্টিকতার জগতে ডুবে থাকলেও পরবর্তিতে যুক্ত হয়েছে বাস্তব জগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাত। গযল থেকে বেরিয়ে তিনি একটি প্রগতিশীল ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং বিশ্ব জগতের সার্বজনীন সুরের সাথে নিজের সুর মিলিয়ে দেন। এ সময় তার কবিতায় ফুটে উঠে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা বিষয়। রাজনৈতিক চেতনায় ভাস্বর ফয়েজের কবিতাগুলো তাঁর কাব্যজগতকে যেমন আলোকিত করেছে তেমনি আসীন করেছে উচ্চ আসনে।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ছিলেন রাজনীতি সচেতন কবি। সমকালীন রাজনীতির বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ তাঁর মনোজগতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল যা তাকে রাজনীতি সচেতন হতে সহায়তা করেছিল। ফলে রাজনীতি ফয়েজের কবিতায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ফয়েজের রাজনীতি নির্ভর কবিতা পাঠ করলে তার রাজনীতি সচেতনতার উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়। তিনি চেয়েছিলেন সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য দূর হয়ে মানবতার জয় হউক এবং মানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হউক। বর্তমান বিশ্বব্যাপি চলমান অরাজকতা, অনাচার, শোষণ, বৈষম্য ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণে ফয়েজ আহমদের ফয়েজের কবিতা আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তাঁর এই সকল কবিতা জন্ম দেবে মানুষের মধ্যে মনুষত্ব্যবোধের এবং সহায়তা করবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষকে বেঁচে থাকার শক্তি যোগাতে।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত । যেমন-

প্রথম অধ্যায় : ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জীবন-কথা। এই অধ্যায়ে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের নানাবিধ ঘটনাপ্রবাহ আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। স্বাধীনতাপূর্ব এবং স্বাধীনতাউত্তর ভারতীয় উপমহাদেশে ঘটমান উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায় : ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চিত্র। ফয়েজের রাজনৈতিক চিত্রের উৎসগুলো এবং তাঁর কবিতায় এর প্রভাব ও প্রতিফলন এক এক করে দেখানো হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায় : ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সমকালীন কয়েকজন উর্দু কবি-সাহিত্যিক। এই অধ্যায়ে ফয়েজের সমকালীন উর্দু কবি-সাহিত্যিক যেমন -সাহির লুধিয়ানভি, জোশ মালিহাবাদী, মজরূহ সুলতানপুরী, কাইফি আজমি,

Dhaka University Institutional Repository

এহসান দানিশ, ফিরাক গোরখপুরী, কৃষণ চন্দর, রাজেন্দর সিং বেদী, সাদাত হাসান মান্টো, ইসমত চুগতাই প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সৃজনশীলতা ও চিন্তাধারা আলোচনা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটির পরিশিষ্টে রয়েছে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নাম।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ রচিত বিভিন্ন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ অনুশীলন, বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত্বের ভিত্তিতে, বিষয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ফয়েজ আহমদ ফয়েজ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন লেখক ও সমালোচকদের গ্রন্থসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত্ব সংগ্রহ করে গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে।

এ গবেষণাকর্মের দ্বারা পাঠক, গবেষক ও সুধীমহল, বিশেষকরে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থীগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন বলে আমি মনি করি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জীবন-কথা

পৃথিবীতে প্রতি যুগে, প্রতি কালে এমন কিছু মনীষীর জন্ম হয়েছে যারা তাদের সৃষ্টিশীল কর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রকে আলোকিত করেছেন তাদেরই একজন ফয়েজ আহমদ ফয়েজ। তিনি বহুমাত্রিক প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো তিনি একজন কবি, একজন মানব দরদী। তিনি তাঁর কবিতা ও গণমুখী কার্যাবলীর মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা, স্বাধীকার আন্দোলন, জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অসামান্য অবদান রেখে অমর হয়ে আছেন। সে সব নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আলোচ্য অধ্যায়ে উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো।

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট জেলার নারোয়াল থেকে প্রায় আট মাইল দূরে কালা কাদের গ্রাম। এটি ছিল খুব সাধারণ, ছোট একটি গ্রাম। এখানে জাত কৃষকদের একটি ছোট জমিদার শ্রেণী বাস করত, যারা তাতালি নামে পরিচিত ছিল। তারা নিজেদের চৌধুরী নামে সম্বোধন করত। এই গ্রামেই ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ১৯১১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পারিবারিক নাম ছিল চৌধুরী ফয়েজ আহমেদ। 'ফয়েজ' ছিল তাঁর কবিনাম। তাঁর বাবার নাম ছিল চৌধুরী সুলতান মুহাম্মদ খান। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং পাকিস্তানের জাতীয় কবি আল্লামা ইকবাল সহ একটি অভিজাত সাহিত্যিক মহলের সদস্য। সুলতান মুহাম্মদ খানের আরবি, ফার্সী, উর্দু এবং ইংরেজি ভাষাজ্ঞান ছিল। যুবা বয়সে আফগান চলে যান। সেখানে পূর্ব পরিচিত আফগান রাজসভার এক সদস্যের সহায়তায় আফগান রাজসভায় চাকুরি লাভ করেন। আফগান বাদশাহ হাবিবুল্লাহ খান তাঁর ভাষাজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে তাকে ব্যক্তিগত দোভাষী নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর আফগান রাজার অনুমতি নিয়ে লন্ডনে চলে যান। সেখানে তিনি আইন পেশায় উচ্চতর ডিগ্রি নেন এবং ব্যারিস্টারি সনদ লাভ করেন। এরপর তিনি লন্ডন থেকে ভারতে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি আইন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন এবং রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর মা ছিলেন সুলতান ফাতিমা। বাবা মায়ের খুর আদরের সন্তান ছিলেন ফয়েজ। কিন্তু তিনি শিশু বয়সেই পিতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। ১৯১৩ সালে তাঁর মাত্র দুই বছর বয়সেই তাঁর বাবার অকাল মৃত্যু ঘটে। পিতার মৃত্যুর পর এক চাচার তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত-পালিত হন।

শিক্ষা জীবন :

মুসলিম পারিবারিক ঐতিহ্যের আলোকে ফয়েজের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। ১৯১৫ সালে স্থানীয় দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মৌলভী ইব্রাহিম শিয়ালকোটিতে তাকে ভর্তি করে দেয়া হয়। সেসসময় দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটির বেশ সুনাম ছিল। ফয়েজ এখানে আরবি, ফার্সী , উর্দু, এবং কোরআন শরীফ অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি কোরআন শরীফ মুখস্ত করা শুরু করেন। কিন্তু শেষ করতে পারেননি। যেটি পরবর্তী সময়ে তাকে বেশ অনুশোচনায় ভুগিয়েছিল। ১৯২১ সালে কালা কাদের গ্রাম থেকে ফয়েজ শিয়ালকোটে চলে আসেন। এখানে তিনি বিখ্যাত মিশনারী স্কুল স্কচ্ মিশন হাই স্কুলে (Scotch Mission High School) চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯২৭ সালে এখান থেকে তিনি মেট্রিক্যুলেশন এবং ১৯২৯ সালে শিয়ালকোট ম্যারি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট উত্তীর্ণ হন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ১৯৩২ সালে লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে আরবিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৩৩ সালে একই কলেজ থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৩৪ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে আরবি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ফয়েজ তাঁর শিক্ষাজীবনে শামছুল উলামা প্রফেসর মীর হাসান, প্রফেসর ইউসুফ সেলিম চিস্তি, প্রফেসর পিত্তিরাস বুখারী, উর্দু কবি প্রফেসর সুফি গোলাম মোস্তফা তাবাসসুম, ইমতিয়াজ আলী তাজ, চিরাগ হাসান হাশরাত, হাফিজ জালান্ধারি, আখতার শিরানী প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের সহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। ফয়েজ যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য বৃত্তিও পেয়েছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে তিনি তা অর্জন করতে পারেননি। তা সত্ত্বেও, তিনি উর্দু, ইংরেজি, আরবি এবং ফারসি সহ বেশ কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ফয়েজ সারা জীবন তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা অব্যাহত রেখেছিলেন। ফয়েজের দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[২]

কর্মজীবন :

ফয়েজের কর্মজীবন শুরু হয় অধ্যাপনা দিয়ে। ১৯৩৫ সালে অমৃতসর এমএও কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের লেকচারার হিসেবে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৪০ সালে লাহোর হেইলি কলেজ অব কমার্সে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলের সম্পাদক নিযুক্ত হন । ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৪ সালে লন্ডন থেকে করাচি ফিরে আসে আবদুল্লাহ হারুন কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে যোগ দেন পাকিস্তান তথ্য অধিদফতরে। ১৯৭২ সালে তিনি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো সরকারের মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। সেসময় তিনি সংস্কৃত মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে ভুট্টো সরকারকে উৎখাত করে জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানের রাষ্ট্রভার গ্রহণ করে সামরিক শাসন জারি করেন। ফয়েজ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেন। ফলে রাষ্ট্রীয় বাহিনী তাকে সর্বদা নজরবন্দী করে রাখে। সেখান থেকে পালিয়ে তিনি লেবাননের রাজধানী বৈরুতে চলে যান। বোঝাই যাচ্ছে, এক অস্থির স্থান বদলের মধ্য দিয়ে গেছে ফয়েজের জীবন। এটা হয়েছে তার মানসিকতার কারণে। কোনো কিছুই তাকে তৃপ্ত করতে পারছিল না। দিতে পারছিল না স্বস্তি।

সাংবাদিক জীবন :

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের বর্ণাঢ্য জীবনে সাংবাদিকতা একটি উজ্জ্বল দিক। সাংবাদিক হিসেবে তিনি বেশ সফলতার পরিচয় দেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূচনা ঘটে। এ সময় তিনি সাহিত্য বিষয়ক মাসিক উর্দু পত্রিকা 'আদব-এ-লতিফ'-এ যোগদান করেন। এ পত্রিকার তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি এ পত্রিকার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। দেশভাগের পর ১৯৪৭ সালে তিনি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'পাকিস্তান টাইমস'-এ যোগদান করেন। তিনি এ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি এ পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। এ সময়ে তিনি উর্দু দৈনিক পত্রিকা 'ইমরোজ' এবং উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা 'লাইল ওয়া নাহার'-এও সুনামের সাথে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সালে জেনারেল জিয়াউল হকের সামরিক শাসনের সময় তিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে লেবাননে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি আফ্রো-এশিয় লেখক সংঘের ইংরেজি সাহিত্য সাময়িকী 'লোটাস'-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রগতিশীল লেখক সংঘে যোগদান :

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে প্রগতিশীল লেখক আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের সূচনা করে। ১৯৩০-এর দশকে ঔপনিবেশিক শাসন, সামাজিক বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক শোষণের প্রেক্ষাপটে এই আন্দোলনের জন্ম হয়। ১৯৩৬ সালে সর্বভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সংঘ (All India Progressive Writers' Association) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল সাহিত্যকে জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করা এবং সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা।

প্রগতিশীল লেখক সংঘের আদর্শ ছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত, যেখানে শ্রেণি-সংগ্রাম, সাম্য, ন্যায়বিচার এবং মানবমুক্তির কথা গুরুত্ব পায়। তারা ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, সামন্তবাদ এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। সাহিত্যকে তারা এমন এক শক্তি হিসেবে দেখতেন যা মানুষের চেতনা জাগ্রত করতে পারে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে পারে। এই আন্দোলনের ফলে উর্দু সাহিত্যে নতুন বিষয়বস্তু ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়, যেখানে শ্রমিক, কৃষক, নিপীড়িত মানুষদের জীবন উঠে আসে সাহিত্যের কেন্দ্রে।

সাজ্জাদ জহির, মোহাম্মদ আলী, মুলক রাজ, রশিদ জাহান, মাহমুদুজ্জাফর প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তারা বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য কেবল রোমান্টিক কল্পনা নয়, বরং তা হতে হবে শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর। তাদের প্রভাবে ফয়েজ এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। নিজেকে সর্বভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সংঘের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে প্রকাশ করেন।

ড. নুসরাত চৌধুরী ফয়েজের মতো একজন সক্রিয় কর্মী সম্পর্কে লিখেছেন :

> فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے صف اول میں شامل ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے ان کی نظریاتی ہم آہنگی بنیادی طور پر سیاسی مصلحتوں کے تاج نہیں تھی بلکہ وہ ایک اندورنی جوش اور خلوص کی بناء پر اس سے وابستہ ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات میں نظریاتی کٹرپن نہیں ملتا جیسا کہ دیگر ترقی پسندوں کے یہاں ملتا ہے۔[৩]

(ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ অন্যতম প্রধান প্রগতিশীলদের একজন। প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর আদর্শগত সংযোগ মূলত রাজনৈতিক সুবিধা দ্বারা চালিত ছিল না, বরং তিনি এক অন্তরের আবেগ ও আন্তরিকতা থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁর রচনায় অন্যান্য প্রগতিশীলদের মতো আদর্শগত গোঁড়ামি নেই।)

প্রগতিশীল লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ফয়েজকে নানা সময় রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার হতে হয়। বিভিন্ন সময়ে তাকে কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু কারাবাস তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি; বরং তাঁর কবিতায় আরও গভীরতা ও মানবিকতা যুক্ত হয়। কারাগারে বসেই তিনি বহু স্মরণীয় কবিতা রচনা করেন, যেখানে ব্যক্তিগত বেদনা ও সামাজিক সংগ্রাম একসূত্রে গাঁথা।

সৈনিক জীবন :

১৯৪১ সালে জার্মানী সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করলে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তার তীব্র বিরোধিতা করে। এ দলের প্রভাবে অনেক ভারতীয় যুবক ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয় এবং রাজকীয় বাহিনীর সদস্য হিসেবে যুদ্ধে অংশ নেয়। ফয়েজও একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৪২ সালে শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন পদে যোগ দেন। তাঁর কাজ ছিল মূলত প্রচারণামূলক। ১৯৪৩ সালে মেজর পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশরাজ তাঁকে মেম্বার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার (MBE) পদকে ভূষিত করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর কর্ণেল পদমর্যাদা নিয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন ফয়েজ।[৪]

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য :

ব্রিটিশ ভারতের শেষ পর্যায় এবং দেশভাগের পরপরই উপমহাদেশে বামপন্থী চিন্তাধারার বিস্তার ঘটে। সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানে নিষিদ্ধ ছিল। ফলে তারা গোপনে তাদের কার্যক্রম চালাত। এই প্রেক্ষাপটে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সরাসরি ও পরোক্ষভাবে এর সঙ্গে যুক্ত হন। ফয়েজ তাদের আদর্শ বিশেষ করে সাম্য, শোষণমুক্ত সমাজ এবং শ্রমিকের অধিকার সমর্থন করেন। তাঁর কবিতায় এই আদর্শ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে তিনি কেবল ব্যক্তিগত প্রেম নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচারের কথাও বলেছেন।

অমৃতসরে কলেজে পাঠদানকালীন সময়ে ফয়েজের সাথে এম এন রায় এবং মুজাফফর আহমদের পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, সম্পর্কটা বন্ধুতে রূপ নেয়। তিনি তাঁদের প্ররোচনায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এই দিকে ইঙ্গিত করে উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে-

> It was during his college years that M.N.Roy and Muzaffar Ahmed Who influenced him to become a member of the Communist Party. Faiz was a not a hardcore or far-left cummunist, he spent most of the 1950s and 1960s promoting the cause of communism in Pakistan. Faiz was a well-known communist in the country and had been long associated with the Communist Party of Pakistan.[৫]
>
> (কলেজ জীবনেই এম. এন. রায় এবং মুজাফফর আহমেদ তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে প্রভাবিত করেছিলেন। ফয়েজ একজন কট্টর বা উগ্র-বামপন্থী কমিউনিস্ট ছিলেন না। তিনি ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের বেশিরভাগ সময় পাকিস্তানে কমিউনিজমের প্রসারে ব্যয় করেন। ফয়েজ দেশের একজন সুপরিচিত কমিউনিস্ট ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।)

জাভেদ আখতার তাঁর এক নিবন্ধে বলেন :

> فیض کے نقطۂ نظر میں اس وقت ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی جب وہ 1934ء میں مارکسزم سے روشناس ہوا۔اور یہ نظریاتی تقلیب صاحب زادہ محمود الظفر اور اس کی بیوی ڈاکٹر رشید جہاں کی سنگت میں ہوئی۔1934ء میں فیض احمد فیض، جب ایم اے او کالج امرت سر میں انگریزی کا لیکچرار مقرر ہوا تو اس کی ملاقات وہاں صاحب زادہ محمود الظفر اور اس کی بیوی رشید جہاں سے ہوئی۔ انہوں نے اُسے ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی، انجمن ترقی پسند مصنفین مارکسزم، مارکسی تنقید اور مارکسی شعراءو ادباء سے متعارف کرایا۔ جن سے اس کے فکر و شخصیت میں ایک انقلاب برپا ہو گیا اور اس کا تصوریت پسند و رومانویت پسند نقطہ نظر یکسر تبدیل ہو کر مارکسی نقطہ نظر بن گیا۔اس نے
>
> ترقی پسند مصنفین کی تحریک، انڈین کمیونسٹ پارٹی اور مزدور ٹریڈ یونین تحریک سے خود کو وابستہ کیا۔[৬]
>
> (১৯৩৪ সালে মার্কসবাদের সাথে পরিচিত হওয়ার পর ফয়েজের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বড় পরিবর্তন আসে। এই আদর্শগত রূপান্তর ঘটেছিল সাহেবজাদা মাহমুদ-উল-জাফর এবং তাঁর স্ত্রী ড. রশিদ জাহানের সান্নিধ্যে। ১৯৩৪ সালে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ অমৃতসরের এমএও কলেজে ইংরেজির প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হলে, সেখানেই তাঁর সঙ্গে সাহেবজাদা মাহমুদ-উল-জাফর এবং তাঁর স্ত্রী রশিদ জাহানের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা তাঁকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, প্রগতিশীল লেখক সমিতি, মার্কসবাদ, মার্কসবাদী

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনা এবং মার্কসবাদী কবি ও লেখকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এটি তাঁর চিন্তা ও ব্যক্তিত্বে এক বিপ্লব নিয়ে আসে এবং তাঁর ভাববাদী ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে একটি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তিত হয়। তিনি প্রগতিশীল লেখক আন্দোলন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন।)

ফয়েজ এক চিঠিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন সম্পর্কে নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করেছেন :

ایک دن صاحب زادہ محمود الظفر نے ایک پتلی سی کتاب میرے حوالے کی اور کہا، "یہ پڑھو لیکن غیر قانونی کتاب ہے۔ اس لیے ذرا احتیاط سے رکھنا"۔ یہ کتاب تھی کمیونسٹ مینی فسٹو، جو میں نے ایک ہی نشست میں پڑھ ڈالی۔ انسان اور فطرت، فرد اور معاشرہ، اور طبقات، طبقے اور پیداواری رشتے، اور معاشرے کا ارتقاء، انسانوں کی دنیا کے پیچدر پیچ اور تہ در تہ رشتے اتے، قدریں، اور ذرائع پیداوار کی تقسیم عقیدے، فکر و عمل وغیرہ کے بارے میں یوں محسوس ہوا کہ کسی نے پورے خزانہ اسرار کی کنجی ہاتھ میں تھمادی ہے۔ یوں سوشلزم اور مارکسزم میں اپنی دلچسپی کی ابتدا ہوئی۔ پھر لینن کی کتابیں پڑھیں۔ پھر سوویت معاشرے کے بارے میں دوسرے انقلابی ادیبوں کی کتابیں پڑھ ڈالیں۔ اسی زمانے میں ہندوستانی ترقی پسند مصنفین کی انجمن قائم ہوئی۔ یہ سب پڑھ کے ہم نے اس دوسری تصویر میں رنگ بھرنا شروع کیا۔[৯]

(একদিন সাহেবজাদা মাহমুদ-উল-জাফর আমার হাতে একটি পাতলা বই তুলে দিয়ে বললেন, "এটা পড়ো, কিন্তু এটা একটি অবৈধ বই। তাই এটা সাবধানে রেখো।" এই বইটি ছিল কমিউনিস্ট ইশতেহার, যা আমি এক বসায় পড়ে শেষ করেছিলাম। মানুষ ও প্রকৃতি, ব্যক্তি ও সমাজ, শ্রেণি এবং উৎপাদনের উপকরণের বণ্টন ও উৎপাদনের সম্পর্ক, সমাজের উন্নয়ন, মানব জগতের জটিল ও আন্তঃসম্পর্কিত সম্পর্ক, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, চিন্তা ও কর্ম, ইত্যাদি। মনে হচ্ছিল যেন কেউ আমার হাতে রহস্যের এক বিশাল ভান্ডারের চাবি তুলে দিয়েছে। এভাবেই সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের প্রতি আমার আগ্রহ শুরু হয়। তারপর আমি লেনিনের বই পড়ি। তারপর সোভিয়েত সমাজ নিয়ে অন্যান্য বিপ্লবী লেখকদের বই পড়ি। সেই সময় ভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব পড়ার পর আমি দ্বিতীয় রূপে রূপান্তরিত হতে শুরু করি।)

বৈবাহিক জীবন :

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের ব্যক্তিগত জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তাঁর স্ত্রী এলিস ফয়েজের সঙ্গে পরিচয় ও বিবাহ। এলিস ফয়েজের প্রকৃত নাম ছিল এলিস জর্জ (Alys George)। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত, প্রগতিশীল চিন্তাধারার একজন সচেতন নারী, যিনি ভারতবর্ষে এসে বামপন্থী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যুক্ত হন।

ফয়েজ ও এলিসের পরিচয় ঘটে ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে, লাহোরের সাহিত্যিক ও প্রগতিশীল মহলে। তখন সারা ভারতে প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের কর্মকাণ্ড তুঙ্গে, ফয়েজ তার অন্যতম সক্রিয় সদস্য। এলিস তাঁর বোন ক্রিস্টোবেল (Christabel)-র মাধ্যমে সেই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত হন। এই মতাদর্শিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশেই তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। ভাষা, সংস্কৃতি ও দেশের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাদের চিন্তাধারা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকার একসূত্রে মিলিত হয়।

এলিসের বোন ক্রিস্টোবেলের সাথে লন্ডনে পড়াকালীন সময়ে পরিচয় হয় ভারতীয় ড. এম ডি তাসিরের। দু'জনে বিয়ে করে ভারতে চলে আসেন। এখানে এসপি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন ড. তাসির। থাকতেন শ্রীনগরে মহারাজা হরি সিং -এর গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ পরি মহলে। এলিস ১৯৩৮ সালে তাঁর বোনের সাথে দেখা করতে

Dhaka University Institutional Repository

ভারতে আসেন। পরবর্তীতে তিনি এই উপমহাদেশকে তার স্থায়ী বাসস্থান বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। এ বাড়িতেই ১৯৪১ সালে ফয়েজ ও এলিস বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই বিয়ে ছিল তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিতে ব্যতিক্রমী, কারণ এটি ছিল আন্তঃজাতিগত ও আন্তঃসাংস্কৃতিক মিলনের এক দৃষ্টান্ত। এলিস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 'এলিস ফয়েজ' নাম ধারণ করেন। ফয়েজ তাকে "কুলসুম" মুসলিম নামটি দেন। ইসলাম গ্রহণ করলেও তাঁর স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। তিনি শুধু একজন গৃহিণীই নন, বরং একজন সক্রিয় সাংবাদিক, লেখক এবং মানবাধিকারকর্মী ছিলেন। পাকিস্তানে তিনি নারী অধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

ফয়েজের বৈবাহিক জীবন ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং বৌদ্ধিক সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের সংসারজীবনে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ব্যক্তিগত সংকট বারবার আঘাত হেনেছে, বিশেষ করে রাওয়ালপিন্ডি কন্সপিরেসি মামলার কারণে ফয়েজের দীর্ঘ কারাবাস। এই সময় এলিস অসীম ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দেন। তিনি পরিবারকে সামলে রাখেন, একই সঙ্গে ফয়েজের মুক্তির জন্য সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করেন।

ফয়েজ ও এলিসের দাম্পত্য জীবনে দুই কন্যাসন্তান জন্ম নেয়, সলিমা ও মুনিজা। সন্তানদের প্রতিপালনেও এলিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, বিশেষ করে ফয়েজের অনুপস্থিতিতে। ফয়েজ তাঁর কবিতায় প্রায়ই প্রেম ও মানবতার যে গভীরতা প্রকাশ করেছেন, তার পেছনে এলিসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

এলিস ফয়েজ ৮৭ বছর বয়সে ২০০৩ সালের ১২ই মার্চ পাকিস্তানের লাহোরের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে লাহোরের মডেল টাউন কবরস্থানে তাঁর স্বামী ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের পাশে দাফন করা হয়।[৮]

কারাগারের জীবন :

জেল বা কারা জীবন ফয়েজের জীবনধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। জেল জীবন তাঁর চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। এটি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর চিন্তার জগতকে নব রূপে উন্মোচন করে। তিনি রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে দুই দফায় কারাবরণ করেন। প্রথমবার ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫৮ সালে। কারাজীবন ফয়েজকে নতুন করে আবিষ্কার করে। কারাবন্দী থাকাকালীন সময়েই তাঁর বিখ্যাত দুটি সৃষ্টিকর্ম দাস্ত-এ-সাবা এবং *জিন্দাননামা* রচিত হয়। ড. তাওসিফ আহমেদ বাট এ প্রসঙ্গে বলেন :

> فیض کی زندگی میں اس وقت اثر انداز تبدیلی آگئی جب ۹ مارچ ۱۹۵۱ء میں لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی سازش میں فیض کو گرفتار کیا گیا۔ اگرچہ فیض کو جلد ہی یعنی ۱۹۵۵ء میں انھیں رہا کیا گیا۔ ۱۹۵۸ء میں انھیں پھر سے سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ قید خانے میں رہنے سے فیض کی ادبی زندگی دبنے کے بجائے اور ابھر کر سامنے آئی۔ اور اس دوران بھی انھوں نے بہترین شاعری کی۔[৯]
>
> (লিয়াকত আলী খানের সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৯৫১ সালের ৯ই মার্চ ফয়েজ গ্রেপ্তার হলে তাঁর জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন আসে। যদিও ফয়েজ শীঘ্রই অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে মুক্তি পান। ১৯৫৮ সালে তাঁকে নিরাপত্তা আইনের অধীনে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। কারাবাসের কারণে দমিত না হয়ে ফয়েজের সাহিত্য জীবন বিকশিত হয় এবং এই সময়েও তিনি চমৎকার কবিতা রচনা করেন।)

প্রথমবার কারাবরণ :

১৯৫১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি, চিফ অফ জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল আকবর খানের বাসভবনে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সাজ্জাদ জহির ও ফয়েজের পাশাপাশি অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তারাও

উপস্থিত ছিলেন। এখানে উপস্থিত সকলে লিয়াকত আলী খানের সরকারকে উৎখাত করার একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। এটি পরবর্তীকালে রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র নামে পরিচিতি লাভ করে ।

১৯৫১ সালের ৯ই মার্চ, রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্রে সহায়তা ও প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে তৎকালীন সরকার ফয়েজসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করে। এ মামলায় ফয়েজকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১০] তিনি ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সারগোদা, সাহিওয়াল, হায়দ্রাবাদ ও করাচির বিভিন্ন কারাগারে চার বছর কাটান। ১৯৫৫ সালের ২রা এপ্রিল তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান । মুক্তির পর তিনি লন্ডনে নির্বাসনে চলে যান এবং সেখানে সপরিবারে বসবাস করতে থাকেন।

দ্বিতীয়বার কারাবরণ :

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খানের শাসন আমলে ফয়েজ রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে দ্বিতীয় দফায় কারাবরণ করেন।[১১]

ভ্রমণ জীবন :

৭৩ বছরের দীর্ঘ জীবনে ফয়েজ বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। কিছু জায়গায় তিনি স্বল্প সময়ে ছিলেন আবার কিছু জায়গায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছেন। তিনি বিভিন্ন সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, বহু সম্মেলন ও সাহিত্য সভায় যোগদান করেছেন, যার তালিকা বেশ দীর্ঘ। ১৯৪৮ সালে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে সানফ্রান্সিসকোতে, ১৯৪৯ সালে জেনেভায়, ১৯৫৮ সালে তাশখন্দে এবং ১৯৬২ সালে ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন। ফয়েজ রাশিয়ার বিখ্যাত ও সুপরিচিত অঞ্চলগুলো ভ্রমণ করেন। তিনি সিংহল, কিউবা, লেবানন, আমির পারকিয়াও ভ্রমণ করেন। ফয়েজ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কবিতা পাঠ, বিতর্ক ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উর্দু সাহিত্যের এমন এক মহান কবি যিনি দেশে-বিদেশের সর্ব স্থানের সাহিত্য আসরকে নিজ মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে অলঙ্কৃত করে গেছেন।

আফ্রো-এশিয় লেখক সংঘে যোগদান :

আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘ হল এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি সংগঠন, যা ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে নিন্দা জানাতে এবং নিজ নিজ দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল। এশিয়া ও আফ্রিকার নবস্বাধীন দেশগুলোর লেখকদের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। এটি ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আফ্রো-এশীয়া লেখকদের কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম সম্মেলনটি ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে উজবেকিস্তানের (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ) রাজধানী তাশখন্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সম্মেলনে ৩৬টি দেশের ১৪০ জন লেখক অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিশরের কায়রোতে, ১৯৬৭ সালের মার্চে লেবাননের বৈরুতে, ১৯৭০ সালের নভেম্বরে ভারতের নয়াদিল্লিতে, ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে কাজাখস্তানের (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ) আলমাটিতে এবং ১৯৭৯ সালের জুনে অ্যাঙ্গোলার লুয়ান্ডায়। এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে কাইল হাদ্দাদ ফন্ডা (Kyle Haddad-Fonda) তাঁর এক নিবন্ধে বলেন :

> The Afro–Asian Writers' Conferences promoted translation to help Asian and African authors reach larger audiences and planned speaking tours for writers to travel throughout the region. In addition to providing a forum for sharing literary works, the conferences also served as a venue for political discussion. Some authors were able to use these platforms to raise their own political profiles.[১২]
>
> (আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনগুলো অনুবাদের প্রসার ঘটিয়েছিল, যাতে এশিয়া ও আফ্রিকার লেখকেরা বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছাতে পারেন। একই সঙ্গে লেখকদের অঞ্চলজুড়ে ভ্রমণের সুযোগ করে দিতে বক্তৃতা সফরেরও পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সাহিত্যকর্ম আদান-প্রদানের একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি এই সম্মেলনগুলো রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। কিছু লেখক এই প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান ও পরিচিতি আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।)

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ এই সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এ সংগঠনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রগতিশীল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাহিত্যিক চেতনা এ সংগঠনের আদর্শের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার। তাছাড়া তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত আন্তর্জাতিকতাবাদ, নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা এবং মুক্তির আকাঙ্খা এ সংগঠনের মূল চেতনারই প্রতিধ্বনি।

আফ্রো-এশিয় লেখক সংঘ এবং ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক শক্তিবর্ধক। এই সংগঠন একদিকে ফয়েজকে আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিত করে তোলে, অন্যদিকে ফয়েজ তাঁর সাহিত্য ও চিন্তার মাধ্যমে এই সংগঠনের আদর্শকে আরও শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করে তুলেছিলেন।

সাহিত্যে ক্যারিয়ার :

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের সাহিত্যজীবন কয়েক দশক ধরে বিস্তৃত। তাঁকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি কলেজে থাকাকালীনই কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন এবং তার অনন্য শৈলী এবং বিষয়বস্তুর জন্য দ্রুত স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। ফয়েজের রচনাগুলি মানুষের অবস্থার প্রতি গভীর সংবেদনশীলতার জন্য পরিচিত। তাঁর কবিতাগুলি মানবতার প্রতি তাঁর ভালোবাসা, সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর উদ্বেগ এবং তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে প্রতিফলিত করে।

ফয়েজের প্রাথমিক কবিতা ধ্রুপদী উর্দু কবিতা দ্বারা শুরু হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আরও আধুনিক ধারার বিকাশ করেন যা পশ্চিমা সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত। তিনি সারা কর্মজীবন জুড়ে অসংখ্য কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন। কবিতার পাশাপাশি ফয়েজ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধের জন্যও পরিচিত ছিলেন।

রাজনৈতিক সক্রিয়তার ফলে ফয়েজের বেশ কয়েকবার কারাদণ্ড হয়, যার মধ্যে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক আইন শাসনামলে চার বছরের কারাদণ্ডও ছিল। নানা বাধা সত্ত্বেও ফয়েজ তাঁর লেখা এবং প্রকাশ অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বিশ্বজুড়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কাব্য সাহিত্য

কবি, এটি ফয়েজ আহমদ ফয়েজের প্রথম ও প্রধানতম পরিচয়। লাহোরের সরকারি কলেজে পড়াকালীন সময়েই তাঁর কবিসত্ত্বার প্রকাশ ঘটে। এই সময়ে তিনি কবিতার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেন। কলেজে পড়ার সময়েই তাঁর প্রথম কবিতা কলেজ পত্রিকা '*راوی*'-তে প্রকাশিত হয়। এই দিকে ইঙ্গিত করে সম্বল নিগার বলেন :

> فیض کی پرورش شعر و ادب کے ماحول میں ہوئی۔ کالج کی تعلیم کے دوران شعر کہنے لگے۔ کالج میگزین ''راوی'' میں کلام چھپا تو حوصلہ اور بلند ہوا۔[১৩]
>
> (ফয়েজ কবিতা ও সাহিত্যের আবহে বেড়ে উঠেছিলেন। তিনি কলেজ জীবনেই কবিতা লেখা শুরু করেন। কলেজের পত্রিকা 'রাবি'-তে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হলে তাঁর সাহস আরও বেড়ে যায়।)

ড. তওসিফ আহমদ বাট এ প্রসঙ্গে বলেন :

> فیض نے کالج کی طالب علمی کے زمانے میں ہی شعر و شاعری شروع کی اور انھوں نے اس دوران جو شعر کہے وہ ملک کے مختلف رسالوں اور جرائد میں شائع ہوتے رہے۔ [১৪]
>
> (ফয়েজ কলেজে ছাত্র থাকাকালীনই কবিতা লেখা শুরু করেন এবং এই সময়ে তাঁর লেখা কবিতাগুলো দেশের বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়।)

ফয়েজ গজল ও নযম উভয় আঙ্গিকের কবিতা লিখেছেন। তবে তিনি গজলের চেয়ে নযমের দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন বেশি। ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে লাহোর সরকারী কলেজের উদ্যোগে একটি মুশায়রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে মুশায়রায় ফয়েজ বেশ আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তিনি জীবনে প্রথমবার স্বরচিত কবিতা পাঠ করার সুযোগ লাভ করেন। মূলত এর মাধ্যমেই তাঁর কবি জীবনের সূচনা হয়। মুশায়রায় পঠিত ফয়েজের গজল কবিতাটি ছিল এইরূপ :

لب بند ہیں ساقی میری آنکھوں کو پلا دے
وہ جام جو منت کش صہبا نہیں ہوتا[১৫]

(ওষ্ঠাধর বন্ধ, হে সাকী, আমার চোখকে তৃপ্ত করো
এটি এমন এক পেয়ালা যা ভিক্ষার সঙ্গী হয়ে ওঠে না।)

গজল দিয়ে কাব্যজীবন শুরুর পর ফয়েজ নযমের দিকে মনোনিবেশ করেন। '*میرے معصوم قاتل*' (আমার নিষ্পাপ ঘাতক)' কবিতার মাধ্যমে তিনি নযম আঙ্গিকের কাব্যজগতে প্রবেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথম প্রেম ব্যর্থ হওয়ায় ফয়েজ খুব দু:খ পেয়েছিলেন। আর এই দু:খের কারণেই তিনি অনেক প্রেমের কবিতা লেখেন এবং তাঁর বেশিরভাগ প্রেমের কবিতাই ১৯৪১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যসমগ্র *নকশ-এ-ফরিয়াদি* -তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ফয়েজ প্রাথমিকভাবে রোমান্টিকতার দিকে ঝুঁকেছিলেন, যার প্রধান কারণ ছিল তাঁর ব্যর্থ প্রেম এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব। ফয়েজ যখন কবিতা লেখা শুরু করেন, তখন সর্বত্র রোমান্টিক কবিদের আনাগোনা ছিল। তিনি এই কবিদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্য রোমান্টিকতাকেই বেছে নিয়েছিলেন । ফয়েজ প্রচুর রোমান্টিক কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর সেই কবিতায়

বিচ্ছেদের এক নীরব আকুতি রয়েছে। রোমান্টিকতার দিক থেকে তাঁর কবিতা 'سرود شبانہ', 'تہ نجوم', 'یاس' এবং 'ایک منظر' কাব্যকলার সর্বোচ্চ উদাহরণ।

ফয়েজের নযম কবিতাগুলো রোমান্টিকতার পাশাপাশি আবেগ ও প্রেমে পরিপূর্ণ। যদিও তিনি চিরাচরিত বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আবেগ ও ভালোবাসা কোনো কাল্পনিক বা অলীক প্রেমের জন্য ছিল না। বরং তা ছিল তাঁর জীবনে সংঘটিত জাগতিক প্রেম, যে প্রেমে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

ফয়েজ অসংখ্য নযম কবিতা রচনা করেছেন। সে কবিতাগুলোতে তিনি কখনও তাঁর প্রিয়তমার থেকে বিচ্ছেদের রূপে, কখনও অপেক্ষার রূপে নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। এই কবিতাগুলিতে তিনি তাঁর অনুভূতি এমন গভীরভাবে উপস্থাপন করেছেন যা পাঠককে সহজেই প্রভাবিত করে । উজিরে আগা তাঁর একটি গ্রন্থ "نظم جدید کی کروٹیں" এ লিখেছেন :

> اردو نظم کے کسی شاعر نے محبت کے جذبے کو اتنی شدت اور خلوص کے ساتھ پیش نہیں کیا جتنی شدت اور خلوص کے ساتھ فیض نے پیش کیا ہے۔ اس کی محبت محض روایتی عشق کی داستان نہیں بلکہ اس میں جسمانی قرب کے نتیجے میں جذباتی طوفان کے شواہد بھی ملتے ہیں۔[১৬]
>
> (উর্দু কবিতার আর কোনো কবিই ভালোবাসার অনুভূতিকে ফয়েজের মতো এমন তীব্রতা ও আন্তরিকতার সাথে উপস্থাপন করেননি। তাঁর ভালোবাসা শুধু একটি গতানুগতিক প্রেমের গল্প নয়, বরং এতে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা থেকে সৃষ্ট এক আবেগিক ঝড়েরও প্রমাণ রয়েছে।)

ত্রিশ শতকের দিকে ফয়েজের কবিতায় বিষয়বস্তুতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ পরিবর্তনের কারণ প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্ঠতা। এই আন্দোলনের তিনি একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ফলে তাঁর কবিতা রোমান্টিকতা থেকে বাস্তবতার দিকে মোড় নিতে থাকে। তিনি তাঁর কবিতাকে বাস্তবতার আবরণে ঢেকে দিয়েছিলেন। যার সর্বোত্তম উদাহরণ হলো তাঁর "مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ" শীর্ষক কবিতাখানি । এই কবিতা প্রসঙ্গে ড. মাসুদ হুসেন বলেন :

> " مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ " سے فیض کے یہاں دو قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں پہلی یہ کہ رومان اور خالص جمالیاتی اقدار کے علاوہ زندگی کی دوسری قدریں بھی ان کے یہاں ابھرنے لگتی ہیں۔ دوسری یہ کہ حقیقت پسندی کے نقطہ نظر کی وجہ سے رخِ محبوب کے سیال تصور کی مثالیت ختم ہونے لگتی ہے۔[১৭]
>
> (مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ " ফয়েজের মধ্যে দুটি পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রথমত, প্রেম ও নিছক নান্দনিক মূল্যবোধের পাশাপাশি জীবনের অন্যান্য মূল্যবোধও তাঁর মধ্যে জাগ্রত হতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত, বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিকোণের কারণে প্রিয়তমের মুখচ্ছবির পরিবর্তনশীল ধারণার আদর্শবাদ বিলীন হতে শুরু করে।)

ড. তাওসিফ আহমেদ বাট এ প্রসঙ্গে বলেন :

> فیض احمد فیض ایک ایسے شاعر تھے جو وقت کے مزاج کے مطابق شاعری کرتے تھے۔ شروع شروع میں انھوں نے صرف رومانیت کی طرف دھیان دیا لیکن ترقی پسند تحریک کی اثر سے انھوں نے حقیقت پر زور دیا۔[১৮]

(ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ছিলেন এমন একজন কবি যিনি সময়ানুযায়ী কবিতা লিখতেন। শুরুতে তিনি কেবল রোমান্টিকতার ওপরই মনোনিবেশ করেছিলেন, কিন্তু প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রভাবে তিনি বাস্তবতার ওপর জোর দেন।)

ফয়েজ রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও অনেক কবিতা লিখেছেন এবং 'چند روز اور میری جان ' কবিতাটির মাধ্যমে তিনি এর সূচনা করেন। 'ترانہ' , 'صبح آزادی' , 'کتے' , 'سوچ' , 'اے دل بے تاب ٹھہر' ইত্যাদি তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক কবিতা। রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ঠতার কারণে কারাবরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তাঁর কাব্য চর্চা থেমে যায়নি, বরং তা ভিন্ন মাত্রায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'دّرد آئے گا دبے پائوں' , 'دریچہ' , 'اے روشنیوں کے شہر' , 'یاد' , 'نثار میں تیری گلیوں پہ' , 'ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے' তাঁর কয়েকটি স্মরণীয় কবিতা। এই সময়ে তাশখন্দে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রথম লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ফয়েজ প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রগতিশীল আন্দোলনের পাশাপাশি ফয়েজ দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের মতো উত্তাল ও বিপ্লবী বিষয়গুলোকেও তাঁর কবিতার অংশ করে তুলেছিলেন। স্বদেশ ও তার জনগণের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল এবং তিনি কখনও স্বদেশবাসীকে হতাশ বা দু:খী দেখতে চাননা। এই কারণে তাঁর প্রিয় স্বদেশের মানুষের জন্য তাঁর হৃদয় আকুলতায় পূর্ণ ছিল। দেশপ্রেমের প্রজ্বলিত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আকাঙ্খা ও আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁকে সবসময় তাঁর স্বদেশবাসীকে উৎসাহিত করতে দেখা যায়।

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ তাঁর কাব্যিক অবদানের জন্য আধুনিক যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও অনন্য কবি হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। যে যুগে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন, সে যুগে কবিতা সাধারণত ঐতিহ্যবাহী শৈলীতে লেখা হতো। যদিও তিনি শুরুতে ঐতিহ্যবাহী শৈলী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এই ধারার কবিতাকে বিদায় জানিয়ে বাস্তবতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। এভাবে তিনি ঐতিহ্যের সাথে বাস্তবতাকে সংযোগকারী হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর কবিতার প্রভাব আধুনিক যুগের কবিদের উপর ব্যাপকভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এর প্রধান কারণ হলো, তিনি শৈল্পিক দক্ষতার সাথে আধুনিক চাহিদা এবং সমসাময়িক বিষয়কে কবিতার বিষয়বস্তু করে গেছেন এবং একই সাথে ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. তাওসিফ আহমেদ বাট বলেন :

فیض کی شاعری کے اثرات دور جدید کے شاعروں پر حاوی نظر آتے ہیں۔ فیض نے جو اسلوب اپنایا اس کا اثر بھی نئے شاعروں پر خاصا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے استعارے اور تراکیب، علامت نگاری اور پیکر تراشی کے نمونے بھی نئے شاعروں میں کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں ان کے اثر کا خاص سبب یہی رہا کہ انھوں نے روایت کی روشنی میں مشاہدے اور تجربے کی تازگی اور پختگی سے اپنی شاعری کو منور کیا۔[১৯]

(ফয়েজের কবিতার প্রভাব আধুনিক যুগের কবিদের উপর বিস্তার লাভ করেছে। তাঁর গৃহীত শৈলীর প্রভাবও নতুন কবিদের উপর স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এছাড়াও তাঁর রূপক ও কৌশল, প্রতীক এবং অলঙ্কারিক বিন্যাসও নতুন কবিদের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায়। তাঁর প্রভাবের বিশেষ কারণ ছিল এই যে, তিনি ঐতিহ্যের আলোকে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সতেজতা এবং পরিপক্কতা দিয়ে তাঁর কবিতাকে আলোকিত করেছিলেন।)

মোটকথা, ফয়েজের কবিতায় প্রেম ও বিপ্লব এক অনন্য সমন্বয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমদিকে তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত প্রেমের আবেগ প্রবল থাকলেও, প্রগতিশীল আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত হয় এবং

তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর কবিতায় শোষণ, বঞ্চনা, যুদ্ধ এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর কবিতায় রয়েছে মানবতার প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন। তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহে এই চিন্তাধারার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর কবিতার ভাষা ছিল সহজ কিন্তু গভীর অর্থবহ; তিনি প্রতীক ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে জটিল রাজনৈতিক ধারণাকে নান্দনিকভাবে প্রকাশ করেছেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি :

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি এবং বুদ্ধিজীবী যার সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দৃঢ়। স্বৈরাচার ও নিপীড়নের একজন স্পষ্টবাদী সমালোচক ছিলেন তিনি। ছিলেন মানবাধিকার ও স্বাধীনতার সমর্থক। তাঁর কবিতায়, ফয়েজ প্রায়শই সাম্রাজ্যবাদ, স্বৈরাচার এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে তার মনোভাব প্রকাশ করতেন। তিনি প্রান্তিক ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের একজন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিলেন। তিনি গণতন্ত্র এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতারও একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন, তাঁর কবিতা এই মূল্যবোধের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি, ফয়েজ রাজনৈতিকভাবেও সক্রিয় ছিলেন। সামগ্রিকভাবে, ফয়েজের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং সাম্যের প্রতি তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার দ্বারা গঠিত। তাঁর কবিতা এই বিষয়গুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে রয়ে গেছে।

কাব্য সংকলন :

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কাব্যজীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। তিনি ব্যক্তি, সমাজ. রাষ্ট্র প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। তাঁর এ সকল কবিতাগুলো উপস্থাপিত হয়েছে কখনো গজল রূপে, কখনো বা নযম রূপে। তাঁর সকল কবিতা নিয়ে মোট সাতটি সংকলন প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলো হলো- নকশ-এ-ফরিয়াদি (১৯৪১), দাস্ত-এ-সাবা (১৯৫২), জিন্দান-নামা (১৯৫৬), দাস্ত-এ-তাহ-এ-সঙ্গ (১৯৬৫), সার ওয়াদি-এ-সিনা (১৯৭১), শাম-এ-শহরয়ারাঁ (১৯৭৮), মেরে দিল মেরে মুসাফির (১৯৮১) এবং গুবার-এ-আয়য়াম । নিম্নে তাঁর সকল কাব্যসংকলনের উপর ধারাবাহিক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

نقش فریادی :

نقش فریادی ফয়েজ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৯৪১ সালে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ফয়েজ মির্যা গালিবের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম রাখেন গালিবের কবিতা থেকে প্রভাবিত হয়ে। অর্থাৎ গালিবের একটি কবিতার প্রথম দুটি শব্দ দিয়ে ফয়েজ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম রাখেন نقش فریادی । গালিবের সে বিখ্যাত কবিতাটি নিম্নরূপ :

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا
کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا[২০]

মির্যা গালিবের এই কাব্যাংশের শুরুতে ব্যবহৃত نقش فریادی শব্দ যুগল থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ফয়েজ তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম রাখেন نقش فریادی (অভিযোগময় চিত্র)। এ প্রসংগে আমীর সোহাইল ওয়ানী তাঁর Remembering Faiz Ahmad Faiz and His poetry of Passion প্রবন্ধে বলেন :

> Being a lifetime admirer of Ghalib, Faiz borrowed the title from the opening hemistich of Ghalib invoking multiple senses carried by the word "Naqshay Faryadi" (the lamenting image). [২১]
>
> (আজীবন গালিবের অনুরাগী ফয়েজ এই কাব্যগ্রন্থের শিরোনামটি গালিবের একটি গজলের সূচনাপদ থেকে গ্রহণ করেন। نقش فریادی (অভিযোগময় চিত্র/আর্ত নিবেদনকারী প্রতিচ্ছবি) শব্দবন্ধটি বহুমাত্রিক অর্থ ও অনুভূতির ইঙ্গিত বহন করে।)

রণেশ দাশগুপ্ত এ প্রসংগে বলেন :

> গত শতাব্দীর বিদ্রোহী কবি গালিবের প্রভাব আরো অনেকের মতো ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে প্রথমদিকে তো বটেই, পরের দিকেও খুব বেশী প্রভাবিত রেখেছে ; নকশে ফরিয়াদীর নামকরণে গালিবের কাব্যের ছোঁয়া লেগেছিল।[২২]

نقش فریادی কাব্য সংকলনের বিষয়বস্তু প্রেম ও বিপ্লব, আবেগ ও বাস্তবতা। গজল ও নযম আঙ্গিকের কবিতা দিয়ে এ সংকলনটি রচিত। এটির বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে গিয়ে সাহিত্য সমালোচক এন.এম. রশিদ গ্রন্থটির ভূমিকাংশে বলেন :

> نقش فریادی ایک ایسے شاعر کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے۔[23]
>
> (نقش فریادی হলো এমন এক কবির গজল ও নযমের সংকলন যা প্রেম ও বাস্তবতার সংযোগস্থলে দাঁড়ানো।)

نقش فریادی গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমীর সোহাইল ওয়ানী বলেন :

> The ghazals and nazms included in Naqsh-e-Faryadi were set in traditional poetic motifs with themes of classical Urdu literature like love, longing, and loneliness. the book also explored themes of freedom, tyranny, and human uncertainty with equal emphasis and featured a growing consciousness of the socio-political milieu evolving around the poet.[২৪]
>
> (نقش فریادی -তে অন্তর্ভুক্ত গজল ও নযমগুলো প্রেম, আকুতি এবং নি:সঙ্গতার মতো ধ্রুপদী উর্দু সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে ঐতিহ্যবাহী কাব্যিক আঙ্গিকে রচিত হয়েছিল। বইটিতে স্বাধীনতা, স্বৈরাচার এবং মানবিক অনিশ্চয়তার মতো বিষয়গুলোও সমান গুরুত্বের সাথে অন্বেষণ করা হয়েছে এবং কবির চারপাশে গড়ে ওঠা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা এতে ফুটে উঠেছে।)

نقش فریادی কাব্যগ্রন্থটি দিল্লীর উর্দু ঘর থেকে প্রকাশিত হয়। ১০৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে প্রায় ৫১টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এতে গজল ও নযম দুই আঙ্গিকের কবিতাই রয়েছে। কবিতাগুলোর শিরোনাম নিম্নে তুলে ধরা হলো :

رات یوں دل میں تری کھوئی ہوئی یاد آئی	حسن اور موت	تنہائی
خداوہ وقت نہ لائے	تین منظر	راز الفت چھپا کے دیکھ لیا
حسن مرہون جوش باوہ ناز	سامنا	کچھ دن سے انتظار سوال دگر میں ہے
انتہائے کار	رخصت	پھر حریف بہار ہو بیٹھے
انجام	سرود	چند روز اور مری جان
سرود شبانہ	یاس	مرگ سوز محبت
عشق منت کش قرار نہیں	آج کی رات	کتے
آخری خط	ہمت التجا نہیں باقی	بول
ہر حقیقت مجاز ہو جائے	ایک رہ گذر پر	پھر لوٹا ہے خورشید جہاں تاب سفر سے
حسینہ خیال سے	چشم مے گوں ذرا ادھر کر دے	اقبال
مری جاں اب بھی	ایک منظر	کئی بار اس کا دامن بھر دیا حسن دوعالم سے
بعد از وقت	میرے ندیم	موضوع سخن
سرود شبانہ	مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ مانگ	ہم لوگ
وہ عہد غم کی کاہشہائے بے حاصل کو کیا سمجھے	دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے	شاہ راہ
وقف حرماں و یاس رہتا ہے	سوچ	سیاسی لیڈر کے نام
انتظار	وفائے وعدہ نہیں، وعدہ دگر بھی نہیں	اے دل بیتاب ٹھہر
تہ نجوم	رقیب سے	مرے ہمدم، مرے دوست

কাব্যগ্রন্থ নক্ষ ফরিয়াদী থেকে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

رات یوں دل میں تیری کھوئی یاد آئی

جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آجائے

جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم

جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آجائے[২৫]

(রাতে অন্তরে তোমাকে হারানোর স্মৃতি এমনভাবে আসে

যেমন করে মরুভূমিতে চুপিসারে বসন্ত আছে

যেমন করে মরুপ্রান্তরে বয়ে যায় মৃদু বাতাস
যেমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি অকারণে শান্তি পেয়ে যায়।)

: دست صبا

دست صبا ফয়েজ আহমদ ফয়েজের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এটি তাঁর একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। ১৯৫১ সালের ৯ই মার্চ রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে কারাগারে বন্দী করা হয়। সেখানে তাকে চার বছর অর্থাৎ ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত থাকতে হয়। কারাগারে থাকলেও ফয়েজের কবিতাচর্চা অব্যাহত ছিল। তাঁর বিভিন্ন কবিতা ও গজল সাহিত্য পত্রিকা ও সংবাদপত্রে, বিশেষ করে দৈনিক 'ইমরোজ'-এ প্রকাশিত হতে থাকে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি কারারুদ্ধ থাকাকালীন সময়ে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রেম, বিরহ, মানুষের সংগ্রাম, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সাম্যবাদের চেতনা মিশে আছে। এ গ্রন্থটি রাজনৈতিক ও রোমান্টিক কবিতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ, যা প্রেম, বিপ্লব এবং মানবতার বার্তা দেয়। মূলত: دست صبا গ্রন্থে কবি ফয়েজের ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ও রাজনৈতিক আদর্শ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

دست صبا সে সময়ে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। এটি প্রকাশের আগেই এর প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। 'পাকিস্তান টাইমস' এবং 'ইমরোজ' পত্রিকায় প্রায়ই এ গ্রন্থটির ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো। ফলে গ্রন্থটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে। সারাদেশের রুচিশীল ও প্রতিভাবান মানুষেরা অধীর আগ্রহে গ্রন্থটির প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছিলো। دست صبا -র প্রকাশনা সেই সময়ে পাকিস্তানের কবিতা ও সাহিত্য জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল।

ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউসের উদ্যোগে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৯৫২ সালের ২২শে ডিসেম্বর বিকেলে লাহোরের একটি রেস্তোরাঁয় এটি অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম গ্রন্থ যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়েছিল। পরদিন লাহোরের সংবাদপত্রগুলোতে বেশ ফলাও করে এর খবর প্রকাশিত হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তান ও ভারতের সে সময়ের প্রখ্যাত শিল্পী আব্দুল রহমান চুগতাই। এতে সুফি গোলাম মোস্তফা তাবাসসুম, ড. বাকের, আহমেদ নাদিম কাসমি, ড. ইবাদত বেরেলভী এবং হাফিজ হোশিয়ার পুরীসহ লাহোরের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. আকিল আব্বাস জাফরী বলেন :

> 'دست صبا' اپنے وقت کی سب سے اہم کتاب تھی اور اس کی اشاعت پاکستانی شعر و ادب میں ایک تاریخی واقعہ تصور کیا گیا۔ 'دست صبا' کی اشاعت سے قبل ہی اس کی اکثر نظمیں اور غزلیں مختلف رسائل و جرائد میں چھپ کر پڑھنے والوں میں مقبول ہو چکی تھیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو مقبولیت اور پذیرائی 'دست صبا' کو حاصل ہوئی وہ ان کے کسی دوسرے مجموعے کو حاصل نہ ہوئی۔[২৬]

(دست صبا ছিল তাঁর সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এবং এর প্রকাশনাকে পাকিস্তানি কবিতা ও সাহিত্যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। دست صبا প্রকাশের আগেও তাঁর অধিকাংশ কবিতা ও গজল বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, دست صبا যে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিল, তা তার অন্য কোনো কাব্যসংগ্রহ অর্জন করতে পারেনি।)

আহমদ নাদীম কাসেমী دست صبا গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন :

> فیض کے دوسرے مجموعہ کلام "دست صبا" کی اشاعت ہماری ادبی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، خصوصا ان حالات میں کہ ہر طرف ادب میں جمود و تعطل اور ادب کی جمالیاتی قدروں کے عام انحطاط کے تذکرے ہو رہے ہیں اور ہر لب پر ہماری تہذیبی زندگی کے سپاٹ پن اور بے رس کے گلے ہیں اور ہر شخص کو شکایت ہے کہ وہ کسی اچھی سی نظم کسی پیاری سی غزل اور ذہن میں کھب کر رہ جانے والے کسی البیلے سے وشعر کے لیے ترس گیا ہے۔[২৯]

(ফয়েজের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ دست صبا-র প্রকাশ আমাদের সাহিত্য ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন সাহিত্যে স্থবিরতা ও অচলাবস্থার কথা সর্বত্র শোনা যাচ্ছে এবং সাহিত্যের নান্দনিক মূল্যবোধের সার্বিক অবক্ষয় ঘটছে, আর প্রত্যেকের মুখে মুখে আমাদের সভ্য জীবনের একঘেয়েমি ও অরুচির হাহাকার, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অভিযোগ করছে যে সে একটি ভালো কবিতা, একটি মনোহর গজল, বা মনে গেঁথে থাকা কোনো কবিতার জন্য আকুল হয়ে আছে।)

دست صبا গ্রন্থটি দিল্লীর আযাদ কিতাবঘর থেকে প্রকাশিত হয়। ১২১ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে গজল ও নযম মিলে প্রায় ৩৯টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলোর শিরোনাম নিম্নে প্রদান করা হলো :

متاع لوح و قلم چھین گئی تو کیا غم ہے	دامن یوسف	ترانہ	اگست 1952ء
اے دل بیتاب ٹھہر	پھر حشر کے ساماں ہوئے ایوان ہوس میں	عجز اہل ستم کی بات کرو	نثار میں تیری گلیوں پہ
کبھی کبھی یاد میں ابھرتے ہیں	طوق و دار کا موسم	فکر دلداری گلزار کروں یا نہ کروں	اب وہی حرف جنوں سب کی زباں ٹھہری ہے
سیاسی لیڈر کے نام	ترا جمال نگاہوں میں لے کے اٹھا ہوں	دو عشق	شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں
مرے ہمدم مرے دوست	سر مقتل	گرانی شب ہجراں دو چند کیا کرتے	آئے کچھ ابر، کچھ شراب آئے
صبح آزادی	تم آئے ہو، نہ شب انتظار گزری ہے	وہیں ہے دل کے قرائن تمام کہتے ہیں	کر رہا تھا غم جہاں کا حساب
لوح و قلم	تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں	رنگ پیراہن کا، خوشبو زلف لہرانے کا نام	اس طرح اپنی خامشی گونجی
نہ پوچھ جب سے ترا انتظار کتنا ہے	ہمارے دم سے ہے کوئے جنوں میں اب بھی خجل	نوحہ	کسی گماں پہ توقع زیادہ رکھتے ہیں
صبا کے بات میں نرمی ہے ان کے	شفق کی راکھ میں جل بجھ گیا ستارہ شام	ایرانی طلبا کے نام	تیری صورت جو دلنشیں کی ہے

ہاتوں کی			
دو آوازیں	تمہارے حسن کے نام	دل میں اب یوں ترے بھولے ہوئے غم آتے ہیں	زنداں کی ایک شام
شانہ بام پر دمکتا ہے	دل سے پیہم خیال کہتا ہے	زنداں کی ایک صبح	یاد
قرض نگاہ یار ادا کر چکے ہیں ہم	دیکھیں ہے کون کون، ضرورت نہیں رہی	سحر جو شب سے عظیم تر ہے	

دست صبا کاب্যগ্রন্থ থেকে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے
جو دل پہ گذری ہے رقم کرتے رہیں گے
اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے
ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے
ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی
ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے[২৮]

(আমি কালি ও কলমের পরিচর্যা করতে থাকবো
হৃদয়ের মধ্য দিয়ে যা বয়ে যায় তা লিখতে থাকবো
ভালোবাসার কষ্ঠের কারণগুলো জমা করতে থাকবো
এভাবে নি:সঙ্গতার সময়কে দয়া দেখিয়ে যাব,
হ্যাঁ, তিক্ত দিনগুলো আরও বাড়বে
হ্যাঁ, অত্যাচারীরা অত্যাচার চালিয়ে যাবে।)

: *زنداں نامہ*

' زنداں نامہ' ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের কবিতার তৃতীয় সংকলন । জেল জীবনের কঠোর বাস্তবতা, একাকীত্ব, এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা এই গ্রন্থের মূল সুর। কারাবন্দী অবস্থায় তিনি দেশ ও মানুষের যন্ত্রণার কথা অনুভব করেছেন। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যেও কবি আশার আলো খোঁজার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ফয়েজের এ গ্রন্থটি কেবল ব্যক্তিগত কারাজীবনের উপাখ্যান নয়, বরং এতে শোষিত মানুষের প্রতিবাদী সুর ও মুক্তির আকাঙ্খা ব্যক্ত হয়েছ।

زنداں نامہ গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয় ফয়েজ তখন তার সঙ্গীদের সাথে কারাগারে ছিলেন। তাঁর সঙ্গীরা জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে একটি পার্টির মাধ্যমে এর প্রকাশনা উদযাপন করেছিলেন। গ্রন্থটির বেশিরভাগ কবিতা ফয়েজ সেন্ট্রাল জেল মন্টগোমারি এবং সেন্ট্রাল জেল লাহোরে থাকাকালীন লিখেছিলেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে সাজ্জাদ জহির বলেন :

زنداں نامہ کی بیشتر منظومات فیض نے مانٹ گومری سنٹرال جیل اور لاہور سنٹرل جیل میں قیام کے دوران لکھیں، یعنی جولائی ۱۹۵۳ء سے مارچ ۱۹۵۵ء تک کی بھی ہوئی چیزیں اس میں ہیں۔۔۔ فیض کی ان نظموں کو مجموعی حیثیت سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ان اقدار کا تعلق ہے، جن کو شاعر نے ان میں پیش کیا ہے، وہ تو وہی ہیں جو اس زمانے میں تمام ترقی پسند انسانیت کی اقدار ہیں، لیکن فیض نے ان کو اتنی خوبی سے اپنایا ہے کہ نہ تو ہماری تہذیب و تمدن کی بہترین روایات سے الگ نظر آتی ہیں اور نہ شاعر کی انفرادیت اس کا زم، شیریں اور مترنم انداز کلام کہیں بھی ان سے جدا ہوا ہے۔[۲۹]

(*জিন্দান-নামা* কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা ফয়েজ মন্টগোমারি সেন্ট্রাল জেল ও লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকাকালীন অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের জুলাই থেকে ১৯৫৫ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে রচনা করেছিলেন... সামগ্রিকভাবে এই কবিতাগুলোর দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ফয়েজ এতে যেসব মূল্যবোধ তুলে ধরেছেন, তা ছিল সেই যুগের প্রগতিশীল মানবগোষ্ঠীরই অভিন্ন মূল্যবোধ; অথচ তিনি সেগুলোকে এতটাই নিপুণভাবে নিজের সত্তায় ধারণ করেছেন যে, তা আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন মনে হয় না; এমনকি কবির নিজস্ব স্বকীয়তা তাঁর স্বতন্ত্র, সুমধুর ও গীতিধর্মী শৈলীও কোনোভাবেই সেই ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয় না।)

রণেশ দাশগুপ্ত '*زنداں نامہ*' গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন :

> 'দসতে সবা'র পরবর্তী বই "যিন্দাননামা" অর্থাৎ কারালিপি। এই বইটির মধ্যে 'দসতে সবা'র কয়েকটি কবিতাকেও জেলখানার লেখা বলেই জায়গা দেওয়া হয়েছে। কবির চার বছরের কারাজীবনের আশা-নিরাশা দু:খ আনন্দ 'যিন্দাননামা'র কবিতাগুলিতে নিকষিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।[৩০]

সাহিত্য সমালোচক ওয়াছী আহমদ সিন্দীলবী তাঁর *ইনকিলাবী শায়ের ফয়েজ আহমদ ফয়েজ* গ্রন্থে বলেন :

> ফিয়ের কা তিসরা মজমুয়া "জিন্দান নাম" উন কে দোর এ সিরী কা কারনামা হে জো 1956ء মে শায়ে হুয়া উস মজমুয়া মে গজলিস, নজমিস, কতয়ে, ওয়াসোখত, কাওয়ালি রজ্জ অর দিগর মতফরিক আশয়ার মিলতে হিস।।। ফয়েজ কে উস কালাম মে তারিকি অর মায়ুসি কা আনসর গালিব হে। জিন্দান কি তনহায়ি কয়েদ ও বন্দ কে মসায়িব মুসতাকবিল কে আহসাসাত অর আপনো সে জুদায়ি বড়ে বড়ে সুরমাউ কো দিল শিকান ও পাসত হিম্মত বনা দেতি হিস লেকিন ফয়েজ বড়ে সবর ও হিম্মত কে ইনসান হিস। মুসলসল সারে জাহাঁ কে দরদ নে উন কো হারাসাঁ ও পরিশান রখা। গমে জানাঁ অর গমে দোরাঁ নে উন কো হমেশা আপনা আসির দাম রখা লেকিন উন কে পায়ে সাবাত কো লগজিশ না হুয়ি। কদম ডগমগায়ে লেকিন পির উনহো নে আপনে কো জলদ সনভাল লিয়া অর দুসরো কো নকবত ও ইফলাস সে, মুসিবতো অর পরিশানিয়ো সে নজাত দিলানে কে লিয়ে আপনি ফহম কো তিজর রখা। জিন্দান নামা "উন কে এসে হি আহসাসাত কা এক মজমুয়া হে জিস মে রঙ্গারঙ্গি হে। উদাসি অর মায়ুসি হে।[৩১]

(ফয়েজের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *জিন্দান-নামা* (কারাবাসের ইতিবৃত্ত) মূলত তাঁর কারাজীবনের কষ্টের ফসল যা ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয় । এ সংকলনে রয়েছে গজল, নজম, কিতা, ওয়াসোখত, কাওয়ালি, রজজ ও অন্যান্য বিবিধ কবিতা। এই কাব্যগ্রন্থে এক গভীর অন্ধকার ও হতাশার সুর প্রাধান্য পেয়েছে। কারাগারের নির্জনতা, বন্দিদশার কঠোরতা, ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা এবং প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্নতা এসবই এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী বীরের মনোবলও ভেঙে দিতে পারে; অথচ ফয়েজ অসীম ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। সমগ্র বিশ্বের নিরন্তর বেদনা তাঁকে সর্বদা এক গভীর যন্ত্রণা ও অস্থিরতার মধ্যে নিমজ্জিত রাখত। প্রেমের বেদনা ও সমকালের নানাবিধ সংকট তাঁকে সর্বদা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল, তবুও তাঁর অবিচলতা বিন্দুমাত্র টলেনি। চলার পথে তিনি হয়তো হোঁচট খেয়েছেন, কিন্তু দ্রুতই নিজেকে সামলে নিয়েছেন এবং অন্যদের অভাব-অনটন, দারিদ্র্য, প্রতিকূলতা ও দুর্দশা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে শানিত করেছেন। *জিন্দান-নামা* হলো এমনই সব অনুভূতির এক সংকলন বৈচিত্র্য, বিষাদ ও নৈরাশ্যের ছোঁয়ায় ঋদ্ধ এক সৃষ্টি।)

زندان نامہ গ্রন্থটি দিল্লীর কবির বুকডিপো থেকে প্রকাশিত হয়। ১৩৯ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে গজল ও নযম মিলে প্রায় ২৭টি কবিতা স্থান পেয়েছে। ফয়েজের জেল জীবনের সাথী প্রাক্তন মেজর মুহাম্মদ ইসহাক এবং সাজ্জাদ জহিরের দুটি লিখাও এ গ্রন্থের ভূমিকাংশে তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলোর শিরোনাম নিম্নে প্রদান করা হলো :

شیخ صاحب سے رسم وراہ نہ کی	واسوخت	کچھ محتسبوں کی خلوت میں
سب قتل ہو کے تیرے مقابل سے آئے ہیں	شاخ پر خون گل رواں ہے وہی	دریچہ
اے حبیبِ عنبر دست	کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہات میں تیرا ہات نہیں	درد آئے گا دبے پاؤں
ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن نہ تھی تری انجمن سے پہلے	ہم پر تمہاری چاہ کا الزام تو ہے ll	آجاؤ ایفریقا
شام فراق اب نہ پوچھ آئی اور آ کے ٹل گئی	فکر سود وزیاں تو چھوٹے گی	گرمی شوق نظارہ کا اثر تو دیکھو
رہ خزاں میں تلاش بہار کرتے رہے	اے روشنیوں کے شہر	یہ فصل امیدوں کی ہمدم
نہ آج لطف کر اتنا کہ کل گزر نہ سکے	گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے	بنیاد کچھ تو ہو
ملاقات	صبح پھوٹی تو آسماں پہ ترے	کوئی عاشق کسی محبوبہ سے
بات بس سے نکل چلی ہے	ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے	اگست 1955

زندان نامہ গ্রন্থ থেকে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদাহরণ হিসেবে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

گڑی ہیں کتنی صلیبیں مرے دریچے میں
ہر ایک اپنے مسیحا کے خوں کا رنگ لیے
ہر ایک وصل خداوند کی امنگ لیے
کسی پہ کرتے ہیں ابر بہار کو قرباں
کسی پہ قتل مہ تابناک کرتے ہیں
کسی پہ ہوتی ہے سرمست شاخسار دو نیم
کسی پہ باد صبا کو ہلاک کرتے ہیں[৩২]

(মৃতের জানালায় কতগুলো ক্রুশ রয়েছে?
প্রতিটিতেই কি তাঁর মসিহের রক্ত লেগে আছে?
প্রতিটিই কি প্রভুর আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ?
কোনোটিতে কি তারা বসন্তের মেঘ উৎসর্গ করে?
কোনোটিতে কি তারা উজ্জ্বল নক্ষত্রদের হত্যা করে?
কোনোটিতে কি তারা আড়াই বছরের পুরনো মদে মত্ত হয়?

دستِ تہ سنگ :

دستِ تہ سنگ কাব্যগ্রন্থটি ফয়েজের পরিপক্ব কাব্যশৈলী এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। এই গ্রন্থে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার, সামাজিক অবিচার এবং মানুষের সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। دستِ تہ سنگ অর্থ 'পাথরের নিচে হাত' , এই রূপকটি দিয়ে তিনি স্বৈরাচারী শাসন বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষের অসহায়ত্ব অথচ প্রতিরোধের মানসিকতাকে বুঝিয়েছেন।

গ্রন্থটি সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্ত বলেন :

> 'দস্‌তে তহে সংগ' এর মধ্যে রয়েছে ১৯৫৬ থেকে শুরু করে ১৯৬২-৬৩ পর্যন্ত কবির প্রায় সব লেখাই। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক আইন জারী হওয়ার পরে আবার কবিকে জেলে যেতে হয়। এই কারণে এ পর্যায়েও রয়েছে জেলখানার কয়েকটি কবিতা। এই পর্যায়েও কবি নানা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে জীবনের গান গেয়েছেন এবং দস্‌তে তহে সংগের কবিতা পড়লে বুঝতে পারা যাবে, কবির কলম আপোষ ও ক্লান্তিকে মানে না।[৩৩]

دستِ تہ سنگ গ্রন্থটি সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক ওয়াছী আহমদ সিন্দীলবী বলেন :

> فیض کا چوتھا مجموعہ "دست نہ سنگ " ۱۹۶۴ میں شائع ہوا۔ یہ مجوعہ بھی ان کی دور اسیری کی حالت میں قریب قریب بام تکمیل کو پہونچا ہے۔ زندان کی خوشبو اس کلام کو بھی معطر کیے ہوئے ہے۔ شاعری ہر کس دناکس کے بس کی بات تو ہے نہیں۔ یہ تو خدا کے دین کی بات ہے لیکن شعر کہنے کے کچھ محرکات ہوتے ہیں جن سے طبیعت متاثر ہوتی ہے۔ اچھا شعر وہی ہوتا ہے جو دل سے نکلتا ہے۔[৩৪]

(ফয়েজের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ دستِ تہ سنگ ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থটিও তাঁর কারাবাসের সময়কালে রচিত হয়েছিল। এর পঙ্‌ক্তিমালায় কারাগারের সেই পরিবেশ ও আবহ যেন মিশে আছে। কবিতা সবার আয়ত্তের বিষয় নয়–এটি এক ঐশ্বরিক দান–তবুও এমন কিছু উদ্দীপক উপাদান রয়েছে যা কাব্যিক অনুভূতিকে জাগ্রত করে তোলে। প্রকৃত কবিতা সেটাই যা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়।)

دستِ تہ سنگ গ্রন্থটি দিল্লীর ইদারায়ে ফুরুগ-এ-আদব থেকে প্রকাশিত হয়। ৯৩ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে গজল ও নযম মিলে প্রায় ৩৬টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলোর শিরোনাম নিম্নে প্রদান করা হলো :

یہ خوں کی مہک ہے کہ لب یار کی خوشبو	بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے	آج یوں موج در موج غم تھم گیا اس طرح غمزدوں کو قرار آ گیا
دست تہ سنگ آمدہ	شورش زنجیر بسم اللہ	کہاں جاؤ گے
میخانوں کی رونق ہیں کبھی خانقہوں کی	آج بازار میں پابجولاں چلو	یک بیک شورش فغاں کی طرح
سفر نامہ (پیکنگ)	یہ جفائے غم کا چارہ وہ نجات دل کا عالم	شہر یاراں
سنکیانگ	قید تنہائی	نہ گنواؤ ناوک نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا
بساط رقص پہ صد شرق و غرب سے سر شام	ہم خستہ تنوں سے محتسبو کیا مال و منال کا پوچھتے ہو	خوشا ضمانت غم

جشن کا دن	حمد	جب تیری سمندر آنکھوں میں
رات ڈھلنے لگی ہے سینوں میں	ترے غم کو جاں کی تلاش تھی ترے جاں نثار چلے گئے	رنگ ہے دل کا مرے
شام	بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے	پاس رہو
جمے گی کیسے بساط یاراں کہ شیشہ و جام بجھ گئے ہیں	کب ٹھہرے گا درد اے دل کب رات بسر ہو گی	تری امید ترا انتظار جب سے ہے
تم یہ کہتے ہو اب کوئی چارہ نہیں	ملاقات مری ۱۱	شرح فراق، مدح لب مشکبو کریں
نہ دید ہے نہ سخن اب نہ حرف ہے نہ پیام	ختم ہوئی بارش سنگ	منظر

دست تہ سنگ گ্রন্থ থেকে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদাহরণ হিসেবে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی
جس میں رکھا نہیں ہے کسی نے قدم
کوئی اترا نہ میداں میں دشمن نہ ہم
کوئی صف بن نہ پائی، نہ کوئی علم
منتشر دوستوں کو صدا دے سکا
اجنبی دشمنوں کا پتا دے سکا
!تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی
جس میں رکھا نہیں ہم نے اب تک قدم
تم یہ کہتے ہو اب کوئی چارا نہیں
جسم خستہ ہے، ہاتھوں میں یارا نہیں ۳۵

(তুমি বলছ যুদ্ধটা হয়েই গেছে–
যেখানে কেউ পা রাখেনি,
কেউই পা রাখেনি–
না শত্রু, না আমরা–কেউই নামিনি রণক্ষেত্রে।
কোনো ব্যূহ রচিত হয়নি, নেই কোনো খবর–
যা দিয়ে ছড়ানো বন্ধুদের ডাকা যেত,
জানা যেত ভিনদেশি শত্রুর অবস্থান।
তুমি বলছ যুদ্ধটা হয়েই গেছে!
অথচ যেখানে আমরা এখনো পা-ই রাখিনি।
তুমি বলছ এখন আর কোনো উপায় নেই–
শরীর দুর্বল, আর হাতের মুঠোয় নেই কোনো বন্ধু।)

: سروادیٔ سینا

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের পঞ্চম কাব্যসংকলন এটি। ১৯৭১ সালে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনটি ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত লিখিত ফয়েজের বিভিন্ন কবিতার সমষ্টি। এ কাব্যগ্রন্থটি মূলত ফয়েজের নির্বাসন জীবনের অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির এক অনন্য সংমিশ্রণ। *سروادیٔ سینا* গ্রন্থটি সম্পর্কে আশফাক হোসাইন বলেন :

> ان کے ہر مجموعہ کلام کی طرح " سروادیٔ سینا " میں بھی دو اہم منزلیں ہیں۔ ایک وہ جو 1967ء کی عرب اسرائیل جنگ سے متعلق ہے اور دوسری مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن کے بارے میں لکھی گئی ان کی احتجاجی نظمیں ہیں۔ ان دونوں موقعوں پر انہوں نے اپنی آواز میں وہ طاقت اور صداقت پالی جس نے انہیں اپنے مظلوم ہم وطنوں کے دلوں پر گزرنے والے صدمات کا ترجمان بنا دیا۔[৩৬]
>
> (তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মতোই *'সার-এ-ওয়াদি-এ-সিনা'*-তেও দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় উঠে এসেছে। একটি ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এবং অন্যটি পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী কবিতা নিয়ে। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর কণ্ঠস্বর এমন এক শক্তি ও সত্যতা অর্জন করেছিল, যা তাঁকে নিপীড়িত দেশবাসীর যন্ত্রণার মূর্ত প্রতীকে পরিণত করেছিল।)

ওয়াসি আহমদ সিন্দীলবী *سروادیٔ سینا* গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন :

> سروادیٔ سینا فیض کا پانچواں مجموعہ 1971ء میں شائع ہوا۔ غزلیں، مرثیہ، نظمیں، قصے وغیرہ سے یہ مجموعہ مزین ہے۔ اپنے اس مجموعہ کو انہوں نے ہر ایک کے نام خواہ وہ مزدور پیشہ ہو، ملازم ہو، کاشتکار ہو، عزیز و اقارب ہو، دوست و دشمن ہو معنون کیا ہے۔ ان میں طنز ہے، حسرت ہے، مایوسی ہے، جوش ہے اور تسلی و دلاسہ ہے۔[৩৭]
>
> (*سروادیٔ سینا* ফয়েজের পঞ্চম সংকলন ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনটি গজল, শোকগাথা, কবিতা, গল্প ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। তিনি এই সংকলনটি শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক, আত্মীয়, বন্ধু বা শত্রু সকলকেই উৎসর্গ করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে হাস্যরস, অনুশোচনা, হতাশা, উত্তেজনা এবং সান্ত্বনা।)

سروادیٔ سینا গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌর কিতাবী দুনিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। ১৪১ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে গজল ও নযম মিলে প্রায় ৩৬টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলোর শিরোনাম নিম্নে প্রদান করা হলো :

لہو کا سراغ	مابین من و تو نیاید بیاں کوئی اترے	حذر کرو مرے تن سے
یہاں سے شہر کو دیکھو	سنو کہ شاید یہ نور صیقل	ہم سادہ ہی ایسے تھے کی یوں ہی پذیرائی
غم نہ کر غم نہ کر	دعا	غبار خاطر محفل ٹھہر جائے
بلیک آوٹ	دلدار دیکھنا	میں تیرے سپنے دیکھوں
کس حرف پہ تو نے گوشۂ لب اے جان جہاں	ہارٹ اٹیک	بھائی
سپاہی کا مرثیہ	مرثیے	داغستانی خاتون اور شاعر بیٹا

ایک شہر آشوب کا آغاز	کب تک دل کی خیر منائیں کب تک رہ دکھلا	بہ نوک شمشیر
کیے آرزو سے پیماں جو مال تک نہ پہنچے	خورشید محشر کی لو	آرزو
سوچنے دو	جرس گل کی صدا	سالگرہ
نہ کسی پہ زخم عیاں کوئی نہ کسی کو فکر	فرش نومیدی دیدار	ایک چٹان کے لیے کتبہ
سرودی سینا	ٹوٹی جہاں جہاں یہ کمند	نسخۂ الفت میرا

سرودئ سینا گرنتھ تھے کے ایکٹی کویتار کیوکٹی لائین اُداہرن ہیسیبے نیمنے تولے دھرا ہلو :

کب تک دل کی خیر منائیں، کب تک رہ دکھلاؤ گے

کب تک چین کے مہلت دو گے، کب تک یاد نہ اؤ گے

بیتا دید امید کا موسم، خاک اڑتی ہے آنکھوں میں

کب بھیجو گے درد کا بادل، کب برکھا برساؤ گے

عہد وفا یا ترک محبت، جو چاہو سو آپ کرو

اپنے بس کی بات ہی کیا ہے، ہم سے کیا منواؤ گے [৩৮]

(আর কতদিন তুমি তোমার ভালোবাসা দেখাবে, আর কতদিন বাঁচবে?
আর কতদিন তুমি শান্তি দেবে, আর কতদিন ভুলে যাবে?
আশার মরশুম শেষ, চোখে ধুলো এসে লাগে।
কখন পাঠাবে যন্ত্রণার মেঘ, কখন বৃষ্টি নামাবে?
আনুগত্যের শপথ নাও অথবা ভালোবাসা ত্যাগ করো, যা খুশি তাই করো।
এতে তোমার কী আসে যায় ? আমাদের কী বিশ্বাস করাবে তুমি ?)

: شام شہریاراں

১৩৬ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ১৯৭৮ সালে নয়াদিল্লীর মাকতাবা-এ জামেয়া লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সম্পর্কে ড. শফিক আশরাফি বলেন :

> اس مجموعہ کی بیشتر نظمیں ایسی ہیں جن کے موضوعات عشقیہ ہیں، لیکن ان عشقیہ موضوعات میں سماجی اور سیاسی مسائل کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس طرح ان کی عشقیہ شاعری میں جذبے کی سچائی اور اس کا خلوص نظر آتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ انھوں نے ایک بڑے فنکار کی طرح اس کو پیش بھی کیا ہے۔ انھوں نے عشقیہ واردات کو اپنے عہد کی سیاسی کشمکش اور سماجی مسائل سے اس طرح ہم آہنگ کر دیا ہے کہ اردو کی عشقیہ شاعری میں ایک بالکل نئی اور قابل قدر چیز نظر آتی ہے۔ فیض اپنی رومانی شاعری کے انھیں رجحانات کی وجہ سے انگریزی رومانی شاعری کے پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں۔ [৩৯]
>
> (এই সংকলনের অধিকাংশ কবিতাই বিষয়বস্তুর দিক থেকে রোমান্টিক, তবুও এগুলোতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলিরও আভাস পাওয়া যায়। ফলে তাঁর রোমান্টিক কবিতায় আবেগের এক অকৃত্রিম ও আন্তরিক গভীরতা ফুটে উঠেছে; অধিকন্তু, একজন নিপুণ শিল্পীর দক্ষতায় তিনি তা উপস্থাপন করেছেন। রোমান্টিক অভিজ্ঞতার সাথে সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক চ্যালেঞ্জের তিনি এমন এক নিপুণ সমন্বয় ঘটিয়েছেন যে, উর্দু রোমান্টিক কবিতার জগতে তা এক সম্পূর্ণ নতুন ও তাৎপর্যপূর্ণ

সংযোজন হয়ে উঠেছে। তাঁর রোমান্টিক কবিতার এই বৈশিষ্ট্যগুলোই মূলত ফয়েজকে ইংরেজি রোমান্টিক ধারার মহান কবিদের কাতারে আসীন করেছে।)

شام شہر یاراں ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কাব্যচিন্তার পরিণত রূপের পরিচয় বহন করে। এতে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সামষ্টিক বাস্তবতা একসূত্রে গাঁথা হয়েছে, যা উর্দু কবিতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ গ্রন্থটি মূলত এমন এক সময়ের সৃষ্টি, যখন সমাজ-রাজনীতির অস্থিরতা, ব্যক্তিগত বেদনা এবং মানবিক মূল্যবোধের সংকট তীব্র হয়ে উঠেছিল। এই গ্রন্থের কবিতাগুলোতে একদিকে যেমন প্রেম, বেদনা ও স্মৃতির কোমল অনুভূতি রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে সামাজিক অবিচার, দমন-পীড়ন ও সংগ্রামের প্রতিবাদী সুর।

شام شہر یاراں গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলোর শিরোনাম নিম্নে প্রদান করা হলো :

جس روز قضا آئے گی	بہار آئی	مرثیہ امام
ہم نے سب شعر میں سنوارے تھے	تم اپنی کرنی کر گزرو	گیت-منزلیں منزلیں
اشک آباد کی شام	یہ دن تو وہی پہلا دن ہے	گیت۔اب کیا دیکھیں راہ تمھاری
مرے درد کو جو زباں ملے	ہمیں سے اپنی نوا ہم کلام ہوتی رہی	گیت۔ہم تیرے پاس آئے
پاؤں سے لہو کو دھو ڈالو	تجھے پکارا ہے بے ارادہ	امید سحر کی بات سنر
سجاد ظہیر کے نام	حسرت دید میں گزراں ہیں زمانے کب سے	حیراں ہے جبیں آج کدھر سجدہ روا ہے
اے شام مہرباں ہو	لینن گراڈ کا گورستان	گیت۔کدھرے نہ چنیدیاں دستاں
چلو پھر سے مسکرائیں	یہ کس خلش نے پھر اس دل میں آشیانہ کیا	میری ڈولی شوہ دریا
ہم تو مجبور تھے اس دل سے	کچھ عشق کیا کچھ کام کیا	ربا سچیا
نہ اب رقیب نہ ناصح نہ غمگسار کوئی	در امید کے دریوزہ گر	زندان سے ایک خط
ڈھاکہ سے واپسی پر	آج اک حرف کو پھر ڈھونڈتا پھرتا ہے خیال	ویرا کے نام
یہ موسم گل گرچہ طرب خیز بہت ہے	کس شہر نہ شہرہ ہوا نادائی دل کا	وامیرے وطن
صحرا کی رات	ستم سکھلائے گا رسم وفا ایسے نہیں ہوتا	ملی رات سی درد فراق والی

شام شہر یاراں গ্রন্থ থেকে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদাহরণ হিসেবে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ہم نے سب شعر میں سنوارے تھے
ہم سے جتنے سخن تمہارے تھے
رنگ وخوشبو کے حسن وخوبی کے
تم سے تھے جتنے استعارے تھے

تیرے قول و قرار سے پہلے
اپنے کچھ اور بھی سہارے تھے
جب وہ لعل و گہر حساب کیے
جو ترے غم نے دل پہ وارے تھے[৪০]
(আমরা তো সবই কবিতায় সাজিয়েছিলাম,
তোমার যত কথা ছিল, সবই আমাদের ছিল।
রং আর সুবাস, সৌন্দর্য আর মাধুর্যের,
যত উপমা ছিল সবই তোমাকে ঘিরে ছিল।
তোমার প্রতিশ্রুতি আর অঙ্গীকারের আগে,
আমার নিজেরও কিছু ভরসা ছিল।
যখন সেই লাল-রত্নের হিসাব করা হলো,
যা তোমার দু:খ আমার হৃদয়ে নিক্ষেপ করেছিল।)

: মেরে দিল মেরে মুসাফির

এ গ্রন্থটি দিল্লীর শাহীন বুক সেন্টার থেকে ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়। ৯৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে ফয়েজের রচিত প্রায় ২৭টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু প্রেম, বিরহ, একাকিত্ব, বিদ্রোহ প্রভৃতি। এ গ্রন্থে পাঞ্জাবি ভাষায় রচিত দুটি কবিতাও রয়েছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে আশফাক হোসাইন বলেন :

> ১৯৮০ঃ ফিয়েজ সাহেবের সাতটি কাব্যগ্রন্থ মেরে দিল মেরে মুসাফির প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর নির্বাসনকালে রচিত কবিতাগুলোর সংকলন। দুই বছরের এই সময়কালে তিনি এতো পরিমাণ কবিতা রচনা করেছিলেন, যা তাঁর আগের কাব্যগ্রন্থের জন্য সাত বছর ধরে লিখেছিলেন। এই সংকলনে তিনি সেই চিন্তাধারাকে আরও বিকশিত করেছেন, যার সূত্রপাত হয়েছিল জেনারেল জিয়া-উল-হকের সামরিক শাসন জারির পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে। সেই সময়কালটি ছিল দেশজুড়ে মৌলবাদের উত্থান এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতের মতো ঘটনায় চিহ্নিত; এছাড়া পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়–জুলফিকার আলী ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর–ও এই সময়েই সংঘটিত হয়েছিল। ফয়েজ তাঁর কবিতার পটভূমিতে এই ঘটনা ও পরিস্থিতিগুলোকে তুলে ধরেছেন।)

গ্রন্থে সন্নিবেশিত ফয়েজের বিবিধ কবিতাগুলোর শিরোনাম নিম্নে দেয়া হলো : میرے دل میرے مسافر

دل من مسافر من	تین آوازیں	نذر حافظ
پھول مرجھا گئے سارے	یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے	میرے ملنے والے
کوئی عاشق کسی محبوبہ سے	ہم تو مجبور وفا ہیں	گاؤں کی سڑک
دو غزلیں	سبھی کچھ ہے تیرا دیا ہوا	اب کے برس دستور ستم
ایک دکنی غزل	مقتل میں نہ مسجد نہ خرابات میں کوئی	غم بدل شکر بہ لب
منظر	پیر ہن	وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے
دو نظمیں	قوالی	اپنے انعام حسن کے بدلے
لاؤ تو قتل نامہ مرا	کیا کریں	ایک ترانہ (پنجابی میں)
سہل یوں راہ زندگی کی ہے	دو نظمیں فلسطین کے لئے	ایک نغمہ (پنجابی میں)

গ্রন্থ থেকে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদাহরণ হিসেবে নিম্নে তুলে ধরা হলো : میرے دل میرے مسافر

مرے دل، مرے مسافر
ہوا پھر سے حکم صادر
کہ وطن بدر ہوں ہم تم
دیں گلی گلی صدائیں
کریں رخ نگر نگر، کا
کہ سراغ کوئی پائیں
کسی یار نامہ بر کا
ہر اک اجنبی سے پوچھیں
جو پتا تھا اپنے گھر کا
سر کوئے ناشنایاں[৪২]

(আমার হৃদয়, আমার সহযাত্রী,
আবার জারি হয়েছে সেই আদেশ
আমরা দু'জন আবার হবো দেশছাড়া,
গলি গলি ঘুরে ডাক দেবো,
শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াবো,
যেন কোনো সন্ধান পাই
কোনো প্রিয়জনের, কোনো বার্তাবাহকের,

প্রত্যেক অচেনা মানুষকে জিজ্ঞেস করবো
যে ঠিকানা ছিল আমাদের নিজের ঘরের,
আজ তা হারিয়ে গেছে অপরিচয়ের গলিতে।)

: غبارِ ایام

এটি ফয়েজের শেষ কাব্য সংকলন। তাঁর শেষ জীবনে রচিত কবিতা নিয়েই এই সংকলনটি। এতে তাঁর প্রবাসকালীন সময়ে লিখা কবিতাও যেমন আছে তেমনই স্বদেশে বসে লিখা কবিতাও আছে। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সালের অক্টোবর অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রচিত কবিতাগুলোকে এ সংকলনে একত্রিত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত আবেগ, অভিজ্ঞতা, সমাজ ও রাষ্ট্র, বিশ্ব-রাজনীতিকে উপজীব্য করে এ গ্রন্থের কবিতাগুলো রচিত হয়েছে। একটি না'ত দিয়ে সংকলনটি সমাপ্ত করা হয়েছে। এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত কবিতাগুলোর শিরোনাম নিম্নে দেয়া হলো :

تم ہی کہو کیا کرنا ہے	اس وقت تو یوں لگتا ہے	نعت۔ اے تو کہ ہست ہر دل محزوں سرائے تو
اب جو بھی چاہو چھان کرو	دربار میں اب سطوت شاہی کی علامت	ادھر نہ دیکھو
عشق اپنے مجرموں کو پابجولاں چلو	یہ کس دیار عدم میں	پھر آئینہ عالم شاید کہ نکھر جائے
نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی	نذر مولانا حسرت موہانی	پھول مسلے گئے فرش گلزار پر
میجر اسحاق کی یاد میں	ہم مسافر یوں ہی مصروف سفر جائیں گے	بے بسی کا کوئی درماں نہیں کرنے دیتے
ایک نغمہ کربلائے بیروت کے لئے	جیسے ہم بزم ہیں پھر یار طرحدار سے ہم	بہت ملا نہ زندگی سے غم کیا ہے
ایک ترانہ مجاہدین فلسطین کے لئے	جو میرا تمہارا رشتہ ہے	شام غربت
گو سب کو بہم ساغر و بادہ تو نہیں تھا	آج شب کوئی نہیں ہے	ترک شاعر ناظم حکمت کے افکار

غبارِ ایام گ্রন্থ থেকে উদাহরণ হিসেবে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন নিম্নে দেয়া হলো :

جب دکھ کی ندیا میں ہم نے
جیون کی ناؤ ڈالی تھی
تھا کتنا کس بل بانہوں میں
لوہو میں کتنی لالی تھیں
یوں لگتا تھا دو ہاتھ لگے
اور ناؤ پورم پار لگی
ایسا نہ ہوا، ہر دھارے میں
کچھ ان دیکھی منجدھاریں تھیں
کچھ مانجھی تھے انجان بہت[৪৩]
(যখন দু:খের নদীতে আমরা

ভাসিয়ে দিয়েছিলাম জীবনের নৌকা
আমাদের বাহুতে কত রক্ত ছিল
আমাদের রক্তে কত রক্তিম আভা
মনে হয়েছিল যেন দুটি হাত স্পর্শ করল
আর নৌকাটি পুরোপুরি পার হয়ে গেল
তেমনটা ঘটেনি প্রতিটি স্রোতে
ছিল কিছু অদৃশ্য স্রোত
কিছু চেনা অনেক অপরিচিত।)

: *حرف حرف*

গ্রন্থটি ভারতের রামপুরের কিতাবকার পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে ফয়েজের চারটি কাব্য সংকলন যেমন- *نکش-ا-فریادی*, *دست-ا-سبا*, *زندانامہ*, *دست-ا تہ-ا سنگ* ছাড়াও তাঁর অপ্রকাশিত বেশ কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে। ওয়াসি আহমদ সিন্দলবী *حرف حرف* গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন :

> *حرف حرف* میں کچھ فیض کا متفرق کلام بھی شائع ہوا ہے۔ جس میں ایک "سہرا" ہے تین گیت ہیں۔ ایک "شام غم" ہے۔ ایک "اقبال" پر نظم ہے۔ "خواب پریشاں" نظم ہے جو زمانہ طالب علمی کی لکھی ہوئی ہے۔ بچوں کے لئے "منیزہ کی سال گرہ" ہے۔ "پرسا، پرسو، پرس رام" کے عنوان سے بچوں کے لئے ایک نظم ہے جو طنز اور مزاحیہ ہے۔ "یتیم لہو" کے نام سے ایک نظم ہے۔[৪৪]
>
> (*حرف حرف*-এ ফয়েজের কিছু বিবিধ কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো 'সোহরা' এবং তিনটি গান। একটি হলো 'শাম-এ গাম'। একটি কবিতা 'ইকবাল'-এর উপর। 'খাব-এ পেরেশাঁ' হলো ছাত্র অবস্থায় লেখা একটি কবিতা। শিশুদের জন্য রয়েছে 'মনিজার জন্মদিন'। শিশুদের জন্য 'পারসা, পারসু, পারস রাম' শিরোনামে একটি ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসাত্মক কবিতা রয়েছে। 'ইয়াতিম লাহু' নামে একটি কবিতাও আছে।)

حرف حرف গ্রন্থে সন্নিবেশিত ফয়েজের বিবিধ কবিতাগুলোর শিরোনাম নিম্নে দেয়া হলো :

آج اور آج کے نام	سہرا	اقبال
جگر لے کے چلو	اے وطن اے وطن	خواب پریشاں
عیش کی لہر	تین گیت	منیزہ کی سال گرہ
یتیم لہو	شام غم	پرسا پرسو پرس رام

حرف حرف গ্রন্থ থেকে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদাহরণ হিসেবে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ
نہ دست و ناخن قاتل نہ آستیں پہ نشاں
نہ سرخیٔ لب خنجر نہ رنگ نوک سناں

نہ خاک پر کوئی دھبہ نہ بام پر کوئی داغ
کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ
نہ صرف خدمت شاہاں کہ خوں بہا دیتے
نہ دیں کی نذر کہ بیعانہ جزا دیتے[৪৫]
(কোথাও রক্তের কোনো চিহ্ন নেই
খুনির হাত ও নখেও না, পায়ের দাগগুলোতেও না
ছুরির রক্তিম ঠোঁটেও না, তরবারির রঙিন ডগাতেও না
মাটিতে এক ফোঁটা রক্তও না, ছাদে একটি দাগও না।
কোথাও রক্তের কোনো চিহ্ন নেই,
রাজার সেবাতেও না,
প্রতিজ্ঞাতেও না, পুরস্কারেও না।)

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের গদ্য সাহিত্য

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ শুধুমাত্র একজন কবিই ছিলেন না, একজন গদ্য সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর মেধা ও সাহিত্যিক যোগ্যতা গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে পড়েছিল। নাট্য সাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য, সমালোচনা সাহিত্য, পত্র সাহিত্য, ভ্রমণ সাহিত্য প্রভৃতি শাখায় ছিল দীপ্ত পদচারণা। এই দিকে ইঙ্গিত করে ড. আশফাক আহমদ আ'জমী বলেন :

> فیض کو بحیثیت ایک شاعر جتنا بلند مقام دیا گیا ہے اس سے اور بھی بلند مقام ملنا چاہیے تھا، لیکن فیض نے نثر میں بھی بہت ہی گراں قدر سرمایہ چھوڑا ہے جو ان کی شاعرانہ عظمت کے نیچے دب کر رہ گیا ہے۔ بہت کم حضرات نے ادھر توجہ کی ہے۔[৪৬]
>
> (কবি হিসেবে ফয়েজকে যতটা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য ছিল। কিন্তু গদ্যেও ফয়েজ এক অত্যন্ত দুর্বল উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, যা তাঁর কাব্যিক মহত্ত্বের নিচে চাপা পড়ে গেছে। খুব কম লোকই এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন।)

প্রাবন্ধিক ও গবেষক আব্দুল মান্নান "فیض کی نثر" প্রবন্ধে বলেন :

> تازہ کاریٔ تخلیق کا جادو نہ صرف شاعری میں سر چڑھ کر بولتا ہے بلکہ نثر میں بھی سحر انگیزی کا ثبوت دیتا ہے۔ فیض کی شاعری جس مقام و مرتبہ کی حامل ہے ان کی نثر کوئی وقعت نہیں رکھتی لیکن ان کے نثری شہ پاروں کا مطالعہ کیجئے تو یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ فیض کا مخصوص میلان اس واسطہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔[৪৭]
>
> (নতুন সৃজনশীলতার জাদু শুধু কবিতাতেই নয়, গদ্যেও সুস্পষ্ট। ফয়েজের গদ্য তাঁর কবিতার মতো একই মর্যাদা ও প্রতিপত্তি পায়নি, কিন্তু যদি আপনি তাঁর গদ্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো অধ্যয়ন করেন, তবে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এই মাধ্যমেও ফয়েজের বিশেষ ঝোঁক সুস্পষ্ট।)

বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক হাসিব আহমদ উসমানী "فیض بحیثیت نثر نگار" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

> فیض کی نثری مضامین کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کامیاب نثر نگار کی حیثیت سے کسی موضوع کے تمام پہلوؤں پ ر غور و خوص کرتے اور تب اپنے ذہن کے جزئیات اور تمام باریک سے باریک تفصیلات کو مرتب کر کے تحریریں لاتے۔ ایک اچھے نثر نگار کی

طرح فیض احمد فیض اپنی تحریر میں تفصیل الفاظ قطعیت، معروضیت اور تخلیقی تصرف کو بنیادی عنصر کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ فیض نے اپنے نثر میں اپنے منفرد اسلوب کے ذریعہ موضوع کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جو اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ [৪৮]

(ফয়েজের গদ্যকর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একজন সফল গদ্য লেখক হিসেবে তিনি কোনো বিষয়ের সকল দিক অন্বেষণ করতেন এবং তারপর তাঁর মনের খুঁটিনাটি ও সমস্ত সূক্ষ্ম বিবরণগুলোকে সাজিয়ে রচনা করতেন। একজন দক্ষ গদ্য লেখকের মতোই ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ তাঁর লেখায় বিশদ বিবরণ, নির্ভুলতা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং সৃজনশীলতাকে মৌলিক উপাদান হিসেবে রাখেন। ফয়েজ তাঁর গদ্যের অনন্য শৈলীর মাধ্যমে এই বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের কাছে বিষয়টি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।)

এ প্রসঙ্গে ড. নিগার ইয়াসমিন তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন :

بحیثیت شاعر ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ اپنے عہد کے لجنڈ بن چکے تھے۔ ہمارے محققوں اور تنقید نگاروں نے فیض کی شاعری کا مختلف زاویوں اور ناحیوں سے جائزہ لیا ہے مگر افسوس کہ ان کی نثر کی طرف نقادوں نے توجہ نہیں دی یا بہت کم دی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ فیض احمد فیض نے زبان و ادب اور شعر و شاعری سے متعلق مضامین، مقدمے، ادارے یئے اور خطوط لکھے ہیں وہ ان کے تنقیدی شعور کا آئینہ دار ہیں۔ [৪৯]

(কবি হিসেবে তাঁর মর্যাদা এতটাই উঁচু যে তিনি তাঁর যুগের কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। আমাদের গবেষক ও সমালোচকেরা ফয়েজের কবিতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও ক্ষেত্র থেকে বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সমালোচকেরা তাঁর গদ্যের প্রতি তেমন মনোযোগ দেননি। বাস্তবতা হলো, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ভাষা, সাহিত্য ও কবিতা সম্পর্কিত প্রবন্ধ, ভূমিকা, নিবন্ধ এবং চিঠি লিখেছেন, যা তাঁর সমালোচনামূলক চেতনারই প্রতিফলন।)

নিম্নে আমরা ফয়েজের গদ্য সাহিত্য চর্চার বিভিন্ন মাধ্যমগুলো নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো :

ফয়েজের নাট্য সাহিত্য :

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ একজন নাট্যকারও ছিলেন। নাটকের প্রতি তাঁর আগ্রহ শুরু হয়েছিল চৌদ্দ বছর বয়সে। শিয়ালকোটে স্কুলে পড়াকালীন সময় থেকেই নাটকের প্রতি তাঁর তীব্র ঝোক সৃষ্টি হয়। সে সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষ করে লাহোর, দিল্লি, বোম্বে থেকে প্রচুর নাটকের দল শিয়ালকোটে আসত। তাদের নাটকগুলো দেখার জন্য প্রচুর দর্শকের সমাগম হত। বিশেষ করে আগা হাশর কাশ্মীরির নাটকের প্রতি দর্শকের চাহিদা থাকতো বেশি। সেই সময়ে আগা হাশর কাশ্মীরির নাটকগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ফয়েজ তাঁর স্কুলের বন্ধুদের সাথে গভীর রাত পর্যন্ত সেগুলি দেখতেন। নাটকের প্রতি তাঁর বাল্যকালের আগ্রহ পরবর্তীতে তাকে নাট্যকার হতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে ফয়েজ নিজেই বলেন :

میں اسٹیج پر جو کچھ دیکھتا، اُس سے ایک عرصے تک متاثر رہتا، خود کو ہیرو تصور کرتے ہوئے تناؤ سے بھرپور ڈرامائی واقعات کو از سرِ نَو شدت سے محسوس کرتا۔ آغا حشر کے ڈراموں کا ہیرو بہادر، نڈر سے مَس نہ ہونے والا اور اپنے عقائد کی خاطر جان پر کھیل جانے والا شخص ہوتا۔ [৫০]

(আমি মঞ্চে যা দেখতাম তাতে আমি দীর্ঘ সময় ধরে মুগ্ধ হয়ে থাকতাম। আমি নিজেকে একজন নায়ক হিসাবে কল্পনা করতাম এবং এক নতুন তীব্রতার সাথে উত্তেজনাপূর্ণ নাটকীয় ঘটনাগুলি অনুভব করতাম। আগা হাশরের নাটকের নায়ক ছিলেন একজন সাহসী, যিনি কোনো ঝুঁকি নিতে ভয় পেতেন না এবং তার বিশ্বাসের জন্য নিজের জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত ছিলেন।)

ফয়েজ অল ইন্ডিয়া রেডিওর জন্য বেশ কিছু নাটক লিখেছিলেন। এর মধ্যে কয়েকটি ১৯৩৮/১৯৩৯ সালের দিকে লাহোরের অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে সম্প্রচারিত হয়। সে সময় ফয়েজ অবশ্য অমৃতসরে ছিলেন। এই নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে - دی احباب ، شکست ، توہینِ عدالت ، پرائیویٹ سیکرٹری ، سانپ کی چھتری اور شب وروز

ফয়েজের প্রবন্ধ সাহিত্য :

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি উর্দু সাহিত্যে আবির্ভূত হন কবি, সাংবাদিক, সংস্কারক, মানব দরদী, আধুনিক উর্দু নযমের প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতি পরিচয়ে, কিন্তু এর বাইরেও তাঁর আরেকটি পরিচয় আছে, আর তা হলো তিনি একজন প্রাবন্ধিকও ছিলেন। তিনি কবিতা লিখার পাশাপাশি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলো দুটি গ্রন্থে গ্রন্থিত করা হয়েছে। এক হল میزان , আর আরেক হল متاعِ لوح و قلم | গ্রন্থ দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

میزان :

এটি ফয়েজের একটি গদ্য গ্রন্থ। কয়েক দফায় এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রথমবার ১৯৬০ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯৬৫ সালে এবং শেষবার ১৯৮৭ সালে। করাচির উর্দু একাডেমি সিন্দ থেকে এটি প্রকাশিত হয়। ৩৪৯ পৃষ্ঠা ব্যাপি এ গ্রন্থে ৩১টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলো সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং জীবনীমূলক বিশ্লেষণধর্মী রচনা। যে প্রবন্ধগুলো এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে তার শিরোনাম নিম্নরূপ :

ادب کا ترقی پسند نظریہ	جدید فکر و خیال کے تقاضے اور غزل	جذبات اقبال کی بنیادی کیفیت
شاعر کی قدریں	جدید اردو شاعری میں اشاریت	جوش۔ شاعر انقلاب کی حیثیت سے
ادب اور جمہور	ادب اور ثقافت	۔۔۔۔ کہ گوہر مقصود گفتگو است
ہماری تنقیدی اصطلاحات	فلم اور ثقافت	آہنگ
فنی تخلیق اور تخیل	نظیر اور حالی	مصر کی رقاصہ
خیالات کی شاعری	غالب اور زندگی کا فلسفہ	خم کاکل
موضوع اور طرز ادا	اردو ناول	میراجی کا فن
پاکستانی تہذیب کا مسئلہ	رتن ناتھ سرشار کی ناول نگاری	وہ لوگ
جہان نو ہو رہا ہے پیدا	شرر	چند روز اور
خطبۂ صدارت	پریم چند	
اردو شاعری کی پرانی روائیتیں اور نئے تجربات	اقبال اپنی نظر میں	

এ প্রবন্ধ সংকলনটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ফয়েজ এর ভূমিকায় বলেন :

> ادبی مسائل پر سیر حاصل بحث کے لئے نہ کبھی فرصت میسر تھی نہ دماغ۔ ریڈیو پر اور مختلف محفلوں میں ان مسائل پر باتیں کرنے کے مواقع البتہ ملتے رہے، یہ مضامین ان ہی باتوں کا مجموعہ ہیں۔ اس لئے ان میں سخن علماء سے نہیں، عام پڑھنے لکھنے والوں سے ہے جو ادب کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، ان میں سے بیشتر اب سے پچیس برس پہلے جوانی کے دنوں میں لکھے گئے تھے۔ بہت سی باتیں جو اس وقت بالکل نئی تھیں اب پامال نظر آتی ہیں اور بہت سے مسائل جو ان دنوں بالکل سادہ معلوم ہوتے تھے، اب کافی پے چیدہ دکھائی دیتے ہیں۔[৫২]

(সাহিত্য বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য কখনো সময় বা মন ছিল না। রেডিওতে এবং বিভিন্ন সমাবেশে এই বিষয়গুলা নিয়ে কথা বলার সুযোগ সবসময় থাকতো। এই প্রবন্ধগুলো সেইসব আলোচনারই একটি সংকলন। তাই এগুলো শিক্ষকদের জন্য নয়, বরং সাধারণ পাঠক ও লেখকদের জন্য, যারা সাহিত্য সম্পর্কে কিছু জানতে চায়। এগুলোর বেশিরভাগই পঁচিশ বছর আগে আমার যৌবনকালে লিখা। সেই সময়ে অনেক কিছুই যা সম্পূর্ণ নতুন ছিল, এখন তা মামুলি মনে হয়, এবং অনেক সমস্যা যা তখন খুবই সহজ মনে হতো, এখন তা বেশ জটিল বলে মনে হয়।)

আলোচ্য গ্রন্থের "ادب اور جمہور" প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি লাইন উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হল :

> آج کل ادب اور عوام کے متعلق کچھ اس لہجہ میں گفتگو کی جاتی ہے، گویا عوام کا ادب ابھی ابھی ہمیں نے ایجاد کیا ہے اور بیسویں صدی سے پہلے نہ عوام کو ادب سے کوئی دلچسپی تھی نہ ادب کو عوام سے یہ بات صحیح نہیں اول تو دنیا میں ادب اور آرٹ کی ابتدا اس وقت ہوئی جب عوام اور خواص کے طبقے موجود ہی نہیں تھے۔ اور یہ ابتدائی ادب یقیناً کسی اعلیٰ طبقہ کا ترجمان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جب انسان مختلف ادنی اور اعلیٰ طبقوں میں بٹ گئے تو بھی عوام میں ادبی تخلیق کی روایت بالکل مردہ ہونے نہیں پائی وہ مفلس اور محنت کش تو تھے، گونگے اور بہرے نہیں تھے۔ جذباتی تسکین و تفریح کی انھیں بھی ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ ہر دور میں قصے کہانیاں، گیت اور دوہے کہتے اور سنتے رہے۔[৫৩]

(আজকাল সাহিত্য ও গণমানুষকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যেন গণসাহিত্য সম্প্রতি কিছু লোকের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বিংশ শতাব্দীর আগে সাহিত্যে জনগণের কোনো আগ্রহ ছিল না, আবার জনগণের মধ্যে সাহিত্যেরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এটা সত্য নয়। প্রথমত, বিশ্বে সাহিত্য ও শিল্পের সূচনা হয়েছিল যখন গণমানুষ ও অভিজাত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। এবং এই প্রাথমিক সাহিত্য অবশ্যই কোনো উচ্চ শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিল না। এছাড়া, যখন মানুষ বিভিন্ন নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, তখনও গণমানুষের মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টির ঐতিহ্য পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তারা দরিদ্র ও হীন ছিল, তারা বোবা বা বধির ছিল না। তাদেরও মানসিক তৃপ্তি ও বিনোদনের প্রয়োজন ছিল।)

: متاع لوح و قلم

متاع لوح و قلم ফয়েজ আহমদের গদ্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ। এটি মূলত একটি গদ্য সংকলন। ফয়েজ তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন সামাজিক ও সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর সেসকল কর্মযজ্ঞকে অধ্যায় ভিত্তিক করে এ গ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছে। ফয়েজের বিভিন্ন সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা, প্রবন্ধমালা, রেডিও-টিভিতে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন গ্রন্থের জন্য রচিত ভূমিকা, চিঠিসমূহ. মতামত, নাটক ইত্যাদি এ গ্রন্থে যুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তাঁকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন জনের মতামতও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি ফয়েজ তাঁর প্রিয় শিক্ষক

সুফী গোলাম মোস্তফা তাবাছ্ছুম-এর নামে উৎসর্গ করেন। মির্জা জাফরুল হকের সম্পাদনায় ১৯৭৩ সালে করাচি থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ড. আশফাক আহমদ আ'জমী বলেন :

> ان کی بہت سی تحریریں منتشر حالت میں پڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ تحریروں کو مرزا ظفر الحسن مرحوم نے "متاع لوح و قلم" کے ناموں سے بھی شائع کیا ہے۔ فیض ادبی اور غیر ادبی موضوعات پر وقتاً فوقتاً اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ "متاع لوح و قلم" میں انہی کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ ان کتابوں کی بعض تحریریں کافی اہمیت رکھتی ہیں۔[৫৪]
>
> (তাঁর অনেক লেখাই বিক্ষিপ্ত। এর মধ্যে কয়েকটি মরহুম মির্জা জাফরুল হাসান কর্তৃক "متاع لوح و قلم" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ফয়েজ সময়ে সময়ে সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করে আসছেন। এই মতামতগুলোকেই "متاع لوح و قلم" গ্রন্থে একত্রিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থের কিছু লেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।)

মির্জা জাফরুল হাসান "متاع لوح و قلم" সম্পর্কে বলেন :

> گذشتہ چالیس پینتالیس سال کی مدت میں فیض نے بر صغیر پاک و ہند کے علمی، ادبی اور دوسرے اداروں میں سینکڑوں تقریریں کی ہیں، ریڈیو سے بہت کچھ نشر کیا ہے۔ رسائل جرائد اور نیوز ایجنسیوں کو انٹرویو دئے ہیں۔ ملکی غیر ملکی ٹی وی پر اور کانفرنسوں سے خطاب کیا ہے۔ اس سارے ریکارڈ کا جمع ہونا یا جمع کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔[৫৫]
>
> (বিগত পঁয়তাল্লিশ বছরে ফয়েজ ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাঙ্গন, সাহিত্য ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শত শত বক্তৃতা দিয়েছেন, রেডিওতে প্রচুর সম্প্রচার করেছেন, পত্রিকা, সাময়িকী ও সংবাদ সংস্থাগুলোকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং দেশি-বিদেশি টেলিভিশনে সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছেন। এই সমস্ত নথি সংগ্রহ বা সংকলন করা কতই না কঠিন।)

"متاع لوح و قلم" গ্রন্থে চারটি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলো নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে :

প্রথম অধ্যায় : বক্তৃতামালা, প্রবন্ধসমূহ. সাক্ষাৎকার
দ্বিতীয় অধ্যায় : ভূমিকা , চিঠি , অভিমত
তৃতীয় অধ্যায় : ধারাবিবরণী, ব্যঙ্গ , নাটক
চতুর্থ অধ্যায় : ফয়েজিয়াত (অর্থাৎ ফয়েজ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের অভিমত)

ফয়েজের ভ্রমণ সাহিত্য :

উর্দু কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজের গদ্যসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো سفر نامہ کیوبا। এ গ্রন্থটি ভ্রমণ সাহিত্য মূলক একটি রচনা। এটি মূলত তাঁর ১৯৭৩ সালে কিউবা সফরের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লেখা একটি ভ্রমণ কাহিনী।

ফয়েজ ১৯৭৩ সালে বিপ্লব-পরবর্তী কিউবা সফর করেন। এই সফর ছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আমন্ত্রণভিত্তিক। কিউবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলে। সেই অভিজ্ঞতাই سفر نامہ کیوبا -তে প্রতিফলিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি কেবল একজন পর্যটক হিসেবে নয়, বরং একজন সমাজসচেতন চিন্তাবিদ হিসেবে কিউবার বাস্তবতা উপলব্ধি করেছেন। তাঁর লেখায় কিউবার প্রকৃতি, নগরজীবন ও মানুষের দৈনন্দিনতা যেমন এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে বিপ্লব-উত্তর সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ও সম্ভাবনার গভীর বিশ্লেষণ।

এই গ্রন্থের বিশেষত্ব হলো–এটি নিছক ভ্রমণবৃত্তান্তে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এতে রাজনৈতিক চেতনা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির এক সংমিশ্রণ দেখা যায়। ফয়েজ কিউবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এক নতুন মানবিক সমাজ গঠনের প্রয়াস হিসেবে দেখেছেন। তাঁর ভাষায়, বিপ্লবের পর কিউবার সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আত্মমর্যাদা ও অংশগ্রহণের চেতনা তৈরি হয়েছে, তা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একই সঙ্গে ফয়েজ কিউবার বিপ্লবকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেখেছেন। তাঁর মতে, এটি শুধু একটি দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, বরং বিশ্বব্যাপী শোষিত মানুষের জন্য এক অনুপ্রেরণা।

কিউবা সফরে ফয়েজ বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, একসময় যে দেশের মানুষেরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণে অভ্যস্ত ছিল, তারা কেমন করে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণহীন এক নতুন সমাজ গড়ে তুলছে। এটি তাকে বেশ অবাক করে। তিনি মনে করেন, কিউবানদের এই পরিবর্তন সারা বিশ্বের নিপীড়িতদের জন্য আশার আলো। ফয়েজ এ গ্রন্থে কিউবান বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেন এবং এ বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করেন। ফাতেমা শেহজাদ তাঁর এক প্রবন্ধে ফয়েজের কিউবা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। যেখানে ফয়েজ বলছেন এভাবে :

> About Cuba, we had no clear image, no picture in our minds. We knew only that there were American gangsters there, and many bars and gambling dens … hen came the revolution. A strange feeling arose – that in this distant, unknown island, a peculiar flame has been lit, the light of which begins to dazzle the eyes of Russia and America, and you and me. You too must have wondered what this flame is and why. Last month I had the opportunity to see the sparks of this fire with my own eyes and to feel its warmth in my own body.[৫৬]
>
> (কিউবা সম্পর্কে আমাদের মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা বা ছবি ছিল না। আমরা শুধু জানতাম যে সেখানে আমেরিকান গুন্ডারা আছে, আর আছে অনেক বার আর জুয়ার আড্ডা তারপর এলো বিপ্লব। এক অদ্ভুত অনুভূতি জেগে উঠল- যে এই দূরবর্তী, অচেনা দ্বীপে এক বিশেষ শিখা জ্বলে উঠেছে, যার আলো রাশিয়া ও আমেরিকার, এমনকি আপনার ও আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে শুরু করেছে। আপনিও নিশ্চয়ই ভেবেছেন এই শিখাটা কী এবং কেন ? গত মাসে আমার নিজের চোখে এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখার এবং নিজের শরীরে এর উষ্ণতা অনুভব করার সুযোগ হয়েছিল।)

مہ وسال آشنائی :

এ গ্রন্থটি ফয়েজের স্মৃতিকথার একটি সংকলন। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণকালে ঘটমান বিভিন্ন সময়ের স্মৃতিকে এতে একত্রিত করা হয়েছে। গ্রন্থটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়টি হলো تصور বা কল্পনা, দ্বিতীয়টি تعارف বা পরিচিতি, তৃতীয়টি مناظر বা দৃশ্য, চতুর্থটি داغستان বা দাগেস্তান , পঞ্চমটি مکالمے সংলাপ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়টি منظومات اور تراجم বা মানজুমাত এবং অনুবাদ। এ সকল অধ্যায়গুলোতে ফয়েজের এমন সব স্মৃতি রয়েছে, যেগুলোতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। ১৯৩ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ১৯৭৯ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়।

উর্দু ভাষার অনেক লেখক ও কবি তাদের আত্মজীবনী লিখেছেন, যার মধ্যে কিছু তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে এবং কিছু অন্যদের অনুরোধে লেখা। আমরা যখন ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের স্মৃতিকথা সংকলন مہ وسال آشنائی

অধ্যয়ন করি, তখন এর ভূমিকায় দেখতে পাই যে, ফয়েজ এটি মস্কোতে থাকা তাঁর কমিউনিস্ট ভাবধারার বন্ধুদের অনুরোধে লিখেছিলেন। এতে তিনি কেবল ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর বিভিন্ন সফরের অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করেননি, বরং তাঁর শৈশবের সেইসব মুহূর্ত, অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের কথাও বর্ণনা করেছেন যা তাঁর স্মৃতিতে গেঁথে ছিল।

স্মৃতিচারণমূলক লিখায় লেখকের ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন নেই, বরং তিনি যা দেখেছেন, শুনেছেন, বুঝেছেন এবং অনুভব করেছেন, তা সম্পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে উপস্থাপন করাই মূল বিষয়। ফয়েজের এই সংকলনটিতে এসব বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। সহজ সরল গদ্য শৈলিতে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে রিসার্চ স্কলার বিলাল আহমদ দার তার এক প্রবন্ধে বলেন :

> فیض کو انگریزی، عربی اور فارسی زبان پر گہری نگاہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختلف اسالیب کو سامنے رکھ کر ایک نئے اسلوب نثر کا تجربہ بھی کیا ہے جو اردو کی نثری روایت میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ فیضؔ کے اس مجموعے کے اسلوب کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ مدلل، جامع اور مفصل ہے۔ اس میں کہیں بھی ادھورے پن اور تشنگی کا احساس نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس مجموعے میں عام فہم، سادہ اور آسان اسلوب اور زبان کا استعمال کیا ہے۔ اس میں سادگی، سلاست اور ادیبانہ طرزِ تخاطب بھی ہے۔[৫৭]
>
> (ইংরেজি, আরবি ও ফারসি ভাষার প্রতি ফয়েজের গভীর অনুরাগ ছিল এবং একারণেই তিনি ভিন্ন ভিন্ন শৈলী উপস্থাপনের মাধ্যমে গদ্যের এক নতুন ধারার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, যা উর্দু গদ্য ঐতিহ্যে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ফয়েজের এই সংকলনের শৈলীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যা লিখেছেন তা যুক্তিনির্ভর, ব্যাপক এবং বিস্তারিত। এর কোথাও কোনো অপূর্ণতা বা একঘেয়েমির অনুভূতি নেই। এই সংকলনে তিনি সাধারণ জ্ঞান, সরল ও সহজবোধ্য শৈলী এবং ভাষা ব্যবহার করেছেন। এতে সরলতা, সাবলীলতা এবং বাচনভঙ্গির একটি সাহিত্যিক আঙ্গিকও রয়েছে।)

এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়গুলোর শিরোনাম গভীর দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথম অধ্যায় *تصور* বা কল্পনা শিরোনামে ফয়েজ তাঁর শৈশবের সেইসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যা তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। এতে তিনি রাশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। *تعارف* বা পরিচিতি শিরোনামের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফয়েজ সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় তুলে ধরেছেন। তৃতীয় অধ্যায় *مناظر* বা দৃশ্য শিরোনামে ফয়েজ সাইবেরিয়া ও বিভিন্ন শহরের দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। চতুর্থ *داغستان* বা দাগেস্তান অধ্যায়ে ফয়েজ দাগেস্তানের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। পঞ্চম *مکالمے* বা সংলাপ অধ্যায়ে তিনি রাশিয়ার বিভিন্ন কবি ও লেখকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করেছেন, তাদের লেখা চিত্র তুলে ধরেছেন এবং তাদের সঙ্গ থেকে উপকৃত হয়ে বহু কবিতা ও অনুবাদ রচনা করেছেন, যেগুলো এই সংকলনের শেষে *منظومات اور تراجم* বা মানজুমাত এবং অনুবাদ অধ্যায়ে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

ফয়েজের সমালোচনা সাহিত্য :

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ একজন কবি হিসেবে বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। এ প্রসঙ্গে বিশ্বজুড়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। কিন্তু তিনি যে একজন সাহিত্য সমালোচকও ছিলেন সেটি আড়ালেই রয়ে গেছে। তাঁর এ দিকটির দিকে তেমন

মনোযোগ দেওয়া হয়নি। যদিও এটি সত্য যে কবি হিসেবে ফয়েজ যতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন সাহিত্য সমালোচক হিসেবে ততখানি অর্জন করতে পারেননি। এর অন্যতম কারণ এটির হতে পারে যে তিনি তাঁর সমস্ত মনোযোগ কবিতার দিকেই নিবদ্ধ রেখেছিলেন এবং সমালোচনার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেননি। তাই তাঁর কবিতার তুলনায় সমালোচনাধর্মী রচনার পরিমাণ খুবই কম। এ কারণেই তাঁর কবিতা নিয়ে যতটা লেখা হয়েছে, তাঁর সমালোচনা নিয়ে ততটা লেখা হয়নি। ফয়েজ কবি হিসেবে যতখানি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছেন সমালোচনায় ততখানি নন। এ প্রসঙ্গে জাভেদ আখতার বলেন :

> نثری تحریروں میں فیض وہ معیار بھی قائم نہیں کر سکا جو اس کی شاعری کا معیار ہے۔ اس وجہ سے اس کی شاعری پر جس قدر لکھا گیا اس قدر اس کی نثر خصوصا اس کی تنقید پر نہیں لکھا گیا ہے۔[৫৮]
>
> (গদ্য রচনায় ফয়েজ সেই মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি যেটি কবিতার ক্ষেত্রে ছিল। এ কারণেই তাঁর কবিতা নিয়ে যতটা লেখা হয়েছে, তাঁর গদ্য বিশেষত সমালোচনা নিয়ে ততটা লেখা হয়নি।

ড. আওরঙ্গজেব নিয়াজী বলেন :

> فیض اپنی اولیں حیثیت میں شاعر ہیں۔ ان کی تنقیدی حیثیت زیادہ مستحکم نہیں ہے۔[৫৯]
>
> (ফয়েজ প্রথম সারির একজন কবি। তাঁর সমালোচনামূলক অবস্থান খুব একটা স্থিতিশীল নয়।)

ফয়েজের সমালোচনা সাহিত্য প্রসঙ্গে ড. শফিক আশরাফি লিখেছেন :

> فیض نے ایک شاعر کی حیثیت سے جو مرتبہ حاصل کیا، ایک نقاد کی حیثیت سے اس بلندی تک تو نہ پہنچ سکے لیکن یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی شاعری میں جس نظریہ پر زندگی کے آخری لمحے تک قائم رہے، اپنے مضامین کے ذریعے بھی اس کی تبلیغ کرتے رہے۔[৬০]
>
> (ফয়েজ একজন কবি হিসেবে যে উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন, একজন সমালোচক হিসেবে তিনি সেই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেননি, কিন্তু এই দিকটি উপেক্ষা করা যায় না যে তিনি তাঁর কবিতায় অনুসৃত আদর্শ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রচার করে গেছেন।)

ফয়েজ একজন মার্কসবাদী ছিলেন। যেটি তাকে একজন প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। ফলে তাঁর কাব্যে ও গদ্যে প্রগতিশীলতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধেও প্রগতিশীল ভাবনার বহি:প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। । মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার ফলে তাঁর চিন্তা-চেতনায় ও লেখালেখিতে প্রগতিশীলতা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এখন তিনি মানুষ, সমাজ এবং বিশ্বকে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করেন। তাঁর লেখনির সুরও একজন মার্কসবাদী বিপ্লবীর সুরে পরিণত হয়। তিনি মার্কসবাদী তত্ত্ব থেকে শিল্প ও সাহিত্যকেও পরীক্ষা করতে শুরু করেন।

ফয়েজের গদ্য সংকলন 'মীযান'-এ তাঁর বেশ কিছু সমালোচনামূলক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। যেমন-*ادب کا ترقی پسند نظریہ*, *جذبات اقبال کی بنیادی کیفیت*, *غالب اور زندگی کا فلسفہ*, *نظیر اور حالی*, *خیالات کی شاعری*, *فنی تخلیق اور تخیل*, *ہماری تنقیدی اصطلاحات*, *شرر, پریم چند*, *موضوع اور طرز ادا*, *جدید فکر و خیال کے تقاضے اور غزل*, প্রভৃতি। এর মধ্য থেকে দুই একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল :

ফয়েজের সমালোচনামূলক চেতনা ছিল অত্যন্ত পরিণত। তিনি যে কোনো সাহিত্যকর্মকে শিল্পের মানদণ্ডে বিচার করতেন এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার বিশ্লেষণ করতেন, তারপরই নিজের মতামত প্রকাশ করতেন। *شرر* প্রবন্ধে

তিনি আবদুল হালিম শাররের উপন্যাসিক হিসেবে মর্যাদা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন এবং *فسانہ آزاد* -কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতেও অস্বীকার করেছেন। তিনি যুক্তির মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন। তিনি *فسانہ آزاد* -এর চরিত্র চিত্রণের পদ্ধতি, চরিত্রগুলোর ব্যক্তিত্ব এবং তাদের সংলাপে একরূপতাকে একটি বড় দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> وہ ہر بات کو ایک ہی لہجے اور ایک ہی انداز میں کہتے ہیں، ایک ناول نویس میں یہ خوبی کمزوری میں بدل جاتی ہے۔ اسے ہر قسم کے اشخاص، ہر طرح کے کردار پیش کرتا ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کا اظہار واقعات سے زیادہ ان کی گفتگو اور بول چال کے ذریعہ ہوتا ہے، اگر وہ سب کے سب ایک ہی طریقے سے گفتگو کریں تو ان کے شخصی امتیازات بہت حد تک فنا ہو جاتے ہیں، شرر میں یہی بڑی کمزوری ہے۔ وہ بول چال کو مختلف سانچوں میں نہیں ڈھال سکتے، ان کے سب کردار ایک ہی زبان میں گفتگو کرتے ہیں اور وہ ان کی اپنی زبان نہیں قصہ گوئی کی زبان ہے۔[৬১]
>
> (তিনি প্রত্যেক বিষয় একই সুরে এবং একই ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। একজন উপন্যাসিকের ক্ষেত্রে এই গুণই দুর্বলতায় পরিণত হয়। তাকে নানা ধরনের মানুষ এবং বিভিন্ন চরিত্র উপস্থাপন করতে হয়। তাদের ব্যক্তিত্ব মূলত ঘটনার চেয়ে বেশি তাদের কথাবার্তা ও সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যদি সবাই একইভাবে কথা বলে, তবে তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনেকটাই মুছে যায়। শাররের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এখানেই–তিনি কথোপকথনকে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে ঢালতে পারেন না। তার সব চরিত্র একই ভাষায় কথা বলে, আর সেটি তাদের নিজস্ব ভাষা নয়, বরং গল্পকারের ভাষা।)

پریم چند প্রবন্ধে ফয়েজ উর্দু গদ্য সাহিত্যের অমর দিকপাল মুনশী প্রেমচাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রেমচাঁদ নি:সন্দেহে মহান কথাসাহিত্যিকদের একজন, যার মহত্ত্ব এবং শিল্পকর্ম সকলেই স্বীকার করেছেন। এতে কোনো দ্বিমত নেই যে তার উপন্যাস ও গল্পসমূহ বাস্তব জীবনের মাটির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এগুলো সাধারণ মানুষের হৃদয়ের ভাষা প্রকাশ করে এবং আমাদের বাস্তব জীবনে পথনির্দেশ দেয়। তবে এটাও সমানভাবে সত্য যে সমালোচকেরা তার সাহিত্যকে যথাযথ শিল্পমানের কষাঘাতে বিচার করেননি। প্রেমচাঁদের রচনাগুলো আরো গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত ছিল, কিন্তু তা করা হয়নি; বরং ভক্তি ও ভালোবাসার দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হয়েছে। কিন্তু ফয়েজ আহমদ ফয়েজ তেমনটি করেননি, বরং তিনি প্রেমচাঁদের গল্প ও উপন্যাসকে সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করেছেন এবং তার নীতিগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রেমচাঁদের রচনায় বহু ত্রুটির দিকও নির্দেশ করেছেন। প্রেমচাঁদ সম্পর্কে তিনি বলেন :

> ان کو ناول اور افسانے کی پلاٹ کی تعمیر میں کوئی دسترس نہیں۔ وہ بہت سے سوال اٹھاتے ہیں لیکن ان کا جواب دینے کے بجائے آنکھ بچا لیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر یہ سب درست ہے تو پھر پریم چند کی کیا عظمت رہ جاتی ہے؟[৬২]
>
> (তিনি উপন্যাস ও গল্পের প্লট নির্মাণে তেমন দক্ষ নন। তিনি অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেন, কিন্তু সেগুলোর উত্তর দেওয়ার বদলে এড়িয়ে যান। আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি এসবই সত্য হয়, তাহলে প্রেমচন্দের মহত্ত্ব কোথায় থাকে?)

প্রেমচাঁদের রচনায় যে গ্রাম্য ভাষার ব্যবহার দেখা যায়, তা সাধারণত সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে এবং এটিকে তাঁর একটি বিশেষ গুণ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু অন্যান্য সমালোচকদের বিপরীতে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রেমচাঁদের গ্রাম্য ভাষা ব্যবহারের সমালোচনা করে তিনি বলেন :

نہ جانے پریم چند کو بیٹھے بٹھائے دیہاتی زبان کا استعمال کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، عام طور سے ان کی دیہاتی زبان صرف اتنی ہے کہ حضور کو ہجور اور مشکل کو مسکل لکھ دیا جائے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایک دیہاتی ایک ہی تقریر میں ایک فقرہ دیہاتی زبان میں بولتا ہے اور دوسرا فقرہ اچھی خاصی لکھنوی اردو میں۔[৬৩]

(কেন যে প্রেমচাঁদ হঠাৎ করে গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করতে গেলেন, তা বোঝা কঠিন। সাধারণত তাঁর গ্রাম্য ভাষা বলতে এতটুকুই–'মুশকিল' শব্দকে 'মুসকিল' লিখে দেওয়া। আর মজার বিষয় হলো, এক গ্রাম্য চরিত্র একই বক্তৃতায় একবার গ্রাম্য ভাষায় কথা বলে, আর পরের বাক্যেই খাঁটি লখনৌর উর্দু ব্যবহার করে।)

নযীর اور حالی প্রবন্ধে ফয়েজ উর্দু সাহিত্যের জনপ্রিয় দুইজন কবির কবিতা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি উর্দু সাহিত্যে দুই সময়ে আগমন করা দুইজন কবির তুলনামূলক আলোচনাও এতে তুলে ধরেছেন। ফয়েজ কখনো দুই কবির সামাজিক পরিবেশকে উপেক্ষা করে তাদের তুলনা করেননি, বরং সর্বদা তা মাথায় রেখেছেন। যেমন, হালি এবং নাজিরকে তাদের সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখে তিনি তাদের বিদ্রোহী কবি আখ্যা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাদের তুলনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

نظیر اور حالی دونوں باغی شاعر تھے۔ دونوں پرانی درباری شاعری میں رسوم و روایات سے بیزار ایک نئی طرزِ سخن ایجاد کرنے کے خواہاں تھے۔ دونوں کی یہ کوشش رہی کہ شاعری جھوٹے اور رسمی جذبات سے ہٹ کر واقعات اور حقیقت کی طرف لوٹ آئے۔ دونوں میں مختلف طریقوں سے شعر اور زندگی کا درمیانی فاصلہ کم کرنا چاہا۔ شعر کو ایک محدود طبقہ کے چنگل سے چھڑا کر اس کی لذتیں عوام میں بانٹنا چاہیں۔[৬৪]

(নাজির ও হালি উভয়েই ছিলেন বিদ্রোহী কবি। পুরনো রাজদরবারের কবিতার রীতিনীতি ও ঐতিহ্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উভয়েই এক নতুন বাচনভঙ্গি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। উভয়েই কবিতাকে কৃত্রিম ও আনুষ্ঠানিক আবেগ থেকে দূরে সরিয়ে ঘটনা ও বাস্তবতার দিকে ফেরাতে চেয়েছিলেন। উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কবিতা ও জীবনের মধ্যকার দূরত্ব কমাতে চেয়েছিলেন। তাঁরা কবিতাকে একটি সীমিত শ্রেণীর কবল থেকে মুক্ত করে এর আনন্দ জনসাধারণের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন।)

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের সমালোচনায় কোনো বাড়াবাড়ি ছিল না। অতিকথন বা অতিরঞ্জণ তাঁর সমালোচনায় দেখা যায় না। তিনি ভারসাম্য এবং নিরপেক্ষতার উপর জোড় দিয়েছেন বেশি। এ দিকে ইঙ্গিত করে ড. ইরতাজা করিম বলেন :

فیض کے تنقیدی رویہ میں جو وضعداری، غیر جانبداری، گہرائی اور وسعت ہے جو توازن اور استدلال ہے، وہ ان کی شاعری کا بھی حصہ ہے اور شخصیت کا بھی۔ دراصل وہ بڑے صابر اور کم گو انسان تھے۔ جو بات کہتے کا غور و فکر کے بعد۔ ان میں وزن بھی ہوتا اور وقار بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تنقیدی مضامین میں بھی توازن کا احساس برابر قائم رہتا ہے۔ اور خود مجموعہ کا نام میزان اپنی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔[৬৫]

(ফয়েজের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির কমনীয়তা, নিরপেক্ষতা, গভীরতা এবং প্রশস্ততা, যা ভারসাম্য এবং যুক্তির উপর ভিত্তি করে, তা তাঁর কবিতা এবং ব্যক্তিত্বের অংশ। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং স্বল্পভাষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাবধানে বিবেচনা করে কথা বলতেন। তাঁর মধ্যে ওজন এবং মর্যাদা উভয়ই ছিল। এই কারণেই তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলিতে সর্বদা একটি ভারসাম্যের অনুভূতি উপস্থিত থাকে। এবং সংকলনটির নাম *মিজান* নিজেই এর বিশেষত্ব নির্দেশ করে।)

ফয়েজের পত্র সাহিত্য :

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ছিলেন একজন বিশিষ্ট উর্দু কবি ও গদ্য লেখক। উর্দু পত্রসাহিত্যেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ফয়েজের চিঠিগুলো সাধারণত তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পরিবার বা সাহিত্যিক মহলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে লেখা হতো। এই চিঠিগুলোতে তাঁর ব্যক্তিত্বের নানা দিক প্রতিফলিত হয়, যেমন -ভালোবাসা, সহানুভূতি, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি, বুদ্ধিবৃত্তিক গভীরতা এবং মানবিক বিষয়াবলি নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা ইত্যাদি।

ফয়েজের চিঠিগুলো রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়েও গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। তিনি সাম্রাজ্যবাদ, শ্রেণী সংগ্রাম, স্বাধীনতা এবং মানবতাবাদের মতো বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রকাশ করেছেন।

ফয়েজের চিঠিপত্রেও সাহিত্যিক শৈলী, আলঙ্কারিক ভাষা এবং কবিতার আভাস পাওয়া যায়। তাঁর লেখার ধরণ কাব্যিক, যাতে অনুভূতি ও আবেগের গভীরতা রয়েছে।

প্রাবন্ধিক আব্দুল মান্নান তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন :

> فیض کے خطوط میں ایک ایسے فن کار کا دل دھڑکتا نظر آتا ہے جو ہزار ہا آرزوؤں سے لبریز ہے اور جس کے خیال میں آزادی کا تصور رقص کرتا نظر آتا ہے۔[৬৬]
>
> (ফয়েজের চিঠিপত্রে দেখা যায় এক শিল্পীর হৃদয়ের স্পন্দন, যা হাজারো বাসনায় পূর্ণ এবং যার মনে স্বাধীনতার ধারণাটি যেন নৃত্য করে।)

কারাগারের চিঠি :

ফয়েজের জীবনে কারাবাসের সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারাগার থেকে লেখা তাঁর চিঠিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সেগুলিতে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দু:খ, আশা, ভালোবাসা, মানবিক সংগ্রাম এবং তাঁর সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি চিত্র এঁকেছেন।

صلیبیں مرے دریچے میں :

এটি কারাগার থেকে ফয়েজের লেখা চিঠির একটি সংকলন, যেখানে তাঁর অন্তরের যাত্রা, স্বপ্ন, আশা এবং রাজনৈতিক চেতনা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে *متاع لوح و قلم* গ্রন্থের ভূমিকাংশে বলা হয়েছে :

> صلیبیں مرے دریچے میں فیض کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو ایام اسیری میں ایلس فیض کے نام لکھے گئے تھے۔ ان خطوط میں موضوعات کا بے انتہا تنوع ملے گا۔ محبت، پیار، حسن، زندگی، مطالعہ، شاعری، خود بینی، شکایتیں، حکایتیں، کاہلی، کاروبار وغیرہ، ادیبوں اور ادب پاروں پر فیض کا تبصرہ۔[৬৭]
>
> (*صلیبیں مرے دریچے میں* হলো ফয়েজের সেইসব চিঠির সংকলন, যা তিনি তাঁর বন্দিদশার দিনগুলিতে অ্যালিস ফয়েজকে লিখেছিলেন। এই চিঠিগুলিতে নানা বিষয় উঠে এসেছে। যেমন–প্রেম, স্নেহ, ভাবনা, জীবন, পড়াশোনা, কবিতা, আত্ম-প্রতিফলন, অভিযোগ, গল্প, অলসতা, ব্যবসা ইত্যাদি। লেখক ও সাহিত্যিকদের নিয়েও ফয়েজের মন্তব্য রয়েছে।)

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের ৩৩০ টির অধিক চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে তিনি প্রায় অর্ধেক চিঠি লিখেছেন তার স্ত্রী এলিস ফয়েজ এবং দুই সন্তানকে । এলিসকে তিনি ইংরেজি ভাষায়, দুই সন্তান সালিমা এবং মনিযাকে ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় আর বাকীদের উর্দুতে চিঠি লিখেন। এলিসকে লিখা ইংরেজি চিঠিগুলো তিনি নিজেই উর্দুতে অনুবাদ করেন যা ১৯৭১ সালে صلیبیں مرے دریچے میں নামে প্রকাশিত হয়।

دامن یوسف :

صلیبیں مرے دریچے میں ছাড়াও মুহতারেমা সারফরাজ ইকবালকে লিখা ৫৫ টি চিঠি নিয়ে دامن یوسف গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯৮৯ সালে এটি লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ থেকে একটি চিঠি উদাহরণ হিসেবে নিম্নে তুলে ধরা হল :

کراچی

10 فردری

عزیزی سرفراز

آپ کا خط ملا بھئی شکایت تو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو شکوہ کیسا؟ جس رات میں وہاں پہنچا ہوں اس سے اگلے دن اقبال کا فون آیا کہ آپ لوگ شام کو آئیں گے۔ چنانچہ میں نے انتظار کیا۔ اس سے اگلے دن میں قریب قریب سب وقت اسلام آباد میں تھا۔ شام کو لوٹ کر پھر انتظار کیا۔ ہوٹل والوں سے بھی دریافت کیا کہ کوئی پیغام تو نہیں ہے تو جواب نفی میں ملا۔ ہفتے کی صبح اقبال کو ٹیلی فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دفتر ہی نہیں آئے۔ مجھے خیال گزرا کہ شاید آپ لوگ کہیں شہر سے باہر چلے گئے۔ اسی سہ پہر کو میں چلا آیا اس لئے ملاقات نہ ہو سکی جس کا افسوس ہے۔ بہر حال تمہاری میزبانی سے لطف اندوز ہونے کا ارادہ ہم نے ہرگز ترک نہیں کیا جب بھی آیا ہوا تمہاری یہ ضد بھی پوری ہو جائے گی۔ ۱۳ فروری تو اب یہیں گزرے گی۔ لیکن اس کے بعد جب بھی طلبی ہوئی تمہیں مطلع کر دوں گا۔

اقبال صاحب اور بچوں کو دعا۔

فقط

فیض[৬৮]

মৃত্যু :

ফয়েজ দীর্ঘাদন ধরে হাঁপানি রোগে ভুগছিলেন। জীবনের শেষ সময়ে এ রোগ তাকে যথেষ্ট দুর্বল করে দিয়েছিল। ১৯৮৪ সালের গ্রীষ্মে ইউরোপ থেকে ফেরার কয়েকদিন পরেই ফয়েজের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তাঁর শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। অবস্থার অবনতি হলে ১৮ই নভেম্বর রাতে ফয়েজকে লাহোরের মেয়ো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাকে বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি ১৯৮৪ সালের ২০শে নভেম্বর লাহোরের মেয়ো হাসপাতালেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তাকে লাহোরের মডেল টাউন কবরস্তানে দাফন করা হয়।[৬৯]

ফয়েজ সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মূল্যায়ণ :

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মূল্যায়ণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

- গোপী চান্দ নারাঙ্গ (Gopi Chand Narang) বলেন :

  Faiz ahmad faiz is the most significant poet of Urdu, and an understanding of contemporary Urdu poetry is not complete without a recognition of the importance of his work [৭০]

  (ফয়েজ আহমদ ফয়েজ উর্দু ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি, এবং তাঁর কাজের গুরুত্বকে স্বীকার না করলে সমসাময়িক উর্দু কবিতা বোঝা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।)

- নিকোলা বেনিন (Nikola Benin) বলেন :

  Faiz became a source of great ideological power. His voice always rang high and clear and during the grave-like silence of martial law rule, his words remained a beacon of light that could not be extinguished. His poetry is a celebration of life and an affirmation of the law of change. He was a man singularly devoid of prejudice. He fought bigotry, not with bigotry, but with tolerance.[৭১]

  (ফয়েজ এক বিরাট আদর্শিক শক্তির উৎস হয়ে ওঠেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সর্বদা উচ্চ ও স্পষ্ট ছিল এবং সামরিক শাসনের কবরসদৃশ নীরবতার মাঝেও তাঁর কথা এক অনির্বাণ আলোকবর্তিকা হয়ে ছিল। তাঁর কবিতা জীবনের এক উদযাপন এবং পরিবর্তনের এক স্বীকৃত আইন। তিনি ছিলেন এক অনন্য কুসংস্কারমুক্ত মানুষ। তিনি গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন গোঁড়ামি দিয়ে নয়, বরং সহনশীলতা দিয়ে।)

- গৌতম রায় বলেন :

  ফয়েজ আহমদ ফয়েজ এমন একজন কবি ছিলেন, যাকে কখনো দেশ বা ভাষা এমনকি সময়ের প্রেক্ষিতে আটকে রাখতে পারা যায় না। কাঁটাতারের বাঁধাকে ফয়েজ কোনদিনও তাঁর চিন্তা চেতনার পরিব্যাপ্তি ঘটার ক্ষেত্রে পাত্তাই দেননি। যেমন তিনি কখনো পরোয়া করেননি, নিজেকে আবদ্ধ দেখতে বা দেখাতে। আবদ্ধ মানসিকতা , তেমনটা কখনো ভাবতে পারতেন না ফয়েজ আহমদ ফয়েজ। তাঁর সৃষ্টির সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, কাল থেকে কালান্তরের পথে যাত্রা করে, সেই সৃষ্টিকে একটি কালোত্তীর্ণ মাত্রায় পৌঁছে দেওয়া। এই বিষয়টিকে মানুষের জীবনে যেভাবে তুলে ধরেছিলেন তিনি সেই জীবন সত্যের মশালটি. দেশকাল, সমাজ সবকিছুর বাধাকে অতিক্রম করে আজও মানবসভ্যতাকে আলো জোগাচ্ছে।[৭২]

- কৃষণ কান্ত (کرشن کانت) বলেন :

  نئی نسل فیض کے کلام کو سرمہ سمجھ کر آنکھوں سے لگاتی ہے۔ محنت و سرمایہ کی کش مکش کا شعور جوں جوں عوام میں پڑھتا جائے گا، آنے والی نسلیں اسے ایک اہم تاریخی اور فنی دستاویز کے طور پر حرز جاں بنائیں گی۔[৭৩]

  (নতুন প্রজন্ম ফয়েজের কথাকে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচনা করে। শ্রম ও পুঁজির সংগ্রামের বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ার সাথে সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও শৈল্পিক দলিল হিসেবে সমাদৃত করবে।)

- রজত সিং (Rajat Singh) বলেন :

  Faiz's poetry has long reflected a syncretic spirit, both across place and across time. It found a place among many local cultural traditions and also

beyond. He not only navigated the space between Hindu and Muslim, but was also deeply influenced by British poets like W.H. Auden.

Faiz to give us a man deeply conscious of the struggle against authority and also subjugated by it, between tradition and experiments, between the darkness of tyranny and the dawn of freedom.[৭৪]

(ফয়েজের কবিতা দীর্ঘদিন ধরে এক ধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ চেতনার প্রতিফলন বহন করে যা স্থান ও সময় উভয়ের সীমানা অতিক্রম করেছে। তাঁর কবিতা নানা স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে যেমন স্থান করে নিয়েছে, তেমনি সেই সীমানা ছাড়িয়েও প্রসারিত হয়েছে। তিনি কেবল হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যকার ব্যবধানকে অতিক্রম করেননি, বরং W. H. Auden-এর মতো ব্রিটিশ কবিদের দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

ফয়েজ আমাদের সামনে এমন এক মানুষের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন, যিনি একদিকে ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাপারে গভীরভাবে সচেতন, আবার অন্যদিকে সেই ক্ষমতার দ্বারাই কোনো না কোনোভাবে নিপীড়িত। তিনি অবস্থান করেন ঐতিহ্য ও নতুন পরীক্ষার মাঝখানে, স্বৈরাচারের অন্ধকার ও স্বাধীনতার প্রভাতের মধ্যবর্তী এক টানাপোড়েনের জগতে।)

- আমীর সোহাইল ওয়ানী (Amir Suhail Wani) বলেন :

Faiz was a literateur, political activist, pacifist, cultural theorist and much more. He is the tallest Urdu poet the subcontinent has seen after Iqbal, and a poet of international repute with few equals. His dedication to the cause of the oppressed and unmatched literary activism bring him close to his Parisian contemporary and existential writer Jaun Paul Sartre .[৭৫]

(ফয়েজ ছিলেন একজন সাহিত্যিক, রাজনৈতিক কর্মী, শান্তিবাদী, সাংস্কৃতিক তাত্ত্বিক এবং আরও অনেক কিছু। তিনি ইকবালের পর উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দু কবি এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এমন একজন কবি যার সমকক্ষ খুব কমই আছে। নিপীড়িতদের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং অতুলনীয় সাহিত্যিক সক্রিয়তা তাঁকে তাঁর প্যারিসীয় সমসাময়িক ও অস্তিত্ববাদী লেখক জ্যাঁ পল সাত্রের (যার সাথে ফয়েজের সাক্ষাৎ হয়েছিল রাশিয়ায়) কাছাকাছি নিয়ে আসে।)

- প্রফেসর সৈয়দ শফীক আহমদ আশরাফী (پروفیسر سید شفیق احمد اشرفی) বলেন :

اردو شاعری میں یوں تو بہت سے انقلابی شاعر ہوئے ہیں لیکن فیض ان میں اس لیے منفرد ہیں کہ ان کے یہاں انقلاب اور شعریت کا حسین و جمیل امتزاج نظر آتا ہے۔ وہ انقلاب کے لیے نعرہ نہیں لگاتے بلکہ ایک ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں جو انقلابی عمل کے لیے سازگار ہوتی ہے، یہ فضا ان کے انقلابی اور سیاسی شاعری کی جان ہے۔ فیض نے انقلاب کے نعرے کو نغمگی عطا کی ہے۔ اس طرح اردو کی انقلابی شاعری کو عظمت سے روشناس کرایا ہے۔ ان کے یہاں حسن و انقلاب کا ایسا حسین و جمیل امتزاج ملتا ہے کہ آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں۔[৭৬]

(উর্দু কবিতায় অনেক বিপ্লবী কবি এসেছেন, কিন্তু ফয়েজ তাঁদের মধ্যে অনন্য, কারণ এখানে বিপ্লব ও কবিতার এক সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর সংমিশ্রণ দেখা যায়। তিনি বিপ্লবের জন্য স্লোগান দেন না, বরং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য সহায়ক একটি আবহ তৈরি করেন; এই আবহই তাঁর বিপ্লবী ও রাজনৈতিক কবিতার প্রাণ। ফয়েজ বিপ্লবের স্লোগানকে সুর দিয়েছেন। এভাবে তিনি উর্দু বিপ্লবী কবিতাকে মহিমায় আলোকিত করেছেন। এখানে সৌন্দর্য ও বিপ্লবের এমন এক সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর সংমিশ্রণ দেখা যায় যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।)

তথ্যসূত্র :

১। ওয়াছী আহমদ সিন্দীলবী, *ইনকিলাবী শায়ের ফয়েজ আহমদ ফয়েজ*, নাছিম বুক ডিপো, লক্ষ্ণৌ, ১৯৭৭, পৃ. ৮-৯

২। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, জাফর আলম (অনুবাদ ও সম্পাদনা), ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, পৃ. ১২৬

৩। ড. নুসরাত চৌধুরী, *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ (রেওয়ায়াত আউর ইনফেরাদিয়্যাত)* সিমান্ত প্রকাশন, দিল্লী, ১৯৯৫, পৃ.-২০৭

৪। জাফর আলম (অনুবাদ ও সম্পাদনা), *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৯২

৫। উইকিপিডিয়া, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ দ্রষ্টব্য

৬। জাভেদ আখতার, *ফয়েজ বে হায়ছিয়্যাত নাক্কাদ, সঙ্গত (মাসিক পত্রিকা), কোয়েটা, মে*, ২০২১

৭। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *মাহ ওয়া সাল আশনায়ী*, দারুল ইশাআত-এ-তরক্কী, মস্কো, ১৯৭৯, পৃ.- ১১-১২

৮। মারগুব আলী (সম্পাদনায়), *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : আহওয়াল ওয়া আফকার*, তাখলিককার, দিল্লী, পৃ.-৫২২-৫২৩ , ডন (ইংরেজি পত্রিকা), করাচি, মার্চ, ২০০৩

৯। ড. তওসিফ আহমদ বাট, *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : আসরে জাদীদ কা মকবুল শায়ের*, উর্দু বিসার্চ জার্নাল, দিল্লী, অক্টোবর সংখ্যা, ২০২০

১০। ড. সৈয়দ শফীক আহমদ আশরাফী, *ফয়েজ : আফকার ওয়া ইকরার*, নুসরাত পাবলিশার, ১৯৯৩, পৃ.- ৫৮-৫৯

১১। *ফয়েজ : আফকার ওয়া ইকরার*, পৃ.- ৬২

১২।Kyle Haddad-Fonda, *Afro-Asian Writer's Conferences (1958-1979),* BlackPast.org, Washington, USA, August, 2017

১৩। সুম্বুল নিগার, *উর্দু শায়েরী কা তানকীদী মুতালেআ*, এডুকেশনাল বুক হাউস, আলীগড়, ১৯৯৫, পৃ.- ৯৫

১৪। ড. তওসিফ আহমদ বাট, *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : আসরে জাদীদ কা মকবুল শায়ের*, উর্দু বিসার্চ জার্নাল, দিল্লী, অক্টোবর সংখ্যা, ২০২০

১৫। আসমা ফারুকী (অনুবাদক), *ফয়েজ : হায়াত আউর তাখলীকাত*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭, পৃ.-২৫

১৬। উজিরে আগা, *নযম-এ-জাদীদ কী কারওয়াটি*, এডুকেশনাল বুক হাউস, আলীগড়, ২০০০, পৃ.- ৭০

১৭। *ফাসিলাত-ই-তা'লিম (২য় খন্ড, মসনবি, মরসিয়া আউর নযম)*, ড. মাসুদ হুসেনের মন্তব্য দ্রষ্টব্য, মাওলানা আযাদ ন্যাশনাল উর্দু ইউইনভার্সিটি, হায়দ্রাবাদ, ২০০৭. পৃ.- ৪৪৯

১৮। ড. তওসিফ আহমদ বাট, *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : আসরে জাদীদ কা মকবুল শায়ের*, উর্দু বিসার্চ জার্নাল, দিল্লী, অক্টোবর সংখ্যা, ২০২০

১৯। প্রাগুক্ত

২০। মির্জা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব, *দিওয়ান-এ-গালিব*, এডুকেশনাল বুক হাউস, আলীগড়, ১৯৯৫, পৃ.- ৪৫

২১। Amir Suhail Wani, *Remembering Faiz Ahmad Faiz and His poetry of Passion,* Janata Weekly, India, March, 2025.

২২। রণেশ দাশগুপ্ত, *ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা*, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, জুলাই, ১৯৬৯, পৃ.- ভূমিকা দ্রষ্টব্য

২৩। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *নকশ-এ-ফরিয়াদী*, উর্দু ঘর, দিল্লী, ১৯৪১, পৃ.- ভূমিকা দ্রষ্টব্য

২৪। *Remembering Faiz Ahmad Faiz and His poetry of Passion,* Janata Weekly, India, March, 2025

২৫। *নকশ-এ-ফরিয়াদী*, পৃ. ১৯

২৬। ড. আকীল আব্বাস জাফরী, *ফয়েজ কী কিতাব জিস সে উর্দু ম্যায় নয়ী রেওয়ায়াত কা আগায হুয়া*, ইন্ডিপেন্ডেন্ট উর্দু, ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০২২
২৭। আহমদ নাদীম কাসেমী, *দাস্ত-এ-সাবা*, আদব-এ-লতীফ (ফয়েজ নম্বর), লাহোর, পৃ.-৮১
২৮। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, দাস্ত-এ-সাবা, আযাদ কিতাব ঘর, দিল্লী, ১৯৫৩, পৃ.- ২৮
২৯। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *জিন্দান-নামা*, কবির বুক ডিপো, সন উল্লেখ নেই, দিল্লী, পৃ.- ৮, ১০
৩০। রণেশ দাশগুপ্ত, *ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা*, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, জুলাই, ১৯৬৯, পৃ.- ভূমিকা দ্রষ্টব্য
৩১। *ইনকিলাবী শায়ের ফয়েজ আহমদ ফয়েজ*, পৃ.- ৯০
৩২। *জিন্দান-নামা*, পৃ.- ১২০
৩৩। *ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা*, রণেশ দাশগুপ্ত, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, জুলাই, ১৯৬৯, পৃ.- ভূমিকা দ্রষ্টব্য
৩৪। *ইনকিলাবী শায়ের ফয়েজ আহমদ ফয়েজ*, পৃ.- ৯২
৩৫। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *দাস্ত-এ-তাহ-এ-সঙ্গ*, ইদারা-এ-ফুরুগ-এ-আদব, দিল্লী, সন উল্লেখ নেই, পৃ.- ৪০
৩৬। আশফাক হোসাইন, *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : শখসিয়্যাত আউর ফন*, একাডেমি আদাবিয়াত-এ-পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ২০০৬, পৃ.- ১৫৮
৩৭। *ইনকিলাবী শায়ের ফয়েজ আহমদ ফয়েজ*, পৃ.- ৯৪
৩৮। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *সার ওয়াদি-এ-সিনা*, কিতাবী দুনিয়া, লক্ষ্ণৌ, সন উল্লেখ নেই, পৃ.- ৯৩
৩৯। *ফয়েজ : আফকার ওয়া ইকরার*, পৃ.- ১৩৫
৪০। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *শাম-এ-শহরয়ারাঁ*, মাকতাবা-এ জামেয়া লিমিটেড, দিল্লী, ১৯৭৮, পৃ.- ৩৭
৪১। *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : শখসিয়্যাত আউর ফন*, পৃ.- ১৯৯
৪২। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *মেরে দিল মেরে মুসাফির*, শাহিন বুক সেন্টার, দিল্লী, ১৯৮২, পৃ.- ৯-১০
৪৩। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *নুসখাহা-এ-ওয়াফা*, এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউস, দিল্লী. ১৯৯২, পৃ.- ৬৯১
৪৪। *ইনকিলাবী শায়ের ফয়েজ আহমদ ফয়েজ*, পৃ.- ৯৮
৪৫। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *হরফ হরফ*, কিতাবকার পাবলিকেশন্স, রামপুর, ১৯৬৫, পৃ.- ৩২
৪৬। খালীক আনজুম, *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : তানকীদী জায়েযা*, আঞ্জমান-এ-তরক্কী উর্দু, দিল্লী, ১৯৮৫, পৃ.- ২৮৪
৪৭। আবদুল মান্নান,*ফয়েজ কী নছর (ফয়েজ শিনাছী*, মাগরিবী বাঙ্গাল উর্দু একাডেমি, কোলকাতা, ১৯৯০, পৃ.-২৭৪-২৭৫
৪৮। হাসিব আহমদ উছমানী, *ফয়েজ বেহায়ছিয়্যাত-এ- নছর নিগার (ফয়েজ শিনাছী)*, মাগরিবী বাঙ্গাল উর্দু একাডেমি, কোলকাতা, ১৯৯০, পৃ.-২৮৯-২৯০
৪৯। ড. ফারজানা আসলাম, ড. আবু বকর রিজভী (সম্পাদনায়), *মুআছের-এ-উর্দু আউর ফয়েজ আহমদ ফয়েজ*, এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউস, ২০১৪, পৃ.- ১৭৭
৫০। *ফয়েজ : হায়াত আউর তাখলীকাত*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭, পৃ.-১৬
৫১। প্রাগুক্ত
৫২। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *মীযান*, উর্দু একাডেমি সিন্দ, করাচি, ১৯৬০, পৃ.- ভূমিকা দ্রষ্টব্য
৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ.- ৩৭-৩৮
৫৪। *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : তানকীদী জায়েযা*, পৃ.- ২৮৪
৫৫। *মাতায়ে লওহে কলম*, মির্জা জাফরুল হাসান (সম্পাদনায়), মাকতাবা-এ-দানিয়াল, করাচি, ১৯৭৩, পৃ.- ২০-২১
৫৬। Fatima Shahzad, *Faiz in Cuba : a revolutionary poet's account and why it still matters,* Peoples Dispatch (an international media outlet), March , 2026.

৫৭। বেলাল আহমদ দার, *ফয়েজ কা নছরী আছলুব 'মাহ ওয়া সাল আশনায়ী' কে হাওয়ালে ছে*, উর্দু রিসার্চ জার্নাল, ২০১৬, পৃ.- ১১
৫৮। জাভেদ আখতার, *ফয়েজ বে হায়ছিয়্যাত নাক্কাদ*, সঙ্গত (মাসিক পত্রিকা), কোয়েটা, মে, ২০২১
৫৯। ড. আওরঙ্গজেব নিয়াজী, *পাকিস্তান ম্যায় উর্দু তানকীদ*, বেকান বকস, মুলতান, ২০১৫, পৃ.- ১০১
৬০। ড. শফিক আশরাফি, *ফয়েজ বেহায়ছিয়্যাত-এ-নাক্কাদ*, নুসরাত পাবলিশার্স, লক্ষ্ণৌ, ১৯৯৩, পৃ.- ৭
৬১। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *মীযান*, উর্দু একাডেমি সিন্দ, করাচি, ১৯৬০, পৃ.- ২৩১
৬২। প্রাগুক্ত, পৃ.- ২৫২
৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ.- ২৪৫-২৪৬
৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৬৯-১৭০
৬৫। ড. এরতেজা করিম, *ফয়েজ কা তানকীদী রোয়া-এ-মওজুআত*, রহমান পাবলিকেশন্স, এলাহাবাদ, ২০০৯, পৃ.- ১৩৬
৬৬। আবদুল মান্নান, *ফয়েজ কী নছর (ফয়েজ শিনাছী)*, মাগরিবী বাঙ্গাল উর্দু একাডেমি, কোলকাতা, ১৯৯০, পৃ.-২৮৬
৬৭। *মাতায়ে লওহে কলম*,মির্জা জাফরুল হাসান(সম্পাদনায়),মাকতাবা-এ-দানিয়াল,করাচি,১৯৭৩,পৃ.-কভার পেইজ দ্রষ্টব্য
৬৮। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *দামান-এ-ইউসুফ*, আঞ্জুমান-এ-তরক্কী উর্দু, দিল্লী, ১৯৮৯, পৃ.- ২৮
৬৯। *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : শখসিয়্যাত আউর ফন*, পৃ.- ২০৮
৭০। Gopi Chand Narang , *The tradition and Innovation in the Poetry of Faiz* , Indian Literature, Vol. 28, No. 2 (March-April, 1985), pp. 23-34
৭১। Nikola Benin, *Faiz Ahmad Faiz's poetry*, Research Gate, February, 2020.
৭২। গৌতম রায়, *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : কাল থেকে কালান্তরে অভিযাত্রা*, *inscript.me*(ডিজিটাল প্লাটফরম), ফেব্রুয়ারি, ২০২২
৭৩। ভূমিকা, কৃষণ কান্ত, *(ওয়ারাক ওয়ারাক, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ)*, আযাদ বুক ডিপো, অমৃতসর, ১৯৭৫, পৃ.-১২
৭৪। Rajat Singh, *Why We Need Revoltionary Poet Faiz Ahmed Faiz More than Ever, Literary Hub*, December, 2016
৭৫। *Remembering Faiz Ahmad Faiz and His Poetry of Passion, Janata Weekly*, Mumbai, March, 2025
৭৬। প্রফেসর সৈয়দ শফীক আহমদ আশরাফী, *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ কী ছিয়াছী শায়েরী*, উর্দু রিসার্চ জার্নাল,মার্চ, ২০১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ জন্মগ্রহণ করেন (খ্রি. ১৯১১) ইতিহাসের এমন এক ক্রান্তিলগ্নে যখন উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল পরিবর্তনশীল ও আন্দোলন মুখর। রাজনৈতিক সংকটের এহেন পরিস্থিতিতে গড়ে উঠেছিল ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জাতীয় মানস। এই পরিবেশই ছিল তাঁর চিন্তাধারা গঠনের মৌলিক ও প্রারম্ভিক পটভূমি। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর মানসিক অভিযাত্রা। মানুষ পারিপার্শ্বিকতার উর্ধ্বে নয় ; কম বেশি প্রত্যেকটি মানুষ আপন পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফয়েজ আহমদ ফয়েজের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন-
প্রথম ভাগ : ব্রিটিশ শাসন অর্থাৎ স্বাধীনতাপূর্ব সময়কাল ১৯০০-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত
দ্বিতীয় ভাগ : স্বাধীনতাউত্তর সময়কাল ১৯৪৭-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত
ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সমকালে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

ব্রিটিশ শাসনামলে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাবলি

ব্রিটিশ শাসনামলে অর্থাৎ ১৯০০-১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয়। সে সকল ঘটনাগুলো ধারাবাহিক বর্ণনার পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্ন তুলে ধরা হল :

ব্রিটিশ শাসন :

বাংলা তথা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে যোগদান করতে এসেছিল ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজসহ নানান ইউরোপিয় দেশের বণিকেরা। তারা স্থানীয় শাসক ও বণিকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। ইংরেজ বণিকেরা বাণিজ্যের পাশাপাশি স্থানীয়দের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বাংলার নবাবকে মসনদ থেকে উৎখাত করে। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা জড়িত হয় মূলত বাণিজ্যিক স্বার্থে। বাণিজ্য রূপান্তরিত হয় রাজনৈতিক আধিপত্যে। স্থাপিত হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র।

বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব অনস্বীকার্য। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গোড়াপত্তন হওয়া ব্রিটিশ শাসন কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনেনি, এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। এ শাসন ১৭৫৭ থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ একশত নব্বই বছর বহাল ছিল। অনেক আন্দোলন সংগ্রাম, সংস্কার ও রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, ইলা মিত্রের মতো বিপ্লবীরা যেমন রক্ত দিয়েছে তেমনি ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীর মতো অনেক নেতারও জন্ম দিয়েছে। সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে অনেক নতুন রীতি-নীতি, আইন ও পদ্ধতি।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) :

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জন্মের কিছুকাল পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ঘটনা হল বঙ্গভঙ্গ। ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এটি ১৯০৫ সালে সংঘটিত হয়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত ছিল বাংলা প্রদেশ বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। এটি ছিল ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তম প্রদেশ। ব্রিটিশ সরকার শাসনকাজে সুবিধার জন্য বাংলা প্রদেশকে বিভক্তিকরণের কথা চিন্তা করতে থাকে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন স্যার বাম্পফিল্ড ফুলার এবং স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে বড়লাট লর্ড কার্জন ও বাংলা বিভক্তিকরণের বিষয়ে আলোচনা করেন। অতপর ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হয়। ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত ১৯০৫ সালে এর বাস্তবায়ন হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদাহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ। এর রাজধানী হয় ঢাকা। অপরদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী করা হয় কোলকাতাকে।[১]

বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে মূল্যায়ণ করতে গিয়ে গোলাম মোস্তফা তাঁর *বঙ্গভঙ্গ ও তৎকাল* গ্রন্থে বলেন :

> ১৯০৫ সালে যে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়া বঙ্গদেশ ও উপমহাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছিল, এবং সেই প্রভাবের মেয়াদ ছিল দীর্ঘস্থায়ী। বঙ্গভঙ্গ এদেশে এক ব্যাপক ও প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করে। সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি- এক কথায় বঙ্গীয় জীবনের সব কিছুই এই রাজনৈতিক ঘটনায় আন্দোলিত হয়। সমাজ জীবনে দেখা দেয় অনেক নতুন নতুন প্রশ্ন; বঙ্গদেশের দুই প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক নতুন করে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। রাজনীতিতে স্বদেশী চেতনার বিকাশ ঘটে; এর ফলে শিক্ষা, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার, নারী-অধিকার- এই সব প্রশ্নের নানামুখি চিন্তায় তৎকালীন সমাজ ও জীবন চঞ্চল হয়ে ওঠে।[২]

বঙ্গদেশের জনগণের একাংশ বঙ্গভঙ্গকে একটি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন। প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তিকে তাঁরা ধুম্রজাল সৃষ্টির অপকৌশল বলে অভিহিত করেন। বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া আমরা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উক্তিতে প্রতিফলিত হতে দেখি। তিনি বলেন :

> We fell that we had been insulted, humiliated and tricked. We felt that the whole of our future was at stake and that it was a deliberate blow aimed at the growing solidarity and self consciousness of the Bengali speaking population Originally intended to meet administrative requirements, we fell that it had drawn to itself a political flavour and complexion and if allowed to be passed, it would be fatal to our political progress and to that close union between Hindus and Mohamedans upon which the prospects of Indian advancement so largely depended.[৩]

বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর পরই স্বদেশী আন্দোলন তীব্রতা লাভ করলেও ঐতিহাসিকগণ স্বদেশী চিন্তা-চেতনার উন্মেষ লক্ষ্য করেছেন ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই। ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে স্বদেশী চিন্তার সমসাময়িকতাও কেউ কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন। বঙ্গভঙ্গের সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পর্কে বিতর্ক সত্ত্বেও স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল এবং ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল-এতে কোন সন্দেহ নেই । এ দিকে ইঙ্গিত করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেন :

> Swadeshi during the days of its potency coloured the entire texture of our social and domestic life. Marriage presents that included foreign goods, the like of which could be manufactured at home, were returned. Preist would

often decline to officiate at ceremonies where foreign articles were offered as oblations to the gods.[৪]

বঙ্গভঙ্গের কারণ :

ব্রিটিশ সরকার প্রধানত প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গ করলেও এর পেছনে আরো অনেক কারণ ছিল। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল :

শাসনতান্ত্রিক কারণ :

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন অনুসারে সৃষ্ট বাংলা প্রদেশ ছিল ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এই বিশাল আয়তনের শাসনভার একজন গভর্ণরের উপর ন্যস্ত ছিল। ফলে শাসনতান্ত্রিক শৃংখলা রক্ষা ছিল দুরূহ ব্যাপার। তাই বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার জন্য ব্রিটিশরা চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। অবশেষে লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন।

রাজনৈতিক কারণ :

বিশ শতকের প্রারম্ভে ভারতীয় জনসাধারণের মাঝে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলা প্রদেশ ছিল অনেক অগ্রসর। এ কারণে ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে ভাগ করে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ভাগ করতে চেয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

সামাজিক কারণ :

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে নানাবিধ কারণে মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে থাকে। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা ভেবেছিল বাংলাকে ভাগ করলে তারা তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে।

অর্থনৈতিক কারণ :

বাংলা প্রদেশের রাজধানী কলকাতা হওয়ায় সকল ব্যবসা বাণিজ্য ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। তাছাড়া কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়। এই বাস্তবতা বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে উচ্চবর্গের অনেক মুসলমানকেও আকৃষ্ট করে।[৫]

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬) :

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের জন্ম উপমহাদেশের ইতিহাসের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। উনিশ শতকে স্যার সৈয়দ আহমদ খানসহ বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দের স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ফল হিসেবে একদিকে যেমন মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়, তেমনি কংগ্রেসের রাজনীতি হতে দূরে থেকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থেও এগিয়ে আসে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এ রূপ স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক ধারারই ফল।

মুসলমানদের চরম দুর্দিনে ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে সৈয়দ আহমদ খানের আবির্ভাব ঘটে। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলনের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করে এবং ইংরেজ বিদ্বেষ পোষণ করে এ সময় মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা এবং চাকুরি সহ সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ে ছিল। স্যার সৈয়দ মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদ ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুরে 'বিজ্ঞান সমিতি', ১৮৭৫ সলে আলীগড়ে 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল' এবং ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' প্রতিষ্ঠা করেন।[৬] আলীগড়ে স্যার

সৈয়দ আহমদ খান প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় তাঁর শিক্ষা আন্দোলন যা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানরা এখানে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলনের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর হাসান আলী চৌধুরী বলেন :

> রাজ্য হারিয়ে মুসলমানগণ যখন ইংরেজদের অত্যাচারের যাঁতাকলে সর্বত্র নিষ্পেষিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছিল, জাতির এহেন সংকটময় মুহূর্তে জাতির পরিত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি দিশেহারা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটান। প্রকৃতপক্ষে আলীগড় আন্দোলনই পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পথ রচনা করে।[৭]

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মৃত্যুর ফলে,মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃত্বের শূন্যতা দেখা দেয়। এর বেশ কয়েক বছর পর রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন কিছু ঘটনার সূত্রপাত হয় যা বিরাজমান সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধকে আরো বেশি শক্তিশালী উপাদানে পরিণত করে। লর্ড কার্জন কর্তৃক ১৯০৫ খ্রি. সম্পাদিত বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিরোধ জোরদার হয়। বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল কলিকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত হিন্দু পেশাজীবী শ্রেণী। নতুন সৃষ্ট প্রদেশ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বিধায় বঙ্গবিভাগের ফলে মুসলমানগণ লাভবান হবে এই ছিল সাধারণ ধারণা। ফলে অল্প সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান ব্যতীত বাংলার বেশির ভাগ মুসলমান বঙ্গ বিভাগের পক্ষে ছিল। বঙ্গবিভাগের পক্ষে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ। বঙ্গবিভাগ প্রসূত বিক্ষোভ, আন্দোলন, লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার সৃষ্টি হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। এ-ই ছিল মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট।[৮]

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ ও এর রদ আন্দোলন অন্যতম কারণ ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন শুরু হয়। বাংলায় বঙ্গভঙ্গের প্রধান সমর্থক ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ। এ সময় তিনি ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের ২০তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঢাকায় মিলিত হন। এর আগে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে নেতৃস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট প্রচারপত্র প্রেরণ করেন। ৩ দিনব্যাপী শিক্ষা সম্মেলন শেষে চতুর্থ দিনে অর্থাৎ ৩০ শে ডিসেম্বর মুসলিম নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক অধিবেশনে মিলিত হন। ভারতের বিভিন্ন অংশের মোট ৬৮জন প্রতিনিধি এ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ফলে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিম প্রতিনিধিগণ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামে মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। নবগঠিত দলের যুগ্ম-আহবায়ক নির্বাচিত হন নবাব মহসীন-উল-মুল্‌ক ও ভিকার-উল-মুল্‌ক।[৯] এভাবেই 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

প্রাথমিকভাবে মুসলিম লীগের উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

ক. ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতি সহযোগিতা ও আনুগত্যের মনোভাব বজায় রাখা। বাংলাদেশ

খ. মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সরকারের কাছে তুলে ধরা।

গ. উপরিউক্ত লক্ষ্যের কোনো ক্ষতি না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সদ্ভাব গড়ে তোলা।[১০]

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা নতুন দিগন্ত তৈরি করে। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী।

ফলাফল :

মুসলিম লীগের আবির্ভাব উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যতম ঘটনা। ১৯০৬ খ্রি. ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তার ফল। ভারতীয় কংগ্রেস মুসলিম সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়। প্রধানত মুসলিম স্বার্থরক্ষার নামে ভারতের নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন করেন। কংগ্রেসের মত মুসলিম লীগেরও প্রাথমিক পর্যায়ের নীতি ছিল বৃটিশ শাসনের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য প্রদর্শন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লীগ ও কংগ্রেস পারস্পরিক সৌহার্দ্যের নীতি অনুসরণ করে। ১৯১৬ খ্রি. স্বাক্ষরিত

লখনৌ চুক্তি এই নীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরবর্তী সময়ে জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে লীগ মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় মনোনিবেশ করে এবং মুসলমানদের একমাত্র প্রনিতিধিত্বকারী সংগঠনের মর্যাদা দাবি করে। এতে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯৪০-এর মার্চ মাসে লীগের 'লাহোর প্রস্তাব' তথা মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র বাসভূমির (Seperate states) দাবির ফলে এই সংঘাত চূড়ান্ত রূপ নেয়। এই স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান নামক পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে।[১১]

মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন (১৯০৯) :

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পূর্ববর্তী আইনসমূহ ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্রমাগত ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বিধানের দাবি উত্থাপন করতে থাকে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। অন্যদিকে, ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ও রাজনৈতিকভাবে নিজেদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। এমনই এক পটভূমিতে ব্রিটিশ সরকারের ভারত সচিব লর্ড মর্লি এবং ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর উদ্যোগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো আইন পাশ হয়।[১২]

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো আইন এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১. এ আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর নির্বাহী পরিষদের ৭ জন সদস্য ছাড়াও সর্বাধিক ৬০ জন অতিরিক্ত সদস্য এতে অন্তর্ভুক্ত হন।

২. প্রাদেশিক আইনসভাসমূহেরও সম্প্রসারণ করা হয়। বড় প্রদেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৫০ জন এবং ছোট প্রদেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ জন সদস্য থাকার বিধান করা হয়।

৩. এ আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। সদস্যরা বাজেট বা অর্থ বিল নিয়ে আলোচনা করার অধিকার লাভ করে।

৪. এ আইনে মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবী অনুযায়ী তাদের জন্য 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা' প্রবর্তন করা হয়।

৫. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতীয় বেসরকারি সদস্যগণ নির্বাচনের বিধান করা হয়। তবে অধিকাংশ সদস্যই নির্বাচিত হতেন পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে।
৬. এই প্রথমবার প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে সরকারি সদস্যদের স্থলে বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা হয়।
৭. এ আইনের মাধ্যমে প্রথমবারের মত গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নির্বাহী পরিষদে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করা হয়।[১৩]

মূল্যায়ন :

১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন পূর্ববর্তী সংস্কার আইনের তুলনায় অগ্রবর্তী পদক্ষেপ ছিল। যেমন- কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের সম্প্রসারণ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাদেশিক আইনসভার বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নির্বাহী পরিষদে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি। তবে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান স্বরাজ বা স্বশাসনের দাবি পূরণে তা ব্যর্থ হয়। এ আইনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতি যা ভারতীয় রাজনীতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে।

বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) :

বঙ্গভঙ্গকে হিন্দু সম্প্রদায়সহ মুসলমানদের একটি অংশ মাতৃভূমির অনুচ্ছেদ হিসেবে মনে করেছিলেন। উপরন্তু বঙ্গভঙ্গ কলকাতা ভিত্তিক হিন্দু জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর কায়েমীস্বার্থে কুঠারাঘাত হানে। ফলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অরবিন্দ ঘোষ, বিপীন চন্দ্র পাল প্রমুখের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে আন্দোলন সহিংস রূপ নেয়। এ সময় কংগ্রেস নেত...বর্গও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। যার ফলে আন্দোলন আরো তীব্র হয়। আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকার নত হতে বাধ্য হয়। অত:পর ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকে দিল্লির দরবারে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে। [১৪]
পূর্ববঙ্গের মুসলমান এলিট সম্প্রদায় এই ঘোষণাকে তাদের নিকট দেয়া ব্রিটিশ সরকারের অঙ্গিকারের বরখেলাপ বলে মনে করেন। তাদের মধ্যে ব্রিটিশদের প্রতি আস্থাহীনতা দেখা দেয়। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা পুনরায় একই প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিযুক্ত করে পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠন করা হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া :

বঙ্গ-ভঙ্গ সাধিত হবার পর ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত জোরেসোরে প্রচার করেন যে, "বঙ্গ-ভঙ্গ একটা অবধারিত ঘটনা এবং অবস্থাটাকে অপরিবর্তিত রাখা হবে।" মুসলমান সম্প্রদায় এ ধরনের প্রচারের উপর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং প্রগতিশীল ভবিষ্যৎ রচনায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ১৯১১ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ রদের ঘোষণায় মুসলমানদের উপর নেমে আসে এক বিষাদের ছায়া। মুসলমান সম্প্রদায় এ ঘোষণায় বিস্মিত হন। হতবাক হন রাজনীতির দাবাখেলা দেখে। তারা ইংরেজ সরকারকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করেন। কেননা ইংরেজ সরকারের মন্ত্রিগণ, রাজপ্রতিনিধিগণ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট বারবার ওয়াদা করেছেন এই বলে যে, "মুসলমানদিগকে আর কখনও কলকাতাস্থ বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীদের আধিপত্যাধীন করা হবে না।" কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সে ওয়াদা রক্ষা করতে পারেননি। বঙ্গ-ভঙ্গ রদের ঘোষণায় মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজ সরকারের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে তারা তাদের প্রগতির প্রতিবন্ধকরূপে চিহ্নিত করেন। স্যার সলিমুল্লাহ বঙ্গ-ভঙ্গ রদের ঘোষণাকে সামনে রেখে বলেন যে, "মুসলমানদের সাথে আলাপ-আলোচনা না করে বঙ্গ-

ভঙ্গ রদের ঘোষণায় মুসলমানগণ বিস্মিত হয়েছে এবং ব্রিটিশ সরকারের উপর মুসলমানদের আস্থা চিরতরে বিনষ্ট হয়েছে।"বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ সাংঘাতিকভাবে ক্ষুব্ধ হন। স্যার সলিমুল্লাহর অসন্তোষকে কেন্দ্র করে তাঁকে খুশী করার জন্য ইংরেজ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন।[১৫]

বঙ্গ-ভঙ্গ রদের ঘোষণা মুসলমান সম্প্রদায়কে নিরাশ করেছিল সত্য, কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় এর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন ভবিষ্যৎ পথ চলার অফুরন্ত আলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল ১৯১৪ সালে এবং এর পরিসমাপ্তি হয় ১৯১৮ সালে। ইউরোপের কয়েকটি ক্ষুদ্রও দুর্বল রাষ্ট্রব্যতীত প্রায় সকল রাষ্ট্রই এ যুদ্ধে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল। ইউরোপের বাইরেও এর বিস্তার ঘটেছিল। এই ব্যাপকতার জন্য এবং এই যুদ্ধের নাশকতার জন্য একে মহাযুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়। ১৯১৪ সালে বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভা শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ডের হত্যাকান্ডকে বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা আশু কারণ বলে মনে করা হয়। জার্মানি-ফ্রান্সের পারস্পরিক সন্দেহ ও ঈর্ষা, অস্ট্রিয়াা ও রাশিয়ার তীব্রসংঘর্ষ, বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধিতে অস্ট্রিয়ার ক্ষোভ, ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তিবর্গের দুটি বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাওয়া, ইঙ্গ-জার্মান নৌপ্রতিযোগিতার জন্য উত্তেজনা বৃদ্ধি, উগ্রজাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি বহু কারণের সম্মিলিত ফল হল বিশ্বযুদ্ধ।[১৬]

লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬) :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক ইংলণ্ডের বিপক্ষে যোগদান করে। ফলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের দুই প্রধান নেতা মোহম্মদ আলি ও শওকত আলি ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী দলের মুখপাত্র। সুতরাং যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার এই দুই নেতাকে অন্তরীণ রাখার ব্যবস্থা করে। মুসলিম লীগ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধনের জন্য এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে শুরু করে। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ শহরে একই সঙ্গে মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চার'শ মুসলিম প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন। এই অধিবেশনের সময়ও তরুণ মুসলিম নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তিই 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' নামে পরিচিত।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি অনুসারে আগামী দিনের সম্প্রসারিত প্রাদেশিক আইনসভার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে একটি সূত্র গৃহীত হয়। জাতীয় কংগ্রেস মুসলিমদের সংরক্ষিত আসন ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশ যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইন সভায় নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যরা যথাক্রমে ৩০, ২৫, ৫০ ও ১৫ শতাংশ অধিকার করার সুযোগ পাবে। মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের আইনসভায় তারা যথাক্রমে ৪০ ও ৫০ শতাংশ সদস্যপদ অধিকার করার সুযোগ পাবে।[১৭]

লক্ষ্ণৌ চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ :

নিম্নে লক্ষ্ণৌ চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল-

১. প্রাদেশিক আইন পরিষদ সমূহ সম্প্রসারণ করার সুপারিশ করা হয়। বৃহৎ প্রদেশের সদস্য সংখ্যা ১২৫ জন এবং ছোট প্রদেশের সদস্য সংখ্যা ৫০ থেকে ৭৫ এর মধ্যে নির্ধারণ করার দাবি করা হয়। এদের মধ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ মনোনীত সদস্য এবং বাকী পাঁচ ভাগের চার ভাগ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার দাবি করা হয়।

২. কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইন পরিষদে কোন সম্প্রদায়ের কোনো বিল পাশের ক্ষেত্রে আইনসভায় ঐ সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতির বিধান রাখা হয়।

৩. লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভোটারদের ভোট দিতে উৎসাহিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৪. এ চুক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এতে সংখ্যানুপাতে অধিক প্রতিনিধিত্বের সুপারিশ করা হয়। অর্থাৎ যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের আসন সংখ্যা লোকসংখ্যা থেকে বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর যেখানে সংখ্যাগুরু সেখানে জনসংখ্যার তুলনায় তারা কম আসন লাভ করবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় বাংলা প্রদেশের কথা। বাংলার মুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫২.৬ শতাংশ আর মুসলিম আসন বরাদ্দ করা হয় ৪০ শতাংশ। এভাবে বিহার ও উড়িষ্যাতে ২৫ শতাংশ, সেন্ট্রাল প্রদেশে ১৫ শতাংশ, মাদ্রাজে ১৫ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৫০ শতাংশ এবং যুক্ত প্রদেশে ৩০ শতাংশ আসন বরাদ্দের কথা বলা হয়।

৫. এ চুক্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতির পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন প্রদানে সম্মতি দেয়া হয়।

৬. ভারতের জন্য স্ব-শাসন কায়েমের লক্ষ্যে কংগ্রেসও মুসলিম লীগ একত্রে আন্দোলন করবে।

৭. প্রদেশসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে।

৮. গভর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদের অর্ধেক সদস্য ভারতীয় হবেন। তারা ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হবেন।[১৮]

লক্ষ্ণৌ চুক্তির গুরুত্ব :

মুসলিম লীগের তরুণ নেতা মোহম্মদ আলি জিন্নাহ, কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় যুক্তপ্রদেশের তরুণ মুসলিম নেতৃবর্গ এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে। এই চুক্তির ফলে সংখ্যাগুরু মুসলিম প্রদেশগুলোর স্বার্থে, সংখ্যালঘু মুসলিম প্রদেশগুলার স্বার্থের প্রতি, বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশের স্বার্থের প্রতি, যথেষ্ট অবিচার করা হয়। কিন্তু উত্তর প্রদেশের প্রবীণ ও সংরক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে মুসলিমদের মধ্যে যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্ট হয় সেই সুযোগেই তরুণ মুসলিম নেতাগণ এরূপ একটি চুক্তি সম্পাদন করার সুযোগ লাভ করেন। ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের মুসলিম লীগ দল মলি-মিন্টো সংস্কার অনুযায়ী প্রদত্ত প্রাদেশিক আইনসভার আসনসংখ্যা অপেক্ষা এই চুক্তি অনুসারে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে খুবই সন্তুষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে মলি-মিন্টো সংস্কারের ফলে মুসলিম সম্প্রদায় যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফলে তার পরিমাণ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাময়িকভাবে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এই চুক্তির এই একটিই মাত্র সুফল। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সহ-যোগিতার ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটি নতুন পথের সন্ধান পায়। কিন্তু এই চুক্তি স্থায়ী হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং সুযোগ-সুবিধা দান করে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবোধকে দূর করা সম্ভব ছিল না।[১৯]

ভারত শাসন আইন (১৯১৯) :

ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীদের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য এবং বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক চাহিদা পূরণ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের চাপে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক আইন প্রবর্তন করেছেন। রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে

সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক আইনগুলোরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ সরকার এদেশে দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য যে কয়টি আইন প্রবর্তন করেন, তারমধ্যে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অন্যতম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবাসীর সহযোগিতার পুরস্কারস্বরূপ এবং যুদ্ধ শেষে ভারতের জন্য নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার অবধারিত ছিল বিধায় ভারত সচিব মন্টেগু ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, ভারতীয়দের ভারত শাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ দিয়ে পর্যায়ক্রমে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা ব্রিটিশ সরকারের নীতি। এর ভিত্তিতে ভারত সচিব মন্টেগু এবং ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল চেমসফোর্ড এ দু'য়ের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন পাশ করা হয়। এই আইনকে এদেশের স্বাধীনতা আইনের মাইলফলকও বলা যেতে পারে। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম পদক্ষেপ ছিল প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। অথার্ৎ প্রাদেশিক সরকারের বিষয়গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করে শাসন করা। এ আইন ভারতীয়দের আশা আকাংখা পূরণে ব্যর্থ হয়। ভারতবর্ষের সকল রাজনৈতিক দলই একে অসম্পূর্ণ, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যকর বলে প্রত্যাখান করে।[২০]

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল :

১. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইনসভায় পরিবর্তন করা হয়। উচ্চকক্ষের নাম হয় রাজন্য সভা এবং নিম্নকক্ষের নাম হয় ব্যবস্থাপক সভা । উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ৬০ জন নির্ধারণ করা হয় এবং তন্মধ্যে ৩৪ জন নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট ২৬ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১৪৫ জন নির্ধারণ করা হয় তন্মধ্যে ১০৫ জন থাকবেন নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট ৪০ জন সরকার মনোনীত হন।

২. এ আইনের মাধ্যমে সকল প্রদেশের জন্য একটি করে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিধান করা হয়। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। তাছাড়া এ আইনে উল্লেখ করা হয় যে, প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ নির্বাচিত এবং বাকী সদস্যরা মনোনীত হবেন।

৩. প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের লক্ষ্যে এ আইনে সরকারের কার্যাবলিকে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা, ব্যাংক, বাণিজ্য, আয়কর, শুল্ক, ডাক, রেলওয়ে, তার, যোগাযোগ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হয়। অপরদিকে আইন শৃঙ্খলা, শিক্ষা, ভূমি, রাজস্ব, কৃষি, সেচ, পূর্ত, গণস্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

৪. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় প্রবর্তন। এ ব্যবস্থার প্রাদেশিক বিষয়সমূহকে 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি, রাজস্ব, সেচ। বিচার, জেল প্রভৃতি 'সংরক্ষিত' বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। অপরদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় সরকার, পূর্ত প্রভৃতি। হস্তান্তরিত বিষয় ছিল, গভর্ণর এবং তার নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ 'সংরক্ষিত' বিষয়ের দায়িত্বে ছিলেন। আর 'হস্তান্তরিত' বিষয়সমূহ গভর্ণর ও তাঁর মন্ত্রীদের দায়িত্বে ছিল। মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত হতেন।

৫. এ আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পাঞ্জাবের শিখ, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রিষ্টান এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

৬. নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রবর্তন এ আইনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ আইনের মাধ্যমে বেসরকারি সদস্যদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ভোটার হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে ছিল শিক্ষা, সম্পত্তির মালিকানা, পৌরকর প্রদান ইত্যাদি। স্বাভাবিক কারণে ভোটারের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত।
৭. এ আইনের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য হাইকমিশনারের একটি পদ সৃষ্টি করা হয়।[২১]

মূল্যায়ন :

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে দ্বৈতশাসনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এ ব্যবস্থার ফলে প্রদেশগুলোতে শাসনক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সংসদীয় পদ্ধতির দায়িত্বশীল ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আরো কিছু বিষয় যেমন- মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বশীলতা, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি আবশ্যক। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় এ আইনে ছিল অনুপস্থিত। তথাপি, ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর পদক্ষেপ।

খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯) :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক ব্রিটেনের বিপক্ষে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে ব্রিটেন জয়লাভ করে। এর ফলে তুর্কি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা হুমকির সম্মুখীন হয়। ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলমানদের খলিফা বা নেতা বলে মনে করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারতীয় মুসলমানরা একটি শর্তে ব্রিটিশদের যুদ্ধে সহায়তা করেছিল আর তা হল ব্রিটিশরা তুর্কি সাম্রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু জয়লাভের পর ব্রিটিশরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তুরস্ককে খণ্ড-বিখণ্ড করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায়, ভারতীয় মুসলমানরা তুর্কি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও তুর্কি সুলতানের মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যে আন্দোলন গড়ে তোলে, তাই ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত। এ প্রসংগে শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন :

> তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যোগ দিয়াছিল, তাই পরাজয়ের পর যে সন্ধি হয় তাহাতে তাহার রাজ্যসীমা ও শক্তি অনেক হ্রাস পাইল। যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য আশ্বাস দিয়াছিল যে, তুরস্কের কোন অনিষ্ট করা হইবে না। সুতরাং সেই আশ্বাস রক্ষা না করায় ভারতীয় মুসলমানগণ বিশেষভাবে ক্ষুদ্ধ হইল। ইংরেজের উপর চাপ দিয়ে যাতে তুরস্কের হৃত গৌরব, শক্তি ও সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনা যায় এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় মুসলমানরা একটি কমিটি গঠিত করে। তাহাদের এই আন্দোলন 'খিলাফৎ আন্দোলন' নামে পরিচিত। ইনলাম ধর্মের নেতা বা খলিফা তুরস্কের অধিপতির প্রতি ইংরেজ ও তাহার মিত্র শক্তির দূর্ব্যবহার এই আন্দোলনের কারণ।[২২]

খিলাফত আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানরা স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ভারতের বিভিন্নস্থানে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। কলকাতায় ১৯১৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি খিলাফতের সমর্থনে প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লিতে ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মোহম্মদ আলী, শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১) :

অসহযোগ আন্দোলনই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম সর্বভারতীয় মুক্তি আন্দোলন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ভারতের রাজনীতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। মন্ট-ফোর্ড সংস্কার ভারতীয়দের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে ভারতীয়দের অসন্তোষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তাছাড়া ১৯১৯

খ্রীস্টাব্দের ১০ই মার্চ রাউলাট আইনের ঘোষণা, ঐ বছরের ১৩ই এপ্রিলের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবে ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতি ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে আরও জটিল করে তোলে। অপরদিকে খিলাফতের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাবও ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ বিরোধী সক্রিয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য'তারাও প্রস্তুত হয়। এই সময় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করার জন্য ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এই অধিবেশনেই গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গান্ধীজীর এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রধানত: দুটি কারণে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমত:, খিলাফতের প্রশ্নে ভারতীয়দের পক্ষে নীরবতা অবলম্বন করা সম্ভব নয়। কারণ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাঁর অঙ্গীকার লঙ্ঘন করেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের সাম্রাজ্যের এক বিশ্বাট অঞ্চল অধিকার করে মুসলিম জগতের অধিকর্তা খলিফার পদ ও সম্মানের প্রতি বিন্দুমাত্র মর্যাদা প্রকাশ করেন নি। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, ইসলাম ধর্মের এই বিপদের সময় ভারতের প্রত্যেক অনুসলিম নাগরিকেরই কর্তব্য তাঁর মুসলিম ভ্রাতার সহিত সর্বান্ত:করণে সহযোগিতা করা।[২৩]

মোটকথা, ১৯১৯ সালে ব্রিটিশদের দমন ও পীড়নমূলক কার্যকলাপের প্রতিবাদে মহাত্মাগান্ধীর আহবানে সমগ্র ভারতব্যাপী যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা 'অসহযোগ আন্দোলন' নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল অহিংস। পরবর্তীতে এটি সহিংসতায় রূপ নিলে গান্ধী এ আন্দোলন স্থগিত করেন। এ আন্দোলন প্রথম দিকে সাফল্য অর্জন করলেও কোনরূপ স্থায়ী ফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়। তবে এই আন্দোলনের ফলেন ভারতীয়দের জাতীয় চেতনা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে গান্ধী তাঁর 'বয়কট কর্মসূচী' প্রস্তাব করেন। এ কর্মসূচি ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও খিলাফত কমিটির সম্মেলনে অনুমোদিত হয়। বয়কট কর্মসূচি একই বছরের নভেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত যৌথ সম্মেলনে গৃহীত হয়। এ কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়-

(ক) যে কোন অবৈতনিক (Honorary) পদ এবং স্থানীয় সরকারসমূহের (Local bodies) মনোনীত সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ।
(খ) কোন সরকারি দরবার, অনুষ্ঠান, চা-চক্র যা সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা বা তাদের সম্মানে অনুষ্ঠিত, সে সমস্ত অনুষ্ঠান বর্জন।
(গ) সন্তানগণকে সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করা এবং বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
(ঘ) উকিল এবং মক্কেলগণ কর্তৃক বৃটিশ আদালত বর্জন এবং বেসরকারি সালিসী আদালত স্থাপন।
(ঙ) সামরিক বাহিনীর ভারতীয় সদস্যগণ, কেরাণীগণ এবং শ্রমিকগণ কর্তৃক মেসোপটেমিয়ায় কাজ করতে অস্বীকার করা।
(চ) পরিষদের সদস্যপদ প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং কংগ্রেসের উপদেশ অগ্রাহ্য করে কেউ পদপ্রার্থী হলে ভোটদাতাগণ কর্তৃক ভোটদানে অস্বীকৃতি।
(ছ) বিদেশী পণ্য বর্জন। [২৪]

বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) :

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে ভারতীয় রাজনীতিবিদের ভেতর বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। আন্দোলন তুঙ্গে থাকা অবস্থায় তা বন্ধ ঘোষণা করার পর পক্ষে-বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত হতে থাকে। ১৯২৩ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনটি ছিল সে সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্মেলনে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে মতভেদ দেখা দেয়। গান্ধীর নেতৃত্বাধীন একটি অংশ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিপক্ষে ছিলেন, অপরদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (সি আর দাশ) এর নেতৃত্বাধীন আরেকটি অংশ নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন। সি আর দাশের প্রস্তাব কংগ্রেস সম্মেলনে গৃহীত হয়নি। এমতাবস্থায়, তিনি তাঁর সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেস থেকে বের হয়ে স্বরাজ পার্টি গঠন করেন।

সি.আর দাশ ছিলেন সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পক্ষের মানুষ। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তিনি ব্রিটিশদের সহযোগিতা করতে চাননি বরং নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্রিটিশদের বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজ প্রদেশ বাংলায় মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে ১৯২৩ সনে এক চুক্তি সাক্ষর করেন যা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত। এ চুক্তি বাংলার স্থানীয় সংস্থা, আইন সভা ও সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের আসন নির্দিষ্ট করে দেয়, যা সংশ্লিষ্ট দুই সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশের সমর্থন লাভ করে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ :

বেঙ্গল প্যাক্টের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. বঙ্গীয়-আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব পৃথক নির্বাচক মন্ডলীর মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

২. স্থানীয় পরিষদসমূহে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত হবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শতকরা ৬০ ভাগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শতকরা ৪০ ভাগ।

৩. সরকারি চাকরির শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ পদ পাবে মুসলমান সম্প্রদায় থেকে। যতদিন ঐ অনুপাতে না পৌঁছানো যায়, ততদিন মুসলমানরা পাবে শতকরা আশি ভাগ পদ এবং বাকি শতকরা কুড়ি ভাগ পাবে হিন্দুরা।

৪. কোন সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ৭৫ শতাংশের সম্মতি ব্যতিরেকে এমন কোন আইন বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা যাবে না, যা ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বার্থের পরিপন্থী।

৫. মসজিদের সামনে বাদ্যসহকারে শোভাযাত্রা করা যাবে না।

৬. আইন সভায় খাদ্যের প্রয়োজনে গো-জবাই সংক্রান্ত কোন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে না এবং আইন সভার বাইরে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা আনার প্রচেষ্টা চালানো অব্যাহত থাকবে। এমনভাবে গরু জবাই করতে হবে যেন তা হিন্দুদের দৃষ্টিতে পড়ে তা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করে। ধর্মীয় প্রয়োজনে গরু জবাইয়ের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না।[২৫]

সাইমন কমিশন (১৯২৭) :

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাংখা পূরণে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১০ বছর পর ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি বিধিবদ্ধ কমিশন গঠনের কথা ছিল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি

কমিশন গঠন করে। যা সাইমন কমিশন নামে পরিচিত। এ কমিশনে ভারতীয় কোন সদস্য অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ভারতবর্ষের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে।[২৬]

ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) :

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনটি ছিল একটি সুবৃহৎ দলিল। ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্তির সময়ও এ আইন কার্যকরী ছিল। স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের নিজস্ব সংবিধান তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এ আইন সংশোধিত আকারে বলবৎ থাকে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে গঠিত সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্ ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলো

একে প্রত্যাখ্যান করে। আপনারা পূর্ববর্তী পাঠে জেনেছেন বৃটিশ সরকার সংবিধান বিষয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মতামত জানার জন্য লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছিল। তিনটি গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনা করেও শাসনতান্ত্রিক সমস্যার কোনো সমাধান হয় নি। ইতোমধ্যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড আইন সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে স্বীয় সিদ্ধান্তে এক সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। কংগ্রেসসহ বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায় এর তীব নিন্দা জ্ঞাপন করে। তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা সম্বলিত একটি শ্বেতপত্র বৃটিশ সরকার প্রকাশ করে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট এবং উক্ত শ্বেতপত্রের আলোকে পরের বছর ভারতের জন্য একটা নতুন সংবিধানের খসড়া প্রকাশিত হয়। এ খসড়ার ভিত্তিতেই ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টের উভয় হাউসে ভারতের শাসনকার্যের জন্য একটা নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। এটাই ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের বিখ্যাত ভারত শাসন আইন।[২৭]

বৈশিষ্ট্য :

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারতের সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ নিয়ে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়।

২. এ আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট করা হয়। এর উচ্চকক্ষটি রাজ্যসভা (Council of state) ও নিম্নকক্ষটি ব্যবস্থাপক পরিষদ (House of Assembly) বলে অভিহিত হবে। উচ্চকক্ষের সর্বমোট প্রতিনিধি হবেন ২৬০ জন এবং নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা হবে ৩৭৫ জন।

৩. এ আইনের মাধ্যমে শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয় যথা: কেন্দ্রীয় বিষয়, প্রাদেশিক বিষয় ও যুগ্ম বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহ যথা: দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা, আয়কর, যোগাযোগ, তথ্যদপ্তর প্রভৃতি ন্যস্ত করা হয়। অপরদিকে, প্রাদেশিক সরকারের হাতে প্রাদেশিক বিষয়াবলী যথা– আইনশৃংখলা, পুলিশ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রভৃতি বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহ যথা– ফৌজদারি আইন, বিচার প্রণালী, উইল প্রভৃতি কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় সরকারের এখতিয়ারভূক্ত রাখা হয়।

৪. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করে। প্রাদেশিক বিষয়সমূহের উপর প্রদেশের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে আইনসভার নিকট জবাবদিহি করার বিধান করা হয়।

৫. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা চালু করে। গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর নির্বাহী পরিষদের নিকট প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ধর্মীয় বিষয়, উপজাতি প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অপরদিকে অন্যান্য বিষয়াবলী গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত করা হয়।

৬. এ আইনে ভারতবর্ষের জন্য একটি ফেডারেল কোর্ট বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিয়ে তা গঠিত হবে।

৭. এ আইন দ্বারা সিন্ধুও উড়িষ্যা নামে দুটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়।

৮. মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও সংখ্যা অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব অব্যাহত রাখা হয়।

৯. এই আইনে বার্মাকে (বর্তমান মায়ানমার) ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করা হয়।

১০. এ আইনের মাধ্যমে ভোটদানকে উৎসাহিত করা হয় এবং ভোটার হবার যোগ্যতা শিথিল করা হয়।

১১. এ আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ রাখা হয়।

১২. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যেকোন প্রকার সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জনের ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে রাখা হয়।[২৮]

ভারত শাসন আইনের প্রতিক্রিয়া :

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন দ্বারা সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা কার্যকর করা হয়নি। ভারতে কোন রাজনৈতিক দল এ আইনে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। কংগ্রেস এ আইনের তীব্র নিন্দা করে। জওহরলাল একে 'দাসত্বের এক নতুন অধ্যায়' বলে অভিহিত করেন। কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ অভিযোগ করেন যে, এ আইনে স্বায়ত্ত শাসনের স্বাভাবিক অগ্রগতির কোনো লক্ষণ নেই। হিন্দু মহাসভাও এ আইন সমর্থন করে নি। মুসলিম লীগ নেতা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এইচএসসি প্রোগ্রাম ইউনিট ১০ পৃষ্ঠা ১৭৬ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তবে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধানগুলো সমর্থন করেন। অবশ্য সে আইনে প্রাদেশিক গভর্নরকে এত ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল যে এর ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে প্রকৃত দায়িত্বশীল বলা যায় না।[২৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এ যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধ পৃথিবীর প্রায় সব বড় শক্তিকে দুইটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করেছিল। একদিকে ছিল অক্ষশক্তি, যার নেতৃত্বে ছিল জার্মানি, ইতালি ও জাপান অন্যদিকে ছিল মিত্রশক্তি, যেখানে প্রধান ভূমিকা পালন করে ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির উপর ভার্সাই চুক্তির কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়। এর ফলে জার্মানির অর্থনীতি ও জাতীয় মর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে এডলফ হিটলার ক্ষমতায় আসেন এবং জার্মানিকে সামরিকভাবে শক্তিশালী করতে শুরু করেন। তিনি সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণ করেন এবং ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে একের পর এক দেশ দখল করতে থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির অর্থনৈতিক দুরবস্থা, চরম জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব এবং স্বৈরশাসকদের উত্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করে।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে যুদ্ধের সূচনা ঘটে। এর প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর খুব দ্রুত জার্মানি ইউরোপের বহু অঞ্চল দখল করে নেয়। অন্যদিকে জাপান পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ১৯৪১ সালে জাপানের পার্ল হারবারে আক্রমণের পর যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দেয়, ফলে যুদ্ধ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। একই সময়ে জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলে পূর্ব ইউরোপেও ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

১৯৪৫ সালে জার্মানির পরাজয়ের মাধ্যমে ইউরোপে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। একই বছর জাপান আত্মসমর্পণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়।[৩০]এই যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রে বড় পরিবর্তন আসে। এই যুদ্ধে আধুনিক অস্ত্র, ট্যাংক, যুদ্ধবিমান ও নৌবাহিনীর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। যুদ্ধ চলাকালে অসংখ্য শহর ধ্বংস হয়ে যায় এবং কোটি কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। বিশেষভাবে নাৎসি জার্মানির ইহুদি নিধনযজ্ঞ বা হলোকাস্ট মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। হিটলারের নির্দেশে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়। এছাড়া যুদ্ধের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করলে ভয়াবহ ধ্বংস সাধিত হয় এবং অগণিত মানুষ নিহত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় গভীর প্রভাব ফেলে। ইউরোপের বহু দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং বিশ্ব নেতৃত্বের কেন্দ্র ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে চলে যায়। এর ফলে পরবর্তীকালে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হয়। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনিবেশবাদ দুর্বল হয়ে পড়ায় এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাই শুধু একটি সামরিক সংঘর্ষ ছিল না; এটি বিশ্ব ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তনকারী এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) :

ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ প্রস্তাব মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। বস্তুত: লাহোর প্রস্তাব ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মুসলিম লীগ পরিচালিত আন্দোলনের পরিণতিতে ভারতবর্ষ ভাগ হয়।

প্রেক্ষাপট :

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৩৭ সালে প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস জয়লাভ করে। এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও কংগ্রেস জয়লাভ করে। মুসলিম লীগের পরাজয় মুসলিম নেতৃবৃন্দকে শংকিত করে তোলে। এমন এক বাস্তবতাতে, ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশন আহবান করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজণিত বাস্তবতা, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ ছাড়াই ভারত সরকারের যুদ্ধে যোগদান এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতেও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ পর্যালোচনাই ছিল অধিবেশনের উদ্দেশ্য। এই অধিবেশনে মুসলিম লীগের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব সম্পন্ন মুসলিম নেতাদের তীব্র সমালোচনার কারণে তিনি ধর্মভিত্তিক জাতির ধারণাকে সামনে তুলে ধরে, হিন্দু-মুসলিমদের দুটি জাতি হিসাবে দাবী করেন। জিন্নাহর সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং মুসলিমদেও জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবী, এক পর্যায়ে লাহোরে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত অধিবেশনের মূল সুর হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক একটি প্রস্তাব পেশ করেন। জিন্নাহর সভাপতিত্বে প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত।[৩১]

বৈশিষ্ট্য :

লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ঠ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন বা সন্নিহিত স্থানসমূহকে পৃথক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করতে হবে।

২. ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।

৩. এসব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে প্রয়োজনবোধে ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর সীমানা পুন:নির্ধারণ করতে হবে।

৪. এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।

৫. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. পরবর্তীতে দেশের যেকোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।[৩২]

পাকিস্তান ও ভারতের অভ্যুদয় (১৯৪৭) :

ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে মহামান্য ব্রিটিশ সম্রাটের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে ভাইসরয় ১৩ আগস্ট করাচী পৌঁছেন। বিকেলের আনুষ্ঠানিক ভোজ সভায় জিন্নাহ্ দীর্ঘ ভাষণ পাঠ করেন। ভাইসরয়ও সেখানে তাঁর বক্তব্য দেন। ১৪ আগস্ট পাকিস্তান গণ পরিষদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ভাইসরয় পাকিস্তান সৃষ্টিকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন। এই দিন বিকেলেই দিল্লীতে ফিরে আসেন ভাইসরয়।

স্বাধীনতার আকাঙ্খায় ১৪ আগস্ট সন্ধ্যা থেকেই দিল্লীতে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। স্বাধীনতার উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসতে থাকে দিল্লীর দিকে। ১৫ আগস্ট নেহেরু ভারতীয় বিধান সভার উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এদিন স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে আনন্দে উদ্বেল হয়ে পড়ে, দিল্লী তথা ভারত। এভাবে উপমহাদেশের ইতিহাসে দু'শো বছরের ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে, জন্ম নেয় ভারত আর পাকিস্তান নামের দু'টো স্বাধীন রাষ্ট্র।[৩৩]

স্বাধীনতা উত্তর সময়কাল ১৯৪৭-১৯৮৫ সাল

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৪৮-১৯৬৫) :

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তারপর থেকে দুটি দেশের মধ্যে বিভিন্ন যুদ্ধ হয়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হওয়া যুদ্ধগুলোর মূল কারণ হলো জম্মু ও কাশ্মীরের মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক, সীমান্ত বিরোধ, এবং আন্ত:সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকেই ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ এবং ধর্মীয় ও আদর্শগত পার্থক্যের জেরে দেশ দুটির মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধগুলোর বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল :

কাশ্মীর যুদ্ধ :

১৯৪৭-৪৮ সালে প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একে কাশ্মীর যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। কারণ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ মূলত কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে হয়েছিল। তখন জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। সে সময়ে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত করে। ভারত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে, পাকিস্তান আজাদ কাশ্মীর ও গিলগিত-বালতিস্তান অঞ্চল দুটির ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

কচ্ছ যুদ্ধ :

১৯৫৬ সালে দ্বন্দ্বটির সূচনা হয়। পরে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানি সীমান্তরক্ষীরা ভারত নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে পাহারা দিতে শুরু করে। ১৯৬৫ সালের ৮ এপ্রিল উভয় দেশই 'কচ্ছ' অঞ্চলে একে অপরের সীমান্ত চৌকির ওপর আক্রমণ চালায়। প্রথমে শুধু উভয় দেশের সীমান্ত পুলিশরা এ সংঘর্ষে জড়িত হয়। পরে খুব দ্রুত উভয় দেশের সশস্ত্রবাহিনীও জড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালের জুনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন দেশ দু'টিকে সংঘর্ষ বন্ধ করতে রাজি করান। তিনি বিরোধটির নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। ১৯৬৮ সালে ট্রাইব্যুনালের রায়ে পাকিস্তান দাবিকৃত ৩,৫০০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে ৩৫০ বর্গ কিলোমিটার ভূমি লাভ করে।

কার্গিল যুদ্ধ :

১৯৯৯ সালের মে-জুলাই মাসে কাশ্মীরের কার্গিল জেলায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাকিস্তানি ফৌজ ও কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ডি ফ্যাক্টো সীমান্তরেখা হিসেবে পরিচিত নিয়ন্ত্রণ রেখা বা লাইন অব কন্ট্রোল পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়লে এ যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধের পরে পাকিস্তান এ যুদ্ধের দায় সম্পূর্ণ কাশ্মীরি স্বাধীনতাপন্থী জঙ্গিদের ওপর চাপিয়ে দেয়। তবে ফেলে যাওয়া তথ্য-প্রমাণ এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট জানা যায়, পাকিস্তানের আধাসামরিক বাহিনীও এ যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। শেষে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমর্থনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পাকিস্তানকে ফৌজ প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়।[৩৪]

ভাষা আন্দোলন (১৯৫২) :

বাঙ্গালির ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এক রক্তরঞ্জিত ইতিহাস। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালি জাতির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। দীর্ঘ দু'শত বছর শাসনের পর এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালে কেবলমাত্র ধর্মীয় চেতনাকে পুঁজি করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হয়। পাকিস্ড়ান সৃষ্টির পর থেকে পাঞ্জাব ভিত্তিক পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙ্গালি জাতিকে সুনজরে দেখে নি। বাঙ্গালি জাতির উপর আধিপত্য কায়েমের বিশেষ পাঁয়তারা চলছিল। তারা চেয়েছিল বাঙ্গালি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিতে। শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা বিমাতা সুলভ আচরণ করছিল। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে তৎকালীন "তমদ্দুন মজলিস" সুপরিকল্পিতভাবে সুসংগঠিত আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ১৭ দিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ১ সেপ্টেম্বর ৩ সদস্য বিশিষ্ট "তমদ্দুন মজলিস" গঠিত হয়। এ সংগঠনের অন্য নেতৃদ্বয় ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও শামসুল আলম। সূচনালগ্ন থেকেই এ সংগঠনটি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি উত্থাপন করেছিল। ১৯৪৮ সালে ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এ দাবি

প্রত্যাখ্যান করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এ সিদ্ধান্ত জোর করে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। অথচ উর্দু ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা ছিল সমগ্র পাকিস্তানে অনুর্ধ্ব শতকরা ৬.০০ ভাগ। পক্ষান্তরে, বাংলা ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৪.৬ জন। তৎকালীন পাকিস্তানী বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর পরিসংখ্যান ছিল নিম্নরূপ:-

ভাষা	শতকরা হার
বাংলা	৫৪.৬
উর্দু	৬.০
পাঞ্জাবী	৬.১
পশতু	২৭.১
সিন্ধি	৪.৮
ইংরেজি	১.৪

সূত্র: ১৯৫১ সালের আদমশুমারী

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ গঠিত পূর্ব বাংলা মুসলিম ছাত্রলীগ এর ইশতিহারে রাষ্ট্র ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানান হয়। এতে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা সফরে এসে ঢাকার রমনা রেসকোর্সের এক জনসভায় ঘোষণা করেন, "Urdu and Urdu alone shall be the state language of Pakistan" অর্থাৎ উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ ঘোষণার মাত্র তিন দিন পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায় এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ সমাবর্তন উৎসবে তিনি আবার ঐ ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। উপস্থিত ছাত্ররা খোলাখুলী ভাবে এ অগণতান্ত্রিক ও অন্যায় ঘোষণার প্রতিবাদ জানায়।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের দাবিতে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। পাকিস্তানী স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী পুলিশ বাহিনীকে ছাত্র-জনতার উপর লেলিয়ে দেয়। পুলিশ ছাত্র মিছিলের উপর লাঠি চার্জ করে। ধীরে ধীরে আন্দোলন পরিপক্বতার আকার ধারণ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" স্লোগানে ঢাকার রাজপথ মুখরিত হয়। শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর তাবেদার পুলিশ বাহিনী গুলি চালায়। ফলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বরকত, সালাম, জব্বার ও রফিক এবং নাম না জানা আরও অনেকে। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশে প্রচন্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। গণ-বিস্ফোরণের কাছে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী মাথা নত করতে বাধ্য হয়। তারা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে মেনে নিতে বাধ্য হন। অবশেষে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়া হয়।[৩৫]

প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৫৪) :

যুক্তফ্রন্ট গঠন :

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের শাসন-শোষণে জনমনে ব্যাপক অসন্তোষ জাগ্রত হয়। এমতাবস্থায় পাক সরকারের বোধদয় হয়। তারা বুঝতে পারে নির্বাচন দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পরিস্থিতির বাস্তবতায় ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবেলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠন করে। ইতিহাসে তা 'যুক্তফ্রন্ট' নামে পরিচিত। যুক্তফ্রন্ট ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের দালাল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের ঐক্যজোট।[৩৬]

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচী :

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন উপলক্ষ্যে যুক্তফ্রন্ট ২১টি দফা সম্বলিত একটি নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য বিরোধী দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ২১ দফার ভিত্তিতে জনগণের কাছে ভোট প্রার্থনা করে। বাংলার আপামর জনসাধারণ ও ভোটারগণ ২১ দফা দাবির পক্ষে তাদের মূল্যবান রায় দেন। নিম্নে উক্ত ২১ দফার বর্ণনা দেয়া হল :

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ করা এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ
৩. পাটের ব্যবসায় জাতীয়করণ করা
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
৫. পূর্ব পাকিস্তানে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা
৬. কারিগর মুহাজিরদের কাজের ব্যবস্থা করা
৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করা বাংলাদেশ
৮. শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা
৯. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা
১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা
১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা ও মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকার বেশি না করা
১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১৪. জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি বাতিল করা
১৫. বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণ করা
১৬. মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'কে বাংলা ভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা
১৭. বাংলা ভাষা করার দাবিতে নিহত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদ মিনার নির্মাণ করা
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান
২০. আইন পরিষদের মেয়াদ কোনোভাবেই বৃদ্ধি না করা
২১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন দিয়ে তা পূরণ করা।[৩৭]

নির্বাচনের ফলাফল :

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। যার মূলে ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি। এ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২৩৬টি আসন। মুসলিম লীগ পায় ৯টি, কংগ্রেস ২৪টি, তফসিলি ফেডারেশন ২৭টি, খেলাফত রব্বানী পার্টি ১টি, খ্রিস্টান ১টি, বৌদ্ধ ২টি, কমিউনিস্ট পার্টি ৪টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৫টি আসন দখল করে। মুসলিম লীগের নেতিবাচক রাজনীতি, বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক নীতির কারণে পূর্ব বাংলার মানুষ এ দলকে প্রত্যাখ্যান করে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনসহ সকল প্রাদেশিক মন্ত্রী এ নির্বাচনে পরাজিত হন। এ নির্বাচনে প্রমাণিত হয়, পূর্ব বাংলার মানুষ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ।[৩৮]

সামরিক শাসন (১৯৫৮) :

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের সহযোগিতায় সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে কার্যকর হওয়া সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ৮ অক্টোবর ১৯৫৬ সালে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেন। একই তারিখে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু উচ্চাবিলাসী আইয়ুব খান ২৭ অক্টোবর ২১ দিনের মাথায় ইস্কান্দার মীর্জাকে পদচ্যুত করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।[৩৯]

সামরিক স্বৈরাচারের অভ্যুদয়ের কারণ :

১৯৫৮ সালে বহুবিধ কারণে পাকিস্তানে সামরিক স্বৈরাচারের অভ্যুদয় ঘটে। সে কারণগুলো পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায় :

প্রথমত, পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচারের অভ্যুদয়ের প্রধান কারণ ছিল সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অভাব। কোনো দেশে তখনই সামরিক শাসনের অভ্যুদয় হয়, যখন সেখানে রাজনৈতিক দলগুলো ব্যর্থ হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর এখানে কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে নি। এছাড়া পাকিস্তানের দু'অঞ্চলে একসাথে নেতৃত্ব দেওয়ার মত কোনো রাজনৈতিক দলও পাকিস্তানে ছিল না। মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করলেও দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান মুসলিম লীগ হয়েছিল ক'জন কুচক্রী ও ষড়যন্ত্রকারী নেতার পকেট সংগঠন। এদিকে আওয়ামী লীগকে দমনপীড়নের মাধ্যমে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল না থাকায় পাকিস্তানে আমলা ও সেনাবাহিনী রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তাই দেখা যায়, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে সামরিক স্বৈরাচারের অভ্যুদয় ঘটলে সেনাবাহিনী দ্বারা রাজনীতির ওপর হস্তক্ষেপ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলো সাংগঠনিকভাবে কোনো প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি। কাজেই পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাশাসনের অভ্যুদয়ের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অভাব।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক দলগুলোতে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। দল বদলের নির্লজ্জ খেলা, উপদলীয় কোন্দল, পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ প্রভৃতি কারণে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। এ সুযোগ গ্রহণ করেন কৌশলী ও সুচতুর সেনানায়ক আইয়ুব খান।

তৃতীয়ত, পাকিস্তানে সামরিক স্বৈরাচারের অভ্যুদয়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ সময়মতো নির্বাচন না হওয়া। ১৯৪৯ সালের পর থেকে পাকিস্তানে কখনো যথাসময়ে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। এতে গণতান্ত্রিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে। নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার ভয়ে মুসলিম লীগ সরকার বিভিন্ন শূন্য আসনেও নির্বাচন দিতে ভয় পেয়েছে। এতে জনগণের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়। ফলে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও অগ্রগতি বিনষ্ট হয়। ফলে সামরিক শাসন জারি করা সুবিধাজনক হয়।

চতুর্থত, পাকিস্তানে সামরিক স্বৈরাচারের অভ্যুদয়ের পেছনে অন্যতম কারণ ছিল সকল ব্যাপারে গভর্নর জেনারেলের অযাচিত হস্তক্ষেপ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই গভর্নর জেনারেলগণ অন্যায়, অগণতান্ত্রিক ও অযাচিতভাবে মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করতেন। গোলাম মোহাম্মদ ও ইস্কান্দার ষড়যন্ত্রের কারণে পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্র ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। এতে দেখা যায়, সুকৌশলী ও ধূর্ত আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে প্রভাবিত করে পাকিস্তানে সামরিক শাসন কায়েম করেন।

পঞ্চমত, রাজনৈতিক নেতাদের সহনশীলতার অভাবও পাকিস্তানে সামরিক স্বৈরাচারের অভ্যুদয়ের অন্যতম কারণ। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনুদার মনোভাব বিশেষত তাদের সহনশীলতার অভাবের ফলে পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর মৃত্যুর বিষয়টি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অসহিষ্ণুতার চূড়ান্ত প্রকাশ যা সামরিক স্বৈরাচারের অভ্যুদয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

ষষ্ঠত, পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির অন্যতম কারণ হলো পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা। ধীরে ধীরে যখন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সংগঠিত হতে থাকে তখন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভীত হয়ে নির্বাচন দিতে টালবাহানা করে। ১৯৫৯ সালে যে নির্বাচনের কথা ছিল সে নির্বাচনকে প্রতিহত করে এদেশের মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করে রাখার জন্যই পাকিস্তানে সামরিক স্বৈরাচারের অভ্যুদয় ঘটে।

সপ্তমত, সেনাবাহিনীর উচ্চাভিলাষ তথা ক্ষমতা লাভের বাসনাও পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচারের অভ্যুদয়ের পথ সুগম করে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, বিশেষ করে সেনাপ্রধান আইয়ুব খান দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা দখল ও কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে আসছিলেন। ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান ছিল মূলত আইয়ুব খানের নেতৃত্বাধীন একশ্রেণির সেনা কর্মকর্তার উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত পরিণতি।[৪০]

সামরিক শাসনের প্রভাব বা ফলাফল :

১। একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা : সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখেন। তিনি এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা চালুকরেন যাতে করে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২। সামরিক আইন জারির ধারা সূচনা : ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির ফলে পাকিস্তানে সামরিক একনায়কতন্ত্র এবং সামরিক আইন জারির ধারা সূচিত হয়। যার ফলে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি অব্যাহত থাকে। তাছাড়া উপমহাদেশের রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়ে।

৩। সংবিধান বাতিল : ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন।

৪। সরকার বিরোধী আন্দোলন : সামরিক সরকার একটি বেসামরিক প্রক্রিয়ায় দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে। কিন্তু আইয়ুব সরকার বৈধতার সঙ্কট অতিক্রমে ব্যর্থ হয়। 'ছয় দফা' কে কেন্দ্র করে বাঙালিরা একত্রিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে 'আগরতলা মামলা' দায়ের করা হয়। এর প্রতিবাদে বিশাল এক গণঅভ্যুত্থান হয়।

৫। রাজনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনা : আইয়ুব সরকার মৌলিক গণতন্ত্র নামে গণতন্ত্র নস্যাৎকারী এক অভিনব রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেন। ১৯৬২ সালে তিনি রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার চালু করেন।

৬। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রুদ্ধ : ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত হানে। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আবর্তে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়।[৪১]

গণঅভ্যুত্থান (১৯৬৯) :

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে জেনারেল আইয়ুব খান এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার তৎকালীন আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং আরও ৩৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। নিপীড়নমূলক সামরিক শাসন, রাজনৈতিক নিপীড়ন, আগরতলা

ষড়যন্ত্র মামলা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাবদ্ধ করার প্রতিবাদে পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। আইয়ুব বিরোধী ছাত্র-আন্দোলন ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও তা ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে তুঙ্গে ওঠে এবং মধ্য-জানুয়ারিতে গণআন্দোলনের রূপ নেয়। আইয়ুব পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী দিয়ে ঐ আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আন্দোলন তো স্তব্ধ হয়ইনি, বরং শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণে তা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে আসাদ শহিদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ১৪৪ ধারা জারি করে কিংবা সান্ধ্য আইন জারি করে শত শত মানুষকে ধরপাকড় করেও আন্দোলনকে থামানো সম্ভব হয়নি। সকল গণতান্ত্রিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও মানুষ যার যার অবস্থান থেকে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত গণরোষ বিপ্লবী করে তোলে প্রতিবাদী মানুষকে। মানুষের মিছিলের জোয়ারে ঢাকার রাজপথ উত্তাল হয়ে উঠে। আন্দোলনে শরিক হয় সমগ্র পূর্বপাকিস্তান। পুলিশ আর সৈন্যরা গুলি চালিয়েও থামাতে পারে নি আন্দোলন। আন্দোলনের মুখে ভেঙ্গে পড়ে সরকারি প্রশাসন। গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের মুখে টিকতে না পেরে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন আইয়ুব খান। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন। তিনি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে দেশের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় হন।[৪২] আইয়ুব খানের বিদায়ের পর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং সকল আসামীদের খালাস দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি (১৯৭১) :

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহা ভাব প্রকাশ করে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান না করে টালবাহানা করতে থাকে। তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজে। এটি ছিল মূলত: শাসকচক্রের ক্ষমতা হস্তান্তর না করার একটি দূরভিসন্ধিমূলক পাঁয়তারা। পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা এটিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ফলে তারা এ ধরণের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক দূর্বার গণআন্দোলনে গড়ে তোলে। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধিকারের দাবি রূপান্তরিত হয় স্বাধীনতার দাবিতে। এ সময়ে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক হয়। বৈঠকে মুজিবর রহমান ৬ দফার প্রতি অনমনীয় মনোভাব পোষণ করলে আলাপ-আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শেষ পর্যন্ত তা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের মধ্যরাত্রে বাঙালী জাতির উপর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেয়া হয়। পাকিস্তান বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ফলে বাঙালীরা কিছুটা কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণার পর তারা দিশা খুঁজে পায়। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের শাসকচক্রের হাত থেকে স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনার জন্য এবং দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য ঝাপিয়ে পড়ে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।[৪৩]

পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সরকার (১৯৭৩) :

১৯৭৩ সালে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে। এই সরকারের অধীনেই ১৪ আগস্ট ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানের বর্তমান ও তৃতীয় সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির শাসনামল থেকে পরিবর্তন করে দেশটিতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি এ পদে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ও

রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে একই বছর জুলাই মাসে জেনারেল জিয়াউল হক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান এবং গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটে।

জেনারেল জিয়া-উল-হকের শাসনামল (১৯৭৭-১৯৮৮) :

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপিপি জয়লাভ করে। কিন্তু নয়-দলীয় জোট পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স তাঁর বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ আনে। ফলে পরিরিস্থিতি সহিংস হয়ে উঠে। এহেন অস্থিরতা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়া-উল হক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে স্বপ্ন বিলাসী করে তোলে। অবেশেষে ১৯৭৭ সালের ৫ জুলাই জেনারেল জিয়া পাকিস্তানের রাষ্ট্রভার গ্রহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর জেনারেল জিয়া সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেন এবং ১৯৭৩ সালের সংবিধান স্থগিত করেন। পাকিস্তানি রাষ্ট্র ও সমাজকে একটি ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজানোর দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন তিনি। ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে ভুট্টোকে হত্যার অভিযোগে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং পিপিপির অবশিষ্ট নেতৃত্বকে কারারুদ্ধ বা নির্বাসিত করা হয়। নির্দলীয় নির্বাচন আয়োজন এবং ধারাবাহিক ইসলামীকরণ নীতি গ্রহণের মাধ্যমে জিয়া পাকিস্তানি রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকাকে বৈধতা দেওয়ার আশায় একটি জনপ্রিয় জনসমর্থন ভিত্তি তৈরি করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের ফলে সোভিয়েত ভূখণ্ডের সীমান্তবর্তী একটি স্থিতিশীল সরকার হিসেবে জিয়ার সরকার আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ করে। ১৯৮৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর একটি বিতর্কিত "ইসলামিক" গণভোটে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করার পর, প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্দলীয় নির্বাচনের নতুন পর্ব সম্পন্ন করে এবং ১৯৭৩ সালের সংবিধানে একাধিক সংশোধনী আনার পর, জিয়া অবশেষে সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন এবং পাকিস্তানে এক নতুন গণতান্ত্রিক যুগের সূচনা ঘোষণা করেন।

এই নতুন গণতান্ত্রিক যুগ পাকিস্তানের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসের মতোই উত্তাল ছিল। দলনিরপেক্ষ কর্মসূচির কারণে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ১৯৮৫ সালের নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়েছিল। রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতিতে প্রার্থীরা স্থানীয় বিষয়গুলোর ওপর মনোযোগ দিয়েছিলেন, যা অধিকাংশ প্রার্থীর নির্দিষ্ট দলের প্রতি আনুগত্যকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানের জনগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সুস্পষ্টভাবে আগ্রহী ছিল এবং নির্বাচন বর্জনের আহ্বানকে উপেক্ষা করেছিল; জাতীয় পরিষদের জন্য ৫২.৯% এবং প্রাদেশিক নির্বাচনের জন্য ৫৬.৯% ভোট প্রদান করেছিল।

রাষ্ট্রপতি জিয়ার প্রথম উদ্যোগ ছিল ১৯৭৩ সালের সংবিধানে এমন সংশোধনী আনা, যা সংসদীয় ব্যবস্থার উপর তাঁর ক্ষমতাকে সুনিশ্চিত করবে। অষ্টম সংশোধনীটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এর ফলে রাষ্ট্রপতি জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মনে করা যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা লাভ করেন। পরবর্তী বারো বছর ধরে রাষ্ট্রপতিরা এই সংশোধনী ব্যবহার করে বেশ কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করেন, যার প্রধান কারণ ছিল হয় ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব অথবা ক্ষমতার পালাবদল নিয়ে নিরাপত্তাহীনতা।

১৯৮৮ সালের নির্বাচনের পর, মুহাম্মদ খান জুনেজো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হন, যিনি জাতীয় পরিষদের সর্বসম্মত আস্থা ভোট পেয়েছিলেন। জুনেজোকে পাকিস্তান সরকারের একটি সম্ভাবনাময় অংশ বলে মনে হচ্ছিল; তিনি সেনাবাহিনী থেকে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে একটি মসৃণ ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করেন, যা পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আশাবাদ তৈরি করেছিল। ক্ষমতায় থাকার প্রথম বছরগুলোতে, জুনেজো সংসদকে একটি গণতান্ত্রিক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার সমর্থন বজায় রাখার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা

করতে সক্ষম হন। তিনি পাঁচ-দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন, যার লক্ষ্য ছিল উন্নয়ন, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, দুর্নীতি নির্মূল এবং সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি। তিনি বিদেশে পররাষ্ট্রনীতিরও উন্নতি করছিলেন এবং সামরিক শাসনের বিপুল ব্যয়ের ফলে সৃষ্ট বড় বাজেট ঘাটতি মোকাবেলা করছিলেন। কিন্তু ১৯৮৮ সালের ২৯শে মে প্রেসিডেন্ট জিয়া সংবিধানের ৫৮-২-খ ধারা অনুযায়ী জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করেন। তিনি দাবি করেন যে, জুনেজো তার পদকে দুর্বল করার জন্য তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। তিনি জাতীয় পরিষদকে দুর্নীতি এবং ইসলামী জীবনধারা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেন।

বিরোধী দলগুলো জিয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল, কারণ এটি তাদের সুবিধার্থে আগাম নির্বাচনের সুযোগ করে দিয়েছিল। তারা সংবিধান অনুযায়ী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানায়। রাষ্ট্রপতি জিয়া সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটির ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। তিনি মনে করতেন, নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা তাঁর কর্তব্য, অথচ নির্বাচন পরেও অনুষ্ঠিত হতে পারত। একই সাথে তিনি ১৯৮৫ সালের মতো নির্দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে এটি সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থী। ইসলামের নামে রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য নির্বাচন স্থগিত করার জিয়ার প্রস্তাবের ফলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আশঙ্কা ছিল যে জিয়া সামরিক আইন জারি করতে পারেন এবং মুসলিম লীগ জিয়া ও জুনেজোর সমর্থকদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮৮ সালের ১৭ই আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় জিয়ার মৃত্যুর পর এই সবকিছু থমকে যায়।[৪৪]

সিনেটের চেয়ারম্যান হিসেবে গোলাম ইসহাক খান রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং নির্বাচন শুরু হয়। এতে বাইরের পর্যবেক্ষকরা অবাক হয়েছিলেন, কারণ তারা আশঙ্কা করেছিলেন যে সামরিক বাহিনী সহজেই ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। ১৯৮৮ সালের নভেম্বরের নির্বাচন পনেরো বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক দলের প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কোনো দলই জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, কিন্তু পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) এককভাবে সর্বাধিক আসন লাভ করে। পিপিপি ছোট দলগুলোর সাথে জোট গঠন করে কার্যকরী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পর, দলটির চেয়ারপার্সন বেনজির ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করা হয়।

তথ্যসূত্র :

১। *বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা*, ড. মুনতাসির মামুন (সম্পাদনায়), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আগষ্ট, ২০১৬, পৃ.- ১১৯

২। গোলাম মোস্তফা, *বঙ্গভঙ্গ ও তৎকাল, সন্দেশ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য।*)

৩। Surendranath Banerjea,*A Nation in Making* , Oxford University Press, Calcutta, 1925, P –187

৪। প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৮৪

৫। *পৌরনীতি ও সুশাসন (দ্বিতীয় পাঠ)*, ড. শান্তনু মজুমদার (সম্পাদনায়), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ.- ১৩-১৪

৬। *উপমহাদেশের ইতিহাস (১৫২৬-১৯৭১)*, প্রফেসর ড. আশফাক হোসেন (সম্পাদনায়), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯, পৃ.- ১৪৭

৭। প্রফেসর হাসান আলী চৌধুরী, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪৮২

৮। *উপমহাদেশ ও বাংলার ইতিহাস (১৫২৬-১৯৪৭)*, ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী (সম্পাদনায়), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ.- ২৫৫

৯। *উপমহাদেশের ইতিহাস (১৫২৬-১৯৭১)*, পৃ.- ১৪৮-১৪৯

১০। প্রাগুক্ত

১১। *উপমহাদেশ ও বাংলার ইতিহাস (১৫২৬-১৯৪৭)*, পৃ.- ২৫৮

১২। *পৌরনীতি ও সুশাসন (দ্বিতীয় পাঠ)*, পৃ.- ১৯

১৩। প্রাগুক্ত

১৪। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, ড. তারেক শামসুর রহমান (সম্পাদনা), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪, পৃ.- ৫

১৫। মো: ইনসান আলী গাজী, *পৌরবিজ্ঞানের আলো*, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৬১)

১৬। *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস (১৭৯৫-১৯৯১)*, ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী (সম্পাদনায়), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা. ২০০৫, পৃ.- ভূমিকা দ্রষ্টব্য

১৭। এস ঘোষ, *আধুনিক ভারতের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড*, ঊষা পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা, প্রকাশের সন উল্লেখ নেই, পৃ.- ৫৫

১৮। *পৌরনীতি ও সুশাসন (দ্বিতীয় পাঠ)*, পৃ.- ২১-২২

১৯। *আধুনিক ভারতের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭)*, পৃ.- ৫৬

২০। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, পৃ.- ১৪

২১। *পৌরনীতি ও সুশাসন (দ্বিতীয় পাঠ)*, পৃ.- ২৩-২৪

২২। শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড)*, দিব্য প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০২১, পৃ.- ১৭৯-১৮০

২৩। *আধুনিক ভারতের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড*, পৃ.- ৮৮-৮৯

২৪। *উপমহাদেশ ও বাংলার ইতিহাস (১৫২৬-১৯৪৭)*, পৃ.- ২৬২

২৫। বাংলাপিডিয়া, বেঙ্গল প্যাক্ট দ্রষ্টব্য

২৬। প্রফেসর হাসান আলী চৌধুরী, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪৮৯

২৭। *উপমহাদেশের ইতিহাস (১৫২৬-১৯৭১)*, পৃ.- ১৭৫
২৮। *পৌরনীতি ও সুশাসন (দ্বিতীয় পাঠ)*, পৃ.- ৩০-৩১
২৯। *উপমহাদেশের ইতিহাস (১৫২৬-১৯৭১)*, পৃ.- ১৭৬
৩০। *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস (১৭৯৫-১৯৯১)*, পৃ.- ২৭০-২৭৬
৩১। *পৌরনীতি ও সুশাসন (দ্বিতীয় পাঠ)*, পৃ.-৩৪
৩২। প্রাগুক্ত
৩৩। *উপমহাদেশের ইতিহাস (১৫২৬-১৯৭১)*, পৃ.-১৮৫
৩৪। *ভারত পাকিস্তানের যত যুদ্ধ*, জাগো নিউজ ২৪, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
৩৫। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, পৃ. ৪৮-৪৯
৩৬। *বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, মো: শাহজাহান মিয়া ও মো: দেলোয়ার হোসেন খান, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ২৪৫
৩৭। *বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা*, পৃ.-১৪৫-১৪৬
৩৮। *বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২৪৬-২৪৭
৩৯। *বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়*, ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন ও ড. শান্তনু মজুমদার (সম্পাদনায়), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই, ২০১৭, পৃ.- ১৭
৪০। মো: শাহজাহান মিয়া ও মো: দেলোয়ার হোসেন খান, *বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ২৪৬-২৪৭
৪১। *পৌরনীতি ও সুশাসন (দ্বিতীয় পাঠ)*, পৃ.- ৫৮
৪২। ড. মো: মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৯৪৭-১৯৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫, পৃ.- ২০৪-২০৭, *উপমহাদেশের ইতিহাস (১৫২৬-১৯৭১)*, পৃ.-২১১
৪৩। মো: ইনসান আলী গাজী, *পৌরবিজ্ঞানের আলো*, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৩২৬-৩২৭
৪৪। Shahid Javed Burki, *Pakistan under Zia (1977-1988),*Asian Survey, Vol. 28, N0. 10, October, 1988, P- 1082-1100, Imran Khan & Kaeim Haider Syed, *General Muhammad Zia Ul Haq and Non Party Politics in Pakistan - An Analysis,* Pakistan Social Science Review, Vol.-1,No.-1, June, 2017, P.- 174-185

তৃতীয় অধ্যায়

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চিত্র

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ উর্দু সাহিত্যের এক অনন্য কবি। তিনি একসাথে প্রেম ও বিপ্লবের কবি। তিনি প্রেম ও বিপ্লবকে একসূত্রে গেঁথে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর কবিতা শুধুই রোমান্টিক আবেগের প্রকাশ নয়; বরং তা রাজনৈতিক চেতনার দৃঢ় ঘোষণা। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক সচেতন কবি। তিনি কিভাবে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠেছেন তা তার কবিতায় দেদীপ্যমান। উর্দু সাহিত্যের অনেক কবি রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন কিন্তু ফয়েজের মতো কবিতায় স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি। ফয়েজের জনপ্রিয়তার একটি বড় কারণ, তাঁর রাজনৈতিক কবিতা। সাম্রাজ্যবাদ, পরাশক্তি, শাসন -শোষণ, দু:শাসন, যুদ্ধ, দাঙ্গা, সাম্প্রাদায়িকতা, উপনিবেশবাদ ইত্যাদির ইতিহাস গড়েছেন তিনি কবিতায়।

রণেশ দাশগুপ্ত ফয়েজের নির্বাচিত কয়েকটি কবিতার বাংলা অনুবাদ করেন। গ্রন্থের নাম দেন ' *ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা* '। এ গ্রন্থের ভূমিকা অংশে ফয়েজের রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে মূল্যায়ণ করতে গিয়ে তিনি বলেন :

> সাম্রাজাবাদী শৃঙ্খল ও শোষণের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও শান্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে জনগণ যে নতুন নতুন দিগন্তে উপনীত হয়ে চলেছে, সেই অদম্য অক্লান্ত অভিযাত্রাই ফয়েজ আহমদ ফয়েজের হাতে দিয়েছে প্রতীতির আলোকশিখা।
>
> ফয়েজ আহমদ ফয়েজ এই আলোক শিখাকে তুলে নিতে কোন প্রতিকুল অবস্থাতেই দ্বিধা করেননি। দু:শাসনের কারাগার তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। এদিক দিয়ে আমাদের দেশের কবিতাকে তিনি যুক্ত করে দিয়েছেন বর্তমান শতাব্দীর সেই সংগ্রামী কবিতার সঙ্গে, যাকে সমৃদ্ধ করেছেন মায়াকভস্কি,লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, কুয়ো মোজো, পাবলো নেরুদা, নাজিম হিকমত। এই ধারাকে অভিব্যক্ত করার ব্যাপারে তিনি তাঁর স্বরকে উদাত্ত করতে দ্বিধা করেননি। তাঁর বক্তব্যকে দ্ব্যর্থবোধক করে জটিলতার সৃষ্টি তিনি করেননি। তাঁর সর্বশেষ প্রতীকাশ্রিত কবিতাগুলিও তীরের মত আঘাত করেছে অত্যচারীর বক্ষে। মশালের মত পথ দেখিয়েছে এই কবিতা দুর্গম পথের যাত্রীকে। রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুদণ্ড কিংবা লাহোর কারাগারে হাসান নাসিরের রহস্যাবৃত মৃত্যুর উপর লেখা তাঁর কবিতা প্রতীকাশ্রিত হলেও অবলীলাক্রমে অতি সহজে স্বাধীনতা ও শান্তির লক্ষ্যের সংগ্রামী কিংবা শোষণহীন সমাজের সৃজন-প্রয়াসী সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।[১]

প্রফেসর সৈয়দ শফীক্ব আহমদ আশরাফী তাঁর '*افکار فیض*' গ্রন্থে বলেন :

> انہوں نے اپنے دور کی ہر سیاسی و عوامی کشمکش سے اثر لیا اور یہاں تک قومی آزادی اور پاکستان کے قیام کے بعد جو انتشار اور سیاسی ہیجان وقوع پذیر ہوتے رہے ان کا ادبی سفر ہر منزل پر ان مسائل کو اپنی تخلیقات کا جز بناتا رہا[২]

(তিনি তাঁর সময়ের প্রতিটি রাজনৈতিক ও জনতার সংগ্রাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এমনকি জাতির স্বাধীনতা ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে যে বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক উত্তেজনা ঘটেছিল, তঁর সাহিত্য যাত্রার প্রতিটি পর্যায়ে এই বিষয়গুলি তাঁর সৃষ্টির অংশ করে তুলেছিল।)

ড. মাহমুদুল হাসান রিজভী এ প্রসংগে যর্থাথই বলেছিলেন যে :

> یاسی اور عوامی زندگی میں کشمکش کی جتنی شدت ہوتی رہی فیض کی نظموں میں اتنی ہی زیادہ حرارت، جاذبیت اور تاثر کے سوتے پھوٹتے رہے۔[৩]
>
> (রাজনৈতিক ও জনজীবনে দ্বন্দ্ব যত তীব্র হবে, ফয়েজের কবিতায় তত বেশি উষ্ণতা, আকর্ষণ এবং প্রভাব ফুটতে থাকবে।)

আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গণবিরোধী গণতন্ত্রহীন, সামরিক-স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরূপতা ফয়েজের কবিতায় সাবলীলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক অবিচার বা অসাম্য এবং রাজনৈতিক অধিকার বা আন্দোলনের মতো উচ্চকিত মোটাদাগের বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করা খুব কঠিন, কিন্তু অনায়াসে তিনি সেই বাধা অতিক্রম করে উর্দু কবিতাতে নতুন নতুন শিল্পসুষমা যোগ করতে সক্ষম হয়েছেন।

রাজনৈতিক চিত্রের উৎস

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জ্বল। তিনি প্রেমকে রূপান্তরিত করেছেন সামাজিক চেতনায়, দেশপ্রেমকে পরিণত করেছেন সংগ্রামের মন্ত্রে, আর স্বাধীনতাকে করেছেন ন্যায়বিচারের প্রতীকে। তাঁর কবিতা মানুষের অন্তরকে নাড়া দেয়, সংগ্রামে উজ্জীবিত করে এবং ন্যায়বিচারের জন্য লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত করে। তাই তাঁর কবিতা কেবল সাহিত্য ইতিহাসেরই নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসেরও অমূল্য সম্পদ। ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চেতনার মূলে বেশ কিছু উৎস ছিল। সে উৎসগুলো তাকে একজন রাজনৈতিক সচেতন বিপ্লবী কবি হতে বাধ্য করেছিল। আমরা এক এক করে সে উৎসগুলো বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়াস চালাবো।

১. ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা :

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলন ফয়েজ আহমদ ফয়েজের মনে বিদ্রোহী চেতনা জাগ্রত করেছিল।

ফয়েজের সাহিত্যিক বিকাশ ও কাব্যচেতনা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তাঁর সমকালীন উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা দ্বারা। তিনি শুধু প্রেম ও সৌন্দয্যের কবি নন, বরং ঔপনিবেশিক শাসন, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। রালফ রাসেল (Ralph Russell) এ প্রসঙ্গে বলেন :

> Faiz's poetry is rooted in the historical experience of colonialism and resistance, yet it transcends its immediate political context to speak to universal human suffering and hope.[৪]
>
> (ফয়েজের কবিতা ঔপনিবেশিকতা ও প্রতিরোধের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে; তবে তা তার তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অতিক্রম করে সর্বজনীন মানবিক দুঃখ ও আশার ভাষা হয়ে ওঠে।)

আইযাজ আহমদ (Aijaz Ahmad) তাঁর এক নিবন্ধে লিখেন :

> Faiz Ahmed Faiz represents the finest synthesis of revolutionary politics and classical poetic form in Urdu literature produced under colonial modernity.[৫]
>
> (ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে রচিত উর্দু সাহিত্যে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ বিপ্লবী রাজনীতি এবং ধ্রুপদি কাব্যরীতির শ্রেষ্ঠ সমন্বয়কে প্রতিনিধিত্ব করেন।)

ফয়েজের জন্মের সময় ভারত উপমহাদেশ ছিল পুরোপুরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া এই শাসনব্যবস্থা বিশ শতকের প্রথমার্ধে এসে চরম রূপ ধারণ করে। একদিকে অর্থনৈতিক শোষণ, অন্যদিকে রাজনৈতিক দমননীতি উপমহাদেশের জনগণকে গভীর সংকটে নিক্ষেপ করে। কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, স্থানীয় শিল্প বিলুপ্ত হতে থাকে, এবং সাধারণ মানুষের জীবন দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ফয়েজের যৌবনকাল ছিল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়। ১৯২০-৪০-এর দশকে গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলন, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন, এবং বিপ্লবী চেতনার বিস্তার ঘটে। ব্রিটিশ সরকার এসব আন্দোলন দমনে কঠোর আইন প্রণয়ন করে, সংবাদপত্র ও সাহিত্যিক অভিব্যক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এই দমননীতি ফয়েজের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তিনি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন।

ব্রিটিশ শাসন কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করেনি, বরং সমাজে শ্রেণি বৈষম্যকে আরও তীব্র করেছে। এক ক্ষুদ্র অভিজাত শ্রেণি ব্রিটিশদের সহযোগিতায় সুবিধাভোগী হয়ে ওঠে, আর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শোষিত হয়। ফয়েজ এই শ্রেণি বিভাজনকে উপলব্ধি করেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁর কবিতায় নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠ, কারাগার, নির্বাসন ও নির্যাতনের চিত্র বারবার উঠে এসেছে।

ব্রিটিশ শাসনের সময় শিক্ষা ও প্রশাসনে ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য বাড়ে। এর ফলে একদিকে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি হলেও অন্যদিকে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সংকটের মুখে পড়ে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট এই দ্বন্দ্ব ফয়েজের ভিতর রাজনৈতিক চেতনাকে আরো বেশি বেগবান করে।

ঔপনিবেশিক নিপীড়ন, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সামাজিক বৈষম্য ফয়েজের কাব্যচেতনার ভিত্তি নির্মাণ করেছে। তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে শুধু একটি সময়ের ইতিহাসই তুলে ধরেননি, বরং নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানবিক প্রতিবাদের এক চিরন্তন ভাষা সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে এডওয়ার্ড সাঈদ (Edward Said) তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন :

> Resistance literature is not simply a reaction to imperialism; it is an effort to reclaim history, language, and human dignity.[৬]
>
> (প্রতিরোধমূলক সাহিত্য কেবল সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রতিক্রিয়া নয়; এটি ইতিহাস, ভাষা এবং মানবিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের একটি প্রচেষ্টা।)

ফয়েজ সরাসরি রাজনৈতিক স্লোগানধর্মী কবিতা লেখেননি। বরং প্রেম, বিরহ ও সৌন্দয্যের আড়ালে তিনি তুলে ধরেছেন বৃটিশ শাসনব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা ও মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। আলে আহমদ সুরুর বলেন :

> فیض نے سامراجی ظلم کے خلاف احتجاج کو نعرہ نہیں بنایا بلکہ اسے جمالیاتی تجربہ بنا دیا۔[৭]
>
> (ফয়েজ সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে স্লোগানে পরিণত করেননি; বরং তাকে নান্দনিক অভিজ্ঞতায় রূপ দিয়েছেন।)

ফিরাক গোরকপুরী এ প্রসঙ্গে বলেন :

> فیض کی شاعری میں حسن و عشق کے پردے میں ایک پورا عہد بولتا ہے، جو غلامی، جدوجہد اور انسان دوستی کا عہد ہے۔[৮]
>
> (ফয়েজের কবিতায় প্রেম ও সৌন্দর্যের আড়ালে একটি সম্পূর্ণ যুগ কথা বলে- যে যুগ দাসত্ব, সংগ্রাম ও মানবতাবাদের যুগ।)

কারাগার, শৃঙ্খল, রাত ও ভোরের প্রতীক ব্যবহার করে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের অন্ধকার এবং স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এই কারণে তাঁর কবিতা ব্রিটিশ শাসনের সময় যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল, তেমনি পরবর্তী সময়েও তা অর্থবহ হয়ে আছে। ভিক্টর কিয়েরনান (Victor Kiernan) বলেন :

> Faiz wrote not merely against a particular regime but against a system of oppression whose roots lay deep in imperial domination.[৯]
>
> (ফয়েজ কেবল কোনো নির্দিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধেই লেখেননি; তিনি এমন এক নিপীড়নব্যবস্থার বিরুদ্ধে লিখেছেন যার শিকড় গভীরভাবে সাম্রাজ্যবাদে প্রোথিত।)

মাজনু গোরকপুরী বলেন :

> فیض کی شاعری استعمار کے خلاف ایک خاموش مگر گہرا احتجاج ہے۔[১০]
>
> (ফয়েজের কবিতা উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এক নীরব কিন্তু গভীর প্রতিবাদ।)

২. পাকিস্তানের স্বাধীনতার স্বপ্ন :

পাকিস্তানের স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ ভারতে মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রাম। উপমহাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার প্রশ্ন থেকেই পাকিস্তান আন্দোলনের জন্ম। ব্রিটিশ শাসনের অবসান শেষে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে মুসলিমদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার খর্ব হওয়ার আশঙ্কা থেকে এ আন্দোলন শুরু হয়। কায়দে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে এবং অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এই আন্দোলনের প্রধান সংগঠক। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের মধ্যে ছিলেন শেরেবাংলা এ, কে ফজলুল হক, নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, ফাতেমা জিন্নাহ, স্যার সিকান্দার হায়াত খান, এবং খাজা নাজিমুদ্দিন। ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি উত্থাপন করা হয়, যা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত। অধিবেশনে এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গহীত হয়। এ প্রস্তাব পেশ করেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ, কে ফজলুল হক। মূল প্রস্তাবের ভাষা নিম্নরূপ :

> Resolved that it is the considered view of this Session of the All India Muslim League that no Constitutional Plan would be workable in this country or acceptable to the Musilms unless it is designed on the following basic principles, via that geographically contiguous units are demarcated into rerritorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North- western and Eastern zones of India should be grouped to constitute 'independent States' in which the Constiuent units shall be autonomous and sovereign. that adequate, effective and mandatory safeguards should be specially provided in the Constitution for minorities in these units and in the regions for

> minorities in these, cultural, economic, political, of their religious, cultural, economic, political, administrative and oher rights and interests in consultation with them, and in other parts of India where the Mussalmans are in a minority, adequate, effective and mandatory safeguards shall be specially provided in the constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.[১১]

অবশেষে অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম ও বহু প্রাণের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।

পাকিস্তান আন্দোলন ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে রাজনৈতিক সচেতন একজন বুদ্ধিজীবিতে পরিণত করে। তিনি সরাসরি রাজনীতিবিদ ছিলেন না, কিন্তু উপনিবেশবিরোধী চেতনা ও শোষণমুক্ত সমাজের আকাঙ্খা তাঁকে আন্দোলনের নৈতিক সমর্থকে পরিণত করেছিল। তাঁর কাছে পাকিস্তান ছিল উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রেণিশোষণ থেকে মুক্ত একটি ন্যায্য সমাজ গঠনের সম্ভাবনা। এই কারণেই তিনি আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন।

৩. সামরিক স্বৈরশাসন :

উর্দু আধুনিক কবিতার ইতিহাসে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ এক অনন্য উচ্চতা দখল করে আছেন। তিনি একদিকে রোমান্টিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করেছেন, অন্যদিকে রাজনীতি, ইতিহাস ও ক্ষমতার নির্মম বাস্তবতাকে কবিতার ভাষায় রূপ দিয়েছেন। পাকিস্তানে সামরিক স্বৈরশাসনের উত্থান বিশেষত আইয়ুব খান ও জিয়া-উল-হকের শাসনামল ফয়েজের কাব্যচেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত হয় পাকিস্তান। জন্মের পর থেকেই দেশটিতে শোষক ও শোষিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সেনাবাহিনী। দেশটির ইতিহাসে অধিকাংশ সময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্তারা।

পাকিস্তানে সামরিক শাসনের সূত্রপাত করেন দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা। তিনি ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন ঘোষণা করেন। তিনি ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করেন, এটিকে "অকার্যকর" এবং "বিপজ্জনক আপোষ" বলে বর্ণনা করেন। তিনি স্যার ফিরোজ খান নুন সরকারকে বরখাস্ত করেন, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক আইনসভা ভেঙে দেন। মির্জা সকল রাজনৈতিক দলকে অবৈধ ঘোষণা করেন। কিন্তু খুব বেশিদিন তিনি ক্ষমতার মসনদে থাকতে পারেননি। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে সরিয়ে দেশটির ক্ষমতা গ্রহণ করেন ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। এটিই ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সামরিক অভ্যুত্থান। এক দশকেরও বেশি সময় ক্ষমতায় ছিলেন আইয়ুব খান। এ সময় তিনি বেশ কিছু রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেন। উদ্যোগ নেন পাকিস্তানের শাসন কাঠামো এবং রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের।

আইয়ুব খানের প্রয়াস যে অভিনব ছিল সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন না কেউ। তিনি দেশটিতে নতুন ধরনের নির্বাচনী কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন, যার মূল ভিত্তি ছিল মৌলিক বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র। মৌলিক গণতন্ত্র হলো এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র যেখানে কিছু নির্দিষ্ট লোকের অধিকারে জাতীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের অধিকার ছিল। এ সময় পূর্ববঙ্গের মানুষ মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে উদ্ভুত দু:শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শুরু করে।

আন্দোলন এতটাই বিস্তার লাভ করে যে আইয়ুব খানের ক্ষমতার ভিত নড়ে যায় এবং ১৯৬৯ সালে তার পতন ঘটে।

এরপর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তারই উত্তরসূরি জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তিনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন পাশ কাটিয়ে সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতায় বসেন। সেই নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী ১৬০টি আসন জিতে নেয় পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে ৮১ আসন নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)। কিন্তু আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায় ইয়াহিয়া। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। সৃষ্টি হয় নতুন একটি রাষ্ট্র, যার নাম বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের কাছে পরাজয়ের ঘটনায় পিপিপি নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জুলফিকার আলি ভুট্টোর ক্ষমতাসীন পিপিপি ব্যাপক ব্যবধানে নিজেদের বিজয়ী দাবি করলেও ভোট কারচুপির অভিযোগ তোলে বিরোধী দলগুলো। এতে পাকিস্তান জুড়ে আবারও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এ সময় সুযোগ নেন ৮ বছর ধরে অপেক্ষায় থাকা জেনারেল মুহাম্মদ জিয়াউল হক। তৃতীয় সামরিক শাসক হিসেবে অবতীর্ণ হন তিনি। পাশাপাশি ১৯৭৩ সালের সংবিধানে পরিবর্তন এনে নিজে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৮ সালে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেন।[১২]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম মানুষের মধ্যে একটি ন্যায় ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন জাগিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার অল্প সময়ের মধ্যেই সামরিক হস্তক্ষেপ ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন সে স্বপ্নকে ভেঙে দেয়। দীর্ঘসময় ধরে চলা সামরিক শাসন ফয়েজ আহমদ ফয়েজের মনকে ভেঙ্গে দেয়। সকলের মতো তারও স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কেবল একজন কবি নন, বরং একজন সচেতন বুদ্ধিজীবী ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। রালফ রাসেলের (Ralph Russell) ভাষায় :

> Faiz Ahmed Faiz stands as the poetic conscience of Pakistan, giving voice to resistance during periods of military repression.[১৩]
> (ফয়েজ আহমদ ফয়েজ পাকিস্তানের কাব্যিক বিবেক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন, সামরিক নিপীড়নের সময় তিনি প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছেন।)

৪. গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম :

১৯৫৮ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন ছিল মূলত সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন, সংবিধান বাতিল করেন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেন। এর ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামরিক-আমলাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা পায়। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে তিনি সামরিক শাসন চালান। এ শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র মুক্ত করার লক্ষ্যে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সফলতা আসে। ১৯৬৯ সালে তার এই শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৯৭০ সালে জেনারেল ইয়াহইয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ নতুন করে সংকট সৃষ্টি করে। ১৯৭৭ সালে গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে জেনারেল জিয়া-উল-হক ক্ষমতা দখল করে পাকিস্তানে পুনরায় সামরিক শাসন ফিরিয়ে আনেন। ফলে আবার শুরু হয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন। গণতান্ত্রিক দল ও ছাত্র সমাজের দীর্ঘ লড়াইয়ের ফলে ১৯৮৮ সালে পাকিস্তানে পুনরায় গণতান্ত্রিক ধারা ফিরে আসে।

১৯৫৮ সাল থেকে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে চলমান বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ফয়েজ আহমদকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি এ সকল আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেন।

৫. মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র :

মার্কসবাদ (Marxism) হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক দর্শন ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। এটি ঐতিহাসিক উন্নয়নের উপর বৈপ-বিক উপাদানবাদী (dialectical materialist) ব্যাখ্যা প্রদান করে, যেখানে শ্রমিক শ্রেণির স্ব-মুক্তির সংগ্রামকে কেন্দ্র করে সমাজ পরিবর্তনের ধারণা রয়েছে। এর মূল ধারণাগুলো হলো :

ক. ইতিহাসের চালিকাশক্তি শ্রেণিসংগ্রাম
খ. সমাজের ভিত্তি অর্থনৈতিক কাঠামো
গ. পুঁজিবাদে শোষক (বুর্জোয়া) ও শোষিত (প্রলেতারিয়েত) শ্রেণির দ্বন্দ্ব
ঘ. ব্যক্তিমালিকানার বদলে উৎপাদন ব্যবস্থার সামষ্টিক মালিকানা
চ. শোষণমুক্ত, শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা

মার্কসবাদ মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমালোচনা করে এবং শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলে।

সমাজতন্ত্র (Socialism) হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপায় (ভূমি, শিল্প, সম্পদ) ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্র বা সমাজের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এর লক্ষ্য হলো :

ক. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা
খ. ন্যায়ভিত্তিক সম্পদ বণ্টন
গ. শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা
ঘ. শোষণমুক্ত সমাজ গঠন

মার্কসবাদ হলো সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি; আর সমাজতন্ত্র হলো সেই তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগের একটি রূপ।

৬. প্রগতিশীল লেখক সংঘ :

প্রগতিশীল লেখক সংঘ মূলত একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, বামপন্থী মতাদর্শভিত্তিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। ১৯৩৬ সালে ভারতের লক্ষ্ণৌতে এ আন্দোলনের সূচনা হয়। সে বছর ১০ই এপ্রিল জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন স্থলের পাশে সর্বভারতীয় এক সাহিত্যিক-সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ। এর মূল লক্ষ্য ছিল শোষিত মানুষের অধিকার, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শিল্প-সাহিত্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। এই সংঘ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের যে সূচনা হয়েছিল, তার প্রভাব ছিল পরাধীন দেশে এবং পরবর্তী সময়েও সেই প্রভাব বিভিন্ন পর্যায়ে অনুঘটকের ভূমিকায় দেদীপ্যমান হয়ে থাকে। বিখ্যাত ডন পত্রিকার মতে :

> Progressive Writers Movement in Urdu literature was the strongest movement after Sir Syed's education movement. the progressives contributed to Urdu literature some of the finest pieces of fiction and poetry. Undoubtedly, they were the trend-setters for the coming generation of writers.[১৪]

(স্যার সৈয়দের শিক্ষা আন্দোলনের পর উর্দু সাহিত্যে প্রগতিশীল লেখক আন্দোলন ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী আন্দোলন । প্রগতিশীলরা উর্দু সাহিত্যে কিছু সেরা কথাসাহিত্য এবং কবিতা রচনায় অবদান রেখেছিলেন। নিঃসন্দেহে, তারাই ছিলেন আগামী প্রজন্মের লেখকদের জন্য ট্রেন্ড-সেটার।)

প্রগতিশীল লেখক সংঘ সাহিত্যকে জীবনের বাস্তবতায়, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ব্যবহারের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে। ফয়েজ এই সংগঠনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন। এ সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে তিনি সাহিত্যকে সামাজিক ন্যায়বিচারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের কথা বলেছেন, শোষণমুক্তি, এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছেন।

৭. বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ :

ফয়েজ আহমদের জীবনকালে অর্থাৎ ১৯১১ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে বিশ্বরাজনীতি ছিল বেশ উত্তাল ও উত্তেজনায় ভরপুর। এ সময়ে বিশ্বে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার, দুটি বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪, ১৯৩৯), আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে শীতল যুদ্ধ, সমাজতন্ত্র-পুঁজিবাদ দ্বন্দ্ব, মধ্যপ্রাচ্য সংকট, প্রযুক্তিগত বিপ্লব, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন আন্দোলন প্রভৃতি। বিশ্বরাজনীতির এ সকল ঘটনাপ্রবাহ ফয়েজ আহমদকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর রাজনীতি সচেতনতার মূলে এ সকল ঘটনাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চিত্রের প্রকাশ

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ রাজনৈতিক সচেতন একজন কবি। তাঁর কবিতা শুধু প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুভূতিতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এতে যুগের সামাজিক বাস্তবতা, শোষণ-বঞ্চনা এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের গভীর প্রতিফলন দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার, সামরিক শাসন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ফয়েজের মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রেক্ষাপটে ফয়েজের কবিতায় রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

উপমহাদেশের ইতিহাসে পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন একটি যুগান্তকারী রাজনৈতিক ঘটনা। এই আন্দোলন শুধু একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়নি, বরং মুসলিম সমাজের আশা, স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ ভাবনার দিকনির্দেশও নির্ধারণ করেছিল। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধুমাত্র একজন কবিই নন, ছিলেন চিন্তাবিদ এবং প্রগতিশীল মানবতাবাদী, যিনি পাকিস্তান আন্দোলন ও তার পরবর্তী বাস্তবতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন।

ফয়েজ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, তবে তা ছিল শর্তসাপেক্ষ। তিনি এটিকে মুসলমানদের মুক্তির একটি ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবে দেখেছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপদ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তান ছিল এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে আশাবাদী করেছিল, আর স্বাধীন পাকিস্তানের বাস্তবতা তাঁকে সমালোচক করে তুলেছিল। তিনি রাষ্ট্রকে ভালোবাসতেন, কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর কাঠামোর অন্যায়কে মেনে নেননি। তাই ফয়েজকে পাকিস্তান আন্দোলনের কবি না বলে বলা যায় তিনি ছিলেন সেই স্বপ্নের কবি, যা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে বারবার আহত হয়েছে।

ফয়েজ পাকিস্তানকে কেবল ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখেননি। তাঁর কাছে পাকিস্তান ছিল উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রেণিশোষণ থেকে মুক্ত একটি ন্যায্য সমাজ গঠনের সম্ভাবনা। এই কারণেই তিনি আন্দোলনকে সমর্থন করলেও সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেছেন।

দেশভাগের পর তাঁর হতাশা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি দেখেন, যে স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, বাস্তবে তা পূরণ হয়নি। তাঁর কবিতায় এই বেদনা ও প্রশ্ন বারবার ফিরে আসে।

ফয়েজের কাছে স্বাধীনতা মানে কেবল বিদেশি শাসনের অবসান নয়, বরং শোষণমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি দ্রুতই হতাশ হন। রাষ্ট্র গঠিত হলেও শোষণ, শ্রেণিভেদ এবং স্বৈরতন্ত্র বহাল থাকে। এই হতাশা তাঁর কবিতায় গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়।

ফয়েজের কবিতায় পাকিস্তান আন্দোলনের সরাসরি স্লোগান নেই, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত চেতনা স্পষ্ট। স্বাধীনতার স্বপ্ন, ভাঙা প্রত্যাশা এবং শোষণের ধারাবাহিকতা তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয়। ‘ صبحِ آزادی’ কবিতায় তিনি নতুন রাষ্ট্রের জন্মকে উদযাপন করার পাশাপাশি তার অসম্পূর্ণতাকেও তুলে ধরেছেন।

ফয়েজের বিখ্যাত কবিতা ‘ صبحِ آزادی’ পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। দেশভাগের সময় ও তারপরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন মর্মান্তিক ঘটনাবলী তাকে ভীষণভাবে মর্মাহত করে। তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের আহাজারিই প্রকাশ পেয়েছে ‘ صبحِ آزادی’ কবিতায়। এখানে তিনি স্বাধীনতার আগমনকে স্বীকার করলেও তার অপূর্ণতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু তা এখনো পূর্ণ নয় -এই দ্বন্দ্বই তাঁর কাব্যভাষার মূল সুর। আলোচ্য কবিতায় কবি বলেন :

یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر
وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں
یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر
چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں
فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل
کہیں تو ہو گا شب سست موج کا ساحل
کہیں تو جا کے رکے گا سفینۂ غم دل
جواں لہو کی پر اسرار شاہراہوں سے[১৫]

(এই আলো দাগে ভরা, এই ভোর রাতের ক্ষতবাহী;
যে ভোরের জন্য অপেক্ষা ছিল, এ তো সে ভোর নয়।
এটা সেই ভোর নয় যার জন্য আমরা বেরিয়েছিলাম, আকাঙ্খা বহন করে

আমরা বেরিয়েছিলাম, আমার বন্ধু, কোথাও না কোথাও আমাদের দেখা হবে
আকাশের মরুভূমিতে তারার শেষ গন্তব্য
কোথাও, রাত হবে ধীর ঢেউয়ের তীরে
কোথাও, দু:খের জাহাজ থেমে যাবে
তরুণ রক্তের রহস্যময় রাজপথের মধ্য দিয়ে।)

প্রবন্ধকার আহসান উল হক ' Faiz Ahmad Faiz: A Study of Resistance, Protest and Voice for Society in his Poertry ' শীর্ষক নিবন্ধে বলেন :

> After independence the country get divided into two nations, voilence, corruption, communal riots continue to wreck both nations (India and Pakistan), attack on minorities, migration of millions of people and countless miseries, plunders, massacres, etc at growing scales. Faiz being an eye witness to all these increasing problems felt the anguish and pain of masses and was not ready to remain silent, was confined to seal his lips.[১৬]
> (স্বাধীনতার পর দেশটি দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায় ভারত ও পাকিস্তান। এই বিভাজনের পর দুই দেশেই সহিংসতা, দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অব্যাহতভাবে সমাজকে বিপর্যস্ত করতে থাকে। সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশান্তর, অসংখ্য দু:খ-কষ্ট, লুটপাট, গণহত্যা ইত্যাদি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফয়েজ এই সব ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। জনগণের এই দুর্দশা ও বেদনা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন এবং নীরব থাকার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; তাঁর কণ্ঠরোধ করা সম্ভব হয়নি।).

১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভাগের পর ফয়েজ লিখেছিলেন ' صبح آزادی ' কবিতাটি, যেখানে স্বাধীনতার আশার পরিবর্তে রক্তক্ষয়ী বিভাগের যন্ত্রণা ও নিরাশার চিত্র ফুটে উঠেছে । এই কবিতায় ফয়েজ প্রশ্ন তুলেছেন এই কি সেই স্বাধীনতা যা আমরা চেয়েছিলাম ? এই কবিতায় ফয়েজ দেখিয়েছেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি এখনো অর্জিত হয়নি। কবি বলেন :

ابھی چراغ سر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں
ابھی گرانیٔ شب میں کمی نہیں آئی
نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی
چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی[১৭]

(প্রদীপের খবর এখনও নেই
রাতের মাধ্যাকর্ষণ এখনও কমেনি
হৃদয় ও আত্মার মুক্তির সময় আসেনি
চল যাই, সেই গন্তব্য এখনও আসেনি।)

এই কবিতায় ফয়েজ দেখিয়েছেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি এখনো অর্জিত হয়নি। এ কবিতাটি মূল্যায়ণ করতে গিয়ে উইকিপিডিয়া'তে বলা হয়েছে :

> It centers partition of India after the British rule was ended in the Indian subcontinent, leading to rise different concerns and feelings associated with

multi-ethnic origin. the poem primarily revolves around the poet's sentiments and emotions about those people who migrated from one sovereign state to another, leaving their native places. Subh-e-Azadi was written as an expression of solidarity with the people who were living either in India or Pakistan before the region split into two independent nations.the poem illustrates split of Indian subcontinent in an imaginary style, covering aftermath and its related events as personally felt or realized by the poet. the poem also illustrates displeasure of the poet which he claimed or saw across India–Pakistan borders. Faiz expresses his emotional pain, sadness or distress about the cost paid for sovereignty and suggests a degree of resignation.[১৮]

(এটি ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ভারত ভাগকে কেন্দ্র করে তৈরি , যার ফলে বহু-জাতিগত উৎপত্তির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্বেগ এবং অনুভূতির জন্ম হয় । কবিতাটি মূলত কবির সেইসব মানুষের অনুভূতি এবং আবেগকে ঘিরে আবর্তিত হয় যারা এক সার্বভৌম রাষ্ট্র থেকে অন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রে চলে এসেছিল, তাদের জন্মস্থান ছেড়ে। 'সুবহ-এ-আজাদী' লেখা হয়েছিল ভারত বা পাকিস্তানে বসবাসকারী মানুষের সাথে সংহতির প্রকাশ হিসেবে যারা এই অঞ্চল দুটিতে স্বাধীন দেশে বিভক্ত হওয়ার আগে বসবাস করছিল। কবিতাটিতে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভক্তিকে কাল্পনিকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে , যা কবির ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করা বা উপলব্ধি করা পরবর্তী ঘটনাবলী এবং এর সাথে সম্পর্কিত ঘটনাগুলিকে তুলে ধরেছে। কবিতাটিতে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত জুড়ে কবির দাবি বা দেখা অসন্তুষ্টিও চিত্রিত হয়েছে । সার্বভৌমত্বের জন্য যে মূল্য দিতে হয়েছে সে সম্পর্কে ফয়েজ তাঁর মানসিক বেদনা , দু:খ বা যন্ত্রণা প্রকাশ করেছেন এবং কিছুটা আত্মত্যাগের ইঙ্গিত দিয়েছেন।)

ফয়েজ রূপকের আড়ালে রাজনৈতিক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত রূপকগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি যখন 'سحر' (ভোর) বা 'صبح' (সকাল) শব্দগুলো ব্যবহার করেন, তখন তা কেবল দিনের শুরু নয়, বরং স্বাধীনতার ইঙ্গিত দেয়। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর যখন পাকিস্তান ও ভারতের মানুষ কাঙ্খিত মুক্তি পায়নি, তখন তা বুঝাতে তিনি এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে আশাবাদী করেছিল, আর স্বাধীন পাকিস্তানের বাস্তবতা তাঁকে সমালোচক ও প্রতিবাদী করে তুলেছিল। তিনি সেই কবি, যিনি আন্দোলনের স্বপ্নকে ধারণ করেছিলেন এবং রাষ্ট্রের ব্যর্থতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই স্বপ্নের পক্ষেই কথা বলেছেন। ফয়েজ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছিলেন না; তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে পাকিস্তানের একজন বিবেকবান কবিতে পরিণত করেছে। তাঁর কবিতা তাই কেবল পাকিস্তান আন্দোলনের সাহিত্যিক দলিল নয়, বরং স্বাধীনতার অর্থ নিয়ে এক গভীর মানবিক প্রশ্নও।

ফয়েজ স্বাধীনতাকে শুধু রাষ্ট্রের ভৌগোলিক মুক্তি হিসেবে দেখেননি, তিনি দেখেছিলেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির স্বপ্ন হিসেবে। তাঁর বিখ্যাত কবিতা "نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن" এ দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের যে সুর ধ্বনিত হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের সংগ্রামকে রাজনৈতিক তাৎপর্য দিয়েছে। কবি বলেন :

نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں

چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے

جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے

نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے[১৯]

(নিসারের রাস্তায় হে স্বদেশ, যেখানে
চলে এই রীতি যে কেউ মাথা তুলে হাঁটবে না
যে কেউ তাওয়াফে যেতে চায়, সে যেন
নযর লুকিয়ে চলে, দেহ ও মন আত্মরক্ষা করে চলে।)

পাকিস্তানে সামরিক শাসন ফয়েজ আহমদের মনোজগতে গভীর রেখাপাত করে। তিনি এ শাসনব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি সামরিক শাসনের বিরোধীতা করেন এবং সামরিক শাসনের দ্বারা নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত মানুষের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে নিপীড়িত মানুষের নীরব প্রতিবাদ। তাঁর কবিতায় প্রেম, বিপ্লব ও মানবিক মর্যাদা একসঙ্গে মিলিত হয়ে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৯৫১ সালে ১৪ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়. যেটি "রাওয়ালপিন্ডি কন্সপিরেসি মামলা" নামে পরিচিতি পায়। এদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য ছিলেন, তারা হলেন- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর-জেনারেল আকবর খান, তার স্ত্রী বেগম নাসিম আকবর খান, ব্রিগেডিয়ার এম. এ লতিফ এবং বামপন্থী ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ' দি পাকিস্তান টাইমস'-এর সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ প্রমুখ। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান তাদেরকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। ফলে ১৯৫১ সালের ৯ মার্চ সকলের সাথে ফয়েজকেও গ্রেফতার করা হয়।

ফয়েজের পাশাপাশি পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সাজ্জাদ জহিরকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ফয়েজ এবং জহির উভয়ই কেবল বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবেই নয়, উর্দুতে তাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার জন্যও সুপরিচিত ছিলেন।

রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তারের পর ফয়েজ আহমেদ চার বছর (১৯৫১-১৯৫৫) কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন , অল্পের জন্য মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা পান। এই কারাবাসের সময়, তিনি তার দুটি সর্বাধিক প্রশংসিত কাব্যগ্রন্থ, "দাস্ত-এ সাবা" এবং "জিন্দান নামা" রচনা করেন , তাছাড়া তিনি তাঁর স্ত্রী অ্যালিসকে ১৪০টিরও বেশি চিঠি লিখেছিলেন, যা তার কারাগারের অভিজ্ঞতাকে গভীর সাহিত্যে রূপান্তরিত করে। এই সময়ে ফয়েজের কবিতায় রোমান্টিকতা এবং বিপ্লবী উৎসাহের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, যা তার কারাবাসকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীকে পরিণত করে।

১৯৫১ সালের রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা ফয়েজের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এই মামলায় গ্রেপ্তার ও কারাবাস তাঁকে সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রের সরাসরি মুখোমুখি দাঁড় করায়। কারাগারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতাকে আরও গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য প্রদান করে। কারাগারে রচিত কবিতাগুলোতে ব্যক্তিগত বেদনা সামষ্টিক যন্ত্রণায় রূপ নেয়।

ফয়েজের রাজনৈতিক সক্রিয়তার কারণে তাকে রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘকাল কারাবরণ করতে হয়। এই জেলজীবন তাঁর কবিতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। 'জিন্দান-নামা' এবং 'দস্ত-এ-সাবা' কাব্যগ্রন্থগুলোতে তার বন্দি জীবনের হাহাকার যেমন আছে, তেমনি আছে এক অপরাজেয় আশাবাদ। জেলের শিকলকে তিনি দেখেছেন

বিজয়ের অলঙ্কার হিসেবে। ফয়েজের জেল জীবন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে মুহাম্মদ ইসহাক (প্রাক্তন মেজর) তাঁর এক প্রবন্ধ'روداد قفس'-এ বলেন :

> فیض کی جیل کی شاعری میں وطن کی محبت کے چشمے ہر طرف پھوٹ رہے ہیں۔ وہ جابجا اپنے دیس اور اس کے باسیوں کی خستہ حالی قوم کی عزت وناموس کی ارزانی، لوگوں کی ناداری، جہالت، بھوک اور غم کو دیکھ دیکھ کر بے طرح تڑپ رہے ہیں۔[২০]

(ফয়েজের কারাগারের কবিতায় স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার ঝর্ণা সর্বত্র ফুটে উঠেছে। তিনি তার দেশ এবং এর বাসিন্দাদের খারাপ অবস্থা , জাতির সম্মান ও মর্যাদার ক্ষতি. দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ক্ষুধা এবং মানুষের দু:খ দেখে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন।)

ফয়েজ কারাগারের আলোকে তাঁর চোখ এবং হৃদয়ের আলো বলে মনে করেন। এই আলো তাকে দেশের সকাল ও সন্ধ্যা সম্পর্কে অবহিত করে। যখন সূর্য অস্ত যায় তখন তার কাছে মনে হয় স্বদেশের আকাশ সম্ভবত তারায় ভরা, আবার সূর্যের আলোয় যখন শিকল জ্বলে উঠে তখন মনে হয় স্বদেশের মুখে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। এই দৃশ্য তাঁর হৃদয়ে আশার আলো জাগিয়ে তোলে। বিষয়টি কবিতার ভাষায় ফয়েজ এভাবে তুলে ধরেন :

بجھا جو روزن زنداں تو دل یہ سمجھتا ہے
کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہو گی
چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے
کہ اب سحر ترے رخ پر بکھر گئی ہو گی
غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں
گرفت سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں[২১]

(বন্দীদের দিনগুলি নিভে যায়, তাই হৃদয় বুঝতে পেরেছে
যে তোমার অনুরোধ অবশ্যই তারায় ভরে গেছে
শিকল জ্বলে উঠেছে, তাই আমরা জেনেছি
যে এখন ভোর অবশ্যই তোমার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে
তাই আমরা সন্ধ্যা ও ভোরের কল্পনায় বাস করি, আমরা
দেয়াল এবং দরজার ছায়ায় আকঁড়ে থাকি।)

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ দেশপ্রেমিক কবি ছিলেন। তাঁর কবিতায় বিভিন্নভাবে স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। স্বদেশের প্রতি যখনই কোনো কালো ছায়া পড়েছে তখনই তিনি প্রতিবাদি হয়ে উঠেছেন। এজন্য তাকে বারবার কারাগারে যেতে হয়েছে, বিভিন্ন নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কারাগারের জীবন ফয়েজের অন্তরে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা স্বাভাবিকের চেয়ে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এ প্রসংগে মুহাম্মদ ইসহাক বলেন :

> وطن کی محبت اس طرح ان کے رگ وپے میں سرایت کر گئی ہے کہ اب اس کا دوسری محبتوں سے علیحدہ کر کے دیکھنا ناممکن ہو گیا ہے۔[২২]

(স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা তাঁর শিরায় এতটাই গেঁথে গিয়েছিল যে, এখন একে অন্য ভালোবাসা থেকে পৃথক করে দেখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।)

ফয়েজের দেশপ্রেমমূলক একটি কবিতার কয়েকটি চরণ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে। যে কবিতায় তিনি বলছেন এইভাবে :

چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو
تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں
ڈھونڈی ہے یونہی شوق نے آسائش منزل
رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں[২৩]

(এই রঙে স্বদেশের লায়লাকে কামনা করেছি
একইভাবে তার ভক্তিতে হৃদয় ব্যথিত
আমার হৃদয়ের আকাঙ্খা তার আরামদায়ক গন্তব্য খুঁজে পেয়েছে
কখনও আমার গালের ভাঁজে, কখনও আমার ঘাড়ের ভাঁজে।)

এই কবিতার ভেতরে ব্যক্তিগত প্রেম আর দেশপ্রেমকে একাকার করে দেখানোর প্রচেষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। ফয়েজের দৃষ্টিতে প্রেয়সী এবং স্বদেশ আলাদা সত্তা নয়; বরং ব্যক্তিগত প্রেম ধীরে ধীরে রূপ নেয় সামষ্টিক প্রেমে, অর্থাৎ স্বদেশপ্রেমে ।

এখানে "*لیلائے وطن* (লাইলায়ে ওয়াতন)" শব্দবন্ধটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। 'লাইলী' ঐতিহ্যগতভাবে প্রেয়সীর প্রতীক; কিন্তু কবি স্বদেশকে সেই লাইলীর রূপে কল্পনা করেছেন। ফয়েজের মতো করে বললে, এটি কেবল রোমান্টিক অনুভূতি নয়; এটি এক আদর্শের প্রতি গভীর আকর্ষণ। স্বদেশ এখানে সৌন্দর্যেরও প্রতীক, আবার বেদনারও প্রতীক। ভালোবাসা যেমন তীব্র, তেমনি তাতে রয়েছে সংগ্রামের আভাস। হৃদয়ের যন্ত্রণা কেবল ব্যক্তিগত বিরহের নয়; বরং একটি পরাধীন বা বিপর্যস্ত দেশের জন্য অস্থিরতা। ফয়েজের কাব্যে আমরা দেখি, দেশের দু:খ ব্যক্তিগত দু:খ হয়ে ওঠে। প্রেমিকের হৃদয়ের ব্যাকুলতা আসলে এক সচেতন নাগরিকের ব্যাকুলতা স্বাধীনতা, ন্যায় ও মানবমর্যাদার জন্য।

কবিতায় প্রেয়সীর রূপের খুঁটিনাটি যেমন গালের বাঁক, কেশের ভাঁজ - এর মধ্যে আশ্রয় খোঁজার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ফয়েজীয় দৃষ্টিতে এটি নিছক সৌন্দর্যবিলাস নয়। এই রূপকগুলো আসলে স্বদেশের স্বপ্নময় ভবিষ্যৎকে বোঝায়। প্রেমিক যেমন প্রেয়সীর মুখে শান্তি খোঁজে, তেমনি কবি জাতির মুক্তির মধ্যে ভবিষ্যতের শান্তি ও পরিপূর্ণতার সন্ধান করেন।

ফয়েজের ভাবনায় ব্যক্তিগত ইশ্‌ক ধীরে ধীরে সামাজিক দায়বদ্ধতায় রূপ নেয়। তাই এই শেরগুলিতে প্রেমের ভাষা ব্যবহার হলেও তা কেবল দুজন মানুষের সম্পর্কের কথা বলে না; বরং জাতির প্রতি গভীর অঙ্গীকার, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইঙ্গিত বহন করে।

ফয়েজের কবিতার সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ। তাঁর কবিতায় সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কেবল স্লোগান নয়; তা মানবিক আশা ও ঐক্যের ভাষা। তাঁর প্রতিবাদী ভাষা স্বৈরশাসককে ভীত করে তুলেছিল। তাই তারা তাঁর কণ্ঠকে, ভাষাকে রুদ্ধ করার বিভিন্ন প্রয়াস চালায়। কিন্তু ফয়েজ তাঁর লক্ষ্যে ছিলেন অবিচল ও দৃঢ়। এক কবিতায় তিনি বলেন :

متاعِ لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے

کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے
زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا رکھ دی ہے
ہر ایک حلقہء زنجیر میں زباں میں نے[২৪]

(কলম আর কাগজ কেড়ে নিলে কী দু:খ আছে,
আমি তো হৃদয়ের রক্তেই আমার আঙুল ডুবিয়ে রেখেছি।
যদি আমার জিহ্বায় সিলমোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাতেই বা কী?
আমি তো শৃঙ্খলের প্রতিটি কড়িতেই আমার ভাষা রেখে দিয়েছি।)

এই পংক্তিগুলোতে রাষ্ট্রীয় দমননীতি সত্ত্বেও সত্য উচ্চারণের অটল সংকল্প প্রকাশ পেয়েছে। এখানে "لوح و قلم" কেবল লেখার উপকরণ নয়; এটি বাকস্বাধীনতা ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতার প্রতীক। শাসকগোষ্ঠী যখন লেখকের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চায়, তখন ফয়েজ ঘোষণা করেন যে হৃদয়ের রক্ত দিয়েও তিনি লিখবেন। "زباں پہ مہر" সেন্সরশিপের ইঙ্গিত, আর "حلقہء زنجیر" কারাগারের শৃঙ্খল। কিন্তু কবি বলেন, প্রতিটি শৃঙ্খল-কড়িতেই তাঁর ভাষা স্থাপন করা আছে। অর্থাৎ, দমনযন্ত্র নিজেই তাঁর কাব্যের বাহক হয়ে দাঁড়ায়। শাসনের প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা নতুন উচ্চারণের জন্ম দেয়। এই চিত্রকল্প কেবল আবেগপ্রবণ নয়, বরং এক ধরনের নৈতিক প্রতিরোধ। তিনি বোঝাতে চান, কবিতা কোনো বিলাসিতা নয়; এটি সংগ্রামের ভাষা।

সাহিত্য সমালোচক ভিক্টর কিয়ার্নান (Victor Kiernan)

> Prison did not silence Faiz; rather, it sharpened his sense of history and universalized his protest against tyranny.[২৫]
> (কারাগার ফয়েজকে নীরব করেনি; বরং তা তাঁর ঐতিহাসিক বোধকে শাণিত করেছে এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদকে সার্বজনীন করে তুলেছে।)

সামরিক শাসনের সময়ে লেখা ফয়েজের আরেকটি বিখ্যাত কবিতা "ہم دیکھیں گے" । কবিতায় তিনি এক অবশ্যম্ভাবী ন্যায়ের দিনের কথা বলেন, যেখানে অত্যাচারীর পতন অনিবার্য। এই কবিতা পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের স্লোগানে পরিণত হয়েছিল। এ কবিতাটি সামরিক শাসনের সময় পাকিস্তানসহ উপমহাদেশে প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। কবিতার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :

ہم دیکھیں گے
لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے
وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے
جو لوح ازل میں لکھا ہے
جب ظلم و ستم کے کوہ گراں
روئی کی طرح اڑ جائیں گے
ہم محکوموں کے پاؤں تلے
جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی

اور اہل حکم کے سر اوپر
جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی
جب ارض خدا کے کعبے سے
سب بت اٹھوائے جائیں گے[২৬]
(আমরা দেখে নেবো।
আমরা অবশ্যই দেখে নেবো ।
যে দিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে,
যা চিরন্তন ফলকে লেখা আছে
যেদিন জুলুম-নির্যাতনের পাহাড় ভেঙে
তুলোর মতো উড়ে যাবে।
নির্যাতিতদের পায়ের তলায়।
যখন পৃথিবী কাঁপবে
এবং কর্তৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের মাথার উপরে
যখন বিদ্যুৎ চমকাবে
যখন কাবা থেকে ঈশ্বরের জমিন
সমস্ত মূর্তি তুলে নেওয়া হবে।)

ফয়েজের কবিতায় কারাগার শুধু একটি স্থান নয়, বরং একটি প্রতীক। "*زنداں کی ایک صبح* " কিংবা "*زنداں کی ایک شام*" প্রভৃতি কবিতাগুলোতে এ কথাই মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। সামরিক শাসনের অধীনে বন্দিত্ব কবির কাছে ব্যক্তিগত বেদনা নয়; তা সমষ্টিগত দু:খের রূপ ধারণ করে। এখানে কারাগার জনগণের নীরব বন্দিত্বের প্রতীক। এ প্রসংগে "*زنداں کی ایک شام*" কবিতার কয়েকটি চরণ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হলো :

شام کے پیچ و خم ستاروں سے
زینہ زینہ اُتر رہی ہے رات
یوں صبا پاس سے گزرتی ہے
جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات
صحنِ زنداں کے بے وطن اشجار
سرنگوں، محو ہیں بنانے میں
دامنِ آسماں پہ نقش و نگار[২৭]
(সন্ধ্যার জট পাকানো তারা থেকে,
রাত নেমে আসছে এক এক ধাপ করে,
যেন ভোরের আলো চলে যাচ্ছে,
যেন কেউ ভালোবাসার কথা বলেছে,
কারাগারের উঠোনের রাষ্ট্রহীন গাছপালা,
সুড়ঙ্গগুলি ম্লান হয়ে যাচ্ছে।
আকাশের খোদাই করা চিত্রগুলি ম্লান হয়ে যাচ্ছে।)

সামরিক স্বৈরশাসনের কঠোর সেন্সরশিপের কারণে ফয়েজ সরাসরি ভাষার পরিবর্তে রূপক ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতায় رات (রাত), اندھیرا (অন্ধকার), زنجیر (শিকল), دیوار (দেয়াল) প্রভৃতি শব্দ স্বৈরশাসনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ফয়েজের বিশেষত্ব হলো, তিনি সামরিক স্বৈরশাসনের কঠোর বাস্তবতাকেও প্রেম ও সৌন্দর্যের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। প্রিয়তমার চোখ, বসন্ত, ফুল কিংবা আলো সবকিছুই রাজনৈতিক অর্থ বহন করে। ফলে তাঁর কবিতা প্রচারধর্মী না হয়ে গভীর শিল্পমূল্য লাভ করেছে।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসনের ইতিহাসে শুধু একজন ভুক্তভোগী নন, বরং একজন নৈতিক সাক্ষী। তাঁর কবিতা প্রমাণ করে যে সামরিক শক্তি মানুষের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে পারে, কিন্তু চিন্তা ও কাব্যকে বন্দি করতে পারে না। প্রেম ও বিপ্লবের ভাষায় তিনি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তা আজও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক সাহিত্যচর্চায় গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক।
মুসা আল হাফিজ তাঁর এক নিবন্ধে ফয়েজের রাজনৈতিক কবিতা প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

> পাকিস্তানে তার কবিতা আক্রান্ত হয়েছিল পাকিস্তান বিরোধিতার অভিযোগে, ভারতে আক্রান্ত হচ্ছে ভারত বিরোধিতার অভিযোগে! কবিতা সীমানা পেরিয়েছে, পেরিয়েছে কাল। শাসকের চরিত্র থেকে গেছে একই জায়গায়। ফয়েজের প্রতীক ও রূপকগুলোকে তারা ভয় পায় নিজেদের মনের সঙ্কটে! এমনই হয়। রুশ কবি ওপিস মান্দেলস্টাম স্টালিনের আমলে একটি কবিতা লেখেন, যাতে প্রতীক ছিল এমন একজন,যার গোঁফ ছিল আরশোলার মতো। স্টালিনের মনে হলো, তার গোঁফ নিয়ে মশকারা করা হয়েছে। ১৯৩৩ সালে তিনি কবিকে রাষ্ট্রদ্রোহীর লকব দিয়ে জেলে ভরে দেন। পুড়িয়ে ফেলা হয় তার সব লেখা। তার স্ত্রী নাজেদজা ছিলেন নাইট শিফটের শ্রমিক। তিনি কাজ করতেন আর বিড় বিড় করে আওড়াতেন ওপিসের কবিতা, যেন তা হারিয়ে না যায়, আবার লেখা যায়। ওপিসের কবিতা হারিয়ে যায়নি, বরং সংগ্রামের নতুন শিখা জ্বালিয়েছে। ফয়েজের ব্যাপারটাও এমন। কবিতা স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের জন্য এভাবেই লড়ে যায়![২৮]

কবিতায় মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রতিফলন

মার্কসবাদ হচ্ছে একটি বিপ্লবী দর্শন। মার্কসবাদ হলো একটি অগ্রসর উদ্দেশ্যভিত্তিক মানবীয় জীবনদর্শন। এই উদ্দেশ্য শোষণমুক্ত মানব সমাজ। মার্কসবাদ ফয়েজকে প্রচন্ডভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে তাঁর কবিতায় মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রেম, রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রকাশ করেছেন। তবে মার্কসবাদী দর্শন তাকে আকৃষ্ট করলেও তিনি কখনো তাঁর কবিতাকে শুধু আদর্শগত প্রচারণায় পরিণত করেননি। তিনি মার্কসবাদের মানবতাবাদী দিকটিকে গ্রহণ করেছিলেন যেখানে শ্রমিক, কৃষক ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির বিষয় আছে। তাঁর কবিতায় শ্রেণী সংগ্রাম, শোষণ ও অসাম্যের বিষয়গুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাব্যিক ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

মার্কসবাদী ফয়েজ শ্রেণীবৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলেন। তাঁর কবিতায় শ্রমিক, মজদুর, বন্দি ও নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছে। কবিতায় তিনি মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার আহ্বান জানিয়েছেন। এটি কেবল ব্যক্তি স্বাধীনতার আহ্বান নয়, বরং শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক। মার্কসবাদী চেতনার মূল ভিত্তি শ্রেণিসংগ্রাম এখানে প্রতিফলিত।

"بول" ফয়েজের এক অনন্য কবিতা। এই কবিতাটি শুধু একটি সাহিত্যিক সৃষ্টি নয়; এটি প্রতিবাদের ভাষা, নৈতিক সাহসের আহ্বান এবং নিপীড়িত মানুষের পক্ষে উচ্চারিত এক স্পষ্ট ঘোষণা।

"بول" রচিত হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়ে, যখন উপমহাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, শ্রমিক আন্দোলন, মতপ্রকাশের সীমাবদ্ধতা এবং রাষ্ট্রীয় দমননীতি প্রবল ছিল। ফয়েজ তখন প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সাহিত্য কেবল ব্যক্তিগত প্রেম বা বিমূর্ত সৌন্দর্যের চর্চা নয়; এটি সামাজিক ন্যায় ও মানবমুক্তির হাতিয়ার। এই কবিতায় তিনি সরাসরি কোনো শাসকের নাম নেননি, কিন্তু পুরো কবিতাটি একটি দমন ও নিপীড়নমূলক কাঠামোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে।

"بول" কবিতায় ফয়েজ সরাসরি কোন স্লোগান দেননি। তিনি পুনরুক্তি (repetition) ব্যবহার করেছেন। কবিতায় "বোল" শব্দের বারংবার পুনরাবৃত্তি ছন্দ ও আবেগ সৃষ্টি করেছে। কবিতার ভাষা সহজ, কিন্তু ব্যঞ্জনা গভীর। কবিতায় কবির প্রেমের কোমলতা রূপ নিয়েছে বিপ্লবী দৃঢ়তায়। কবিতার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :

بول کے لب آزاد ہیں تیرے
بول، زباں اب تک تیری ہے
تیرا ستواں جسم ہے تیرا
بول کہ جاں اب تک تیری ہے
دیکھ کے آہن گر کی دکاں میں
تند ہے شعل، سرخ ہے آہن
کھلنے لگے قفلوں کے دہانے
پھیلا ہر اک زنجیر کا دامن[২৯]

(বল, তোমার ঠোঁট এখনো স্বাধীন।
বল, তোমার জিহবা এখনো তোমারই।
তোমার সোজা দেহ এখনো তুমিই,
বল, তুমি এখনো তোমারই।
দেখো, লৌহকারের আগুন জ্বলছে,
ধোঁয়ার ভিতর লাল হয়ে উঠেছে লোহা।
তালা এখনো বন্ধ হয়নি,
শিকল এখনো পুরো শক্ত হয়ে গেছে।)

এ কবিতায় ভাষা হয়ে ওঠে পরিচয় ও অস্তিত্বের প্রতীক। কথা বলা মানে কেবল শব্দ উচ্চারণ নয়; এটি আত্মপরিচয় রক্ষা, সত্য প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। কবিতায় লোহা, আগুন, ধাতু গলানোর চিত্র এসেছে। এটি শ্রমিকশ্রেণির প্রতীক। শোষিত মানুষ যেন উত্তপ্ত লোহাড়্যাকে আকার দেওয়া হচ্ছে, নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটি শক্তিরও প্রতীক। লোহা ভেঙে নতুন রূপ নিতে পারে। কবি এখানে নিপীড়িত মানুষকে জাগিয়ে তুলেছেন নিজের অধিকার ও কণ্ঠস্বরের দাবি জানানোর জন্য। রাজনৈতিক নিপীড়নের যুগে এই কবিতা সাধারণ মানুষের কাছে ছিল এক প্রেরণার উৎস।

"بول" কবিতাটি কেবল ব্রিটিশবিরোধী আহ্বান নয়; এটি সর্বকালের জন্য প্রাসঙ্গিক। যে কোনো রাষ্ট্রে, যে কোনো যুগে, যখন ক্ষমতা সত্যকে দমন করতে চায়, তখন এই কবিতা নতুন অর্থ পায়। সাহিত্য সমালোচক রালফ রাসেল (Ralph Russell) "بول" কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

> the poem 'Bol' remains a spirited call to all free men, in any country and any age, to speak out boldly what free men have a duty to say.[৩০]
> ('বোল' কবিতাটি সব যুগ ও সব দেশের স্বাধীনচেতা মানুষের জন্য এক শক্তিশালী আহ্বান যাতে তারা সাহসের সঙ্গে সেই সত্য উচ্চারণ করে, যা বলা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।)

ফয়েজের সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ এবং স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের কারণে তাঁকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলোর অনেকটা তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন। কিন্তু ফয়েজের চিন্তাধারাকে কখনোই বন্ধ করা যায়নি, তাঁর আদশের ওপরও কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সম্ভব হয়নি। তাই গ্রেফতারের সময়েও তিনি তাঁর কবিতায় বিপ্লবী চিন্তার প্রকাশ অব্যাহত রেখেছিলেন। এক কবিতায় তিনি বলেন :

اے خاک نشینوں اُٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آپہنچا ہے
جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اُچھالے جائیں گے
اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں
جو دریا جھوم کے اُٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے[৩১]

(হে ধুলায় শায়িত, ওঠে দাঁড়াও, সেই সময় খুব কাছে এসে গেছে
যখন সিংহাসন ভেঙে ফেলা হবে, মুকুট ছুঁড়ে ফেলা হবে।
শৃংখল যত ছিঁড়ে পড়বে আজ পড়বে, কারাগারগুলো সব হবে উধাও,
যে জোয়ার একবার জেগে উঠেছে, তাকে খড়কুটো দিয়ে আর থামানো যাবে না।)

ফয়েজ এমন এক সমাজব্যবস্থার কল্পনা করেছেন যেখানে অন্যায় ও দমননীতি বিলুপ্ত হবে। এটি একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাব্যিক রূপ।

ফয়েজের জীবদ্দশায় দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫। দুটি বিশ্বযুদ্ধ ফয়েজের চিন্তা ও সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশ্বযুদ্ধ ফয়েজকে উপলব্ধি করিয়েছিল যে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে। যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ, উপনিবেশ এবং মানবমুক্তির আকাঙ্খা তাঁর কবিতাকে রাজনৈতিক ও মানবতাবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কবিতায় জাতি, ধর্ম বা ভূখণ্ডের সীমা অতিক্রম করে একটি সার্বজনীন মানবতাবাদী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবমুক্তির পক্ষে কণ্ঠ উঁচু করেছেন।

ফয়েজের বিখ্যাত কবিতা "لینن گراڈ کا گورستان" দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং মানবিক ত্যাগের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত। এই কবিতায় ফয়েজ যুদ্ধের নির্মমতা ও মানুষের আত্মত্যাগকে গভীর মানবিক দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। লেনিনগ্রাদের কবরস্থান তাঁর কাছে শুধু মৃতদের সমাধিক্ষেত্র নয়; বরং ইতিহাসের এক মর্মান্তিক স্মৃতিস্তম্ভ। তিনি এই কবিতার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে শহীদদের আত্মত্যাগ মানবজাতির স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের সংগ্রামকে চিরকাল প্রেরণা দিয়ে যাবে।

এ প্রসংগে কবিতার কয়েকটি চরণ উদাহরণ হিসেবে দেয়া হলো :

سرد سلوں پر

زرد سلوں پر

تازہ گرم لہو کی صورت

گلدستوں کے چھینٹے ہیں

کتبے سب بے نام لیکن

ہر اک پھول پہ نام لکھا ہے

غافل سونے والے کا

یاد میں رونے والے کا

اپنے فرض سے فارغ ہو کر

اپنے لہو کی تان کے چادر

سارے بیٹے خواب میں ہیں

اپنے غموں کا ہار پرو کر

اماں اکیلی جاگ رہی ہے[৩২]

(ঠান্ডা পাতায়
হলুদ পাতায়
তাজা উষ্ণ রক্তের রূপ
তোড়াগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে
বইগুলো সব নামহীন কিন্তু
প্রতিটি ফুলের একটি নাম লেখা আছে
অসচেতন ঘুমে শুয়ে থাকা মানুষের,
আর তার স্মৃতিতে কাঁদতে থাকা মানুষের।
নিজ নিজ কর্তব্য শেষ করে
নিজেদের রক্তের বোনা চাদর গায়ে দিয়ে
সব ছেলেরা এখন স্বপ্নের ঘুমে ডুবে আছে।
নিজের দু:খের মালা গেঁথে
মা একা জেগে আছে।)

এই কবিতায় কবি দেখিয়েছেন যে যুদ্ধের সময় অসংখ্য মানুষ স্বাধীনতা ও মানবতার জন্য প্রাণ দিয়েছে। লেনিনগ্রাদের কবরস্থান সেই সব শহীদ মানুষের স্মৃতি ধারণ করে আছে। কবরগুলোর নীরবতা যেন ইতিহাসের ভাষায় কথা বলে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুদ্ধের ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি লেনিনগ্রাদের শহীদদের কেবল রাশিয়ার মানুষ হিসেবে দেখেন না; বরং সমগ্র মানবজাতির সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেন।

ফয়েজ শুধু মার্কসবাদী নন, তিনি একজন মানবতাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, রোমান্টিক কবিও। তাঁর কবিতায় প্রেম, সৌন্দর্য ও মানবিক মূল্যবোধের সাথে সামাজিক ন্যায়বিচারের সমন্বয় দেখা যায়। তিনি "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" বইটিকে প্রশংসা করেছেন, যা ১৯শ শতাব্দীতে কমিউনিস্ট রাজনীতিকে বিপ্লবী করে তুলেছিল।

ফয়েজের মার্কসবাদী কবিতা আজকের নব-উদারনীতিবাদী যুগেও প্রাসঙ্গিক, কারণ তা শোষণ, অসাম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করে। তবে তিনি কঠোর কমিউনিস্ট ছিলেন না। ১৯৫০-৬০ এর দশকে তিনি সমাজতন্ত্রের পক্ষে আওয়াজ তুললেও তাঁর কবিতায় ইসলামি মূল্যবোধ ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

ফয়েজ ১৯৩৬ সালে সাজ্জাদ জহিরের সংস্পর্শে এসে 'প্রগতিশীল লেখক সংঘ'-এ যোগ দেন। এই সংগঠনের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'প্রগতিশীল লেখক সংঘ' হয়ে উঠেছিল বামমনস্ক সাহিত্যিকদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন। স্বাধীনতার লড়াই এবং মার্কসবাদী পথে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী ছিলেন অধিকাংশ সদস্য। সাজ্জাদ জহির, মুলক রাজ আনন্দ, ফিরাখ গোরখপুরি, কায়ফী আজমী, মুনশী প্রেমচাঁদ, কৃষণ চন্দর, ইসমত চুগতাঈ, রাজেন্দর সিং বেদী, সাহির লুধিয়ানভী সহ সারা ভারতবর্ষের প্রতিভাবান কবি, সাহিত্যিক এই আন্দোলনে যোগ দেন।

ফয়েজ প্রেমমূলক কবিতার মাধ্যমে উর্দু কাব্যকলায় পদার্পণ করেছিলেন। কিন্তু 'প্রগতিশীল লেখক সংঘ'-এ যোগ দান তাঁর লেখায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। তাঁর কবিতায় প্রেম বিপ্লবী চেতনায় রূপ নেয়। তাঁর কবিতায় প্রেম নিছক ব্যক্তিগত আবেগে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর প্রেমের কবিতায় সামাজিক সংগ্রামের সুর অনুরণিত হয়। ব্যক্তিগত প্রেমকে তিনি রূপান্তরিত করেছেন মানুষের মুক্তির প্রতীকে। প্রিয়জনের মুখচ্ছবি তাঁর কাছে শোষিত মানুষের দু:খ-দুর্দশার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠে। প্রবন্ধকার আহসান উল হক বলেন :

> Even during his confinement, the changes anticipated from revolutionary action are almost presented in his lyrics as his poetry bears a peculiar kind of beauty had a special aesthetics. First, Fair considers the pain of love the only pain (female), but with the advent of the Progressive Writers Movment, he began to consider other pains around him.[৩৩]
>
> (এমনকি তাঁর কারাবাসের সময়ও, তিনি যে বিপ্লবী পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন তার আভাস তাঁর গীতিকবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। তার কবিতায় এক ধরনের স্বতন্ত্র সৌন্দর্য ও বিশেষ নান্দনিকতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকে ফয়েজ প্রেমের বেদনা-বিশেষত নারীর প্রেমের বেদনাকেই একমাত্র বেদনা বলে মনে করতেন। কিন্তুপ্রগতিশীল লেখক আন্দোলনে-এ যোগ দানের পর তিনি নিজের চারপাশের দু:খ-কষ্টকেও উপলব্ধি করতে শুরু করেন এবং সেগুলোকেও তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেন।)

ফয়েজ মনে করতেন কবিতা হলো সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার। তিনি প্রথাগত 'গজল' বা প্রেমের কবিতার কাঠামো ব্যবহার করেও সেখানে রাজনৈতিক বন্দিত্ব, শোষণ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে তুলে ধরেছেন। ফয়েজের কাব্যে ব্যক্তিগত প্রেম ধীরে ধীরে রূপ নেয় সামাজিক প্রেমে। তিনি বলেন, কেবল প্রেয়সীর প্রেমে ডুবে থাকা সম্ভব নয়, কারণ চারদিকে দারিদ্র্য ও শোষণের চিত্র। ব্যক্তিগত ভালোবাসা থেকে তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকে অগ্রসর হন। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা হলো ' مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ مانگ ', যেখানে কবির ব্যক্তিগত প্রেমের চেয়ে নিপীড়িত মানুষের দু:খ-দুর্দশাই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। চারপাশের মানুষের ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং পরাধীনতা তাকে এতটাই ব্যথিত করেছে যে শুধু ব্যক্তিগত প্রেম নিয়ে মগ্ন থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এমন মনোভাব প্রকাশ করে কবি বলেন :

مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ مانگ

میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات

تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے

تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات

تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے

تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے

یوں نہ تھا، میں فقط چاہا تھا یوں ہو جائے

اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا

راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا[৩৪]

(আমার প্রথম ভালোবাসার কথা জিজ্ঞেস করো না, আমার প্রিয়তমা।
আমি ভেবেছিলাম যদি তুমি থাকো, জীবন উজ্জ্বল।
যদি তোমার দু:খ থাকে, তাহলে দু:খ আর দু:খের মধ্যে ঝগড়া কী?
তোমার আবির্ভাব পৃথিবীর ঝর্ণার স্থিতিশীলতার উৎস।
তোমার চোখ ছাড়া পৃথিবীতে আর কি আছে?
তাই তুমি যা পাবে, ভাগ্য তোমারই হবে।
এটা এমন ছিল না, আমি শুধু এটা এরকমই চেয়েছিলাম।
ভালোবাসা ছাড়াও পৃথিবীতে আরও কিছু দু:খ আছে।
মিলনের আনন্দ ছাড়াও আরো আনন্দ আছে।)

এখানে ব্যক্তিগত প্রেম এবং সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে এক সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। ফয়েজ বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত প্রেম হলো মানবতার প্রতি ভালোবাসা, এবং সেই প্রেমই রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেয়।

ফয়েজের কবিতায় হতাশা ও আশাবাদের মিশ্রণ তাকে উর্দু সাহিত্যে এক অনন্য স্থান দিয়েছে। তার কবিতায় জীবনের তিক্ততা, সামাজিক নিপীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে বেদনাদায়ক প্রতিবাদ হিসেবে হতাশার রঙ ফুটে ওঠে। এই আবেগগুলোই তার যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক উদাসীনতাকে চিত্রিত করে, যেখানে আশার আলো ম্লান মনে হয় । 'یاس' কবিতায় ফয়েজ বলেন :

بربط دل کے تار ٹوٹ گئے

ہیں زمیں بوس راحتوں کے محل

مٹ گئے قصہ ہائے فکر و عمل

بزم ہستی کے جام پھوٹ گئے[৩৫]

(হৃদয়ের তার ভেঙে গেছে,
সান্ত্বনার প্রাসাদ মুছে গেছে
চিন্তা ও কর্মের গল্প মুছে গেছে
মহাবিশ্বের পেয়ালা ভেঙে গেছে।)

অন্যদিকে, ফয়েজের কবিতায় আশাবাদের গভীর আভাসও পাওয়া যায়, যা কষ্টের মাঝে নতুন ভোরের আশা জাগিয়ে তোলে। তিনি যন্ত্রণা ও সংগ্রামকে পরাজয় হিসেবে গ্রহণ করেন না, বরং আমাদের নতুন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। ' آج کی رات ' কবিতায় তিনি বলেন :

آج کی رات سازِ درد نہ چھیڑ

دکھ سے بھرپور دن تمام ہوئے[৩৬]

(আজ রাতে যন্ত্রণার বাদ্যযন্ত্র বাজিও না

দু:খ ভরা দিন শেষ হয়েছে।)

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের কবিতা উর্দু সাহিত্যে প্রশস্ততা এবং সর্বজনীনতার কারণে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। তিনি কেবল তাঁর স্বদেশের মানুষের কথা প্রকাশ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং তৃতীয় বিশ্বের নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে তিনি এমন একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জন করেছিলেন যা উর্দু কবিতায় একটি বিরল সংযোজন। ফয়েজের কবিতায় এই আন্তর্জাতিকতা তাঁর সচেতন মনোভাবের প্রকাশ, যা কুসংস্কারমুক্ত এবং মানবতাবাদের উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট। তিনি জাতীয় ও ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে তাঁর কবিতায় মানবতার সামগ্রিক বেদনাকে মূর্ত করেন।

ফয়েজের কবিতায় আন্তর্জাতিকতার উপাদানগুলি সরাসরি তার সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমি দ্বারা প্রভাবিত। এটা বলা সম্পর্ণ ভুল হবে যে তিনি তাঁর কবিতাগুলিতে কেবল ঘটনার বর্ণনা করেছিলেন। বরং, ফয়েজ সময়ের চেতনাকে আত্মস্থ করেছিলেন এবং এটিকে একটি নান্দনিক অভিজ্ঞতায় রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর কবিতাগুলির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল মানবতার বৃহত্তর দু:খ, আকাঙ্খা এবং সংগ্রামের কণ্ঠস্বর দেওয়া।

ফয়েজের রাজনীতি কেবল পাকিস্তানের সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ফিলিস্তিন, ভিয়েতনাম, লেবানন, ইরান এবং আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের পক্ষেও কলম ধরেছেন। তাঁর কবিতায় লড়াকু মানুষের যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের নয়, বরং সারা বিশ্বের সর্বহারা মানুষের।

ফয়েজের এই মানবিক বেদনা কোনও সীমিত জাতীয় বা সামাজিক চেতনার ফসল নয়, বরং এর একটি মহাজাগতিক পরিধি রয়েছে। এই আবেগ কেবল স্বদেশের স্বাধীনতার গানই গায় না, বরং বিশ্বজুড়ে নিপীড়িতদের আর্তনাদকে তার কণ্ঠস্বর করে তোলে। আফ্রিকান যোদ্ধা থেকে শুরু করে ইরানি ছাত্র আন্দোলন, সর্বত্র ফয়েজ তার কলমের মাধ্যমে সেই নিপীড়িত মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন যারা নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ' ایرانی طلبا کے نام ' নামক কবিতায় ফয়েজ বলেন :

یہ کون جواں ہیں ارض عجم

یہ لکھ لٹ

جن کے جسموں کی

بھرپور جوانی کا کندن

یوں خاک میں ریزہ ریزہ ہے

یوں کوچہ کوچہ بکھرا ہے[৩৭]

(যুবকরা, এ কোন অদ্ভুত ভূমি

যাদের দেহ

এত যৌবনে ভরা যে

তারা ধুলোয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।)

এছাড়াও 'آجاؤ افریقا' কবিতায় ফয়েজ ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আফ্রিকান প্রতিরোধ আন্দোলনের উত্থানকে পূর্বাভাস দেন। এই কবিতাতেও তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠবার জন্য আফ্রিকার প্রতি সরাসরি আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন, আফ্রিকানরা বিদেশি দাসত্বের শেকল ঝেড়ে ফেলতে শুরু করেছে। লক্ষণীয় যে, এই কবিতায় কবি ঢাকের শব্দ ও নৃত্যের মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা বিদেশি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রতীক। 'آجاؤ افریقا' নামক কবিতায় কবি বলেন :

آجاؤ میں نے سن لی ترے ڈھول کی ترنگ
آجاؤ مست ہو گئی میرے لہو کی تال
"آجاؤ ایفریقا "
آجاؤ میں نے دھول سے ماتھا اٹھا لیا
آجاؤ نے چھیل دی آنکھوں سے غم کی چھال
آجاؤ میں نے درد سے بازو چھڑا لیا[৩৮]

(আমি তোমার ঢাকের উন্মাদনা ধারণ করেছি,
আমার বুনো রক্ত তার তালে তালে স্পন্দিত হয়।
এসো আফ্রিকা,
ফিরে এসো, কারণ আমি ধুলো থেকে কপাল তুলে নিয়েছি;
ফিরে এসো, কারণ আমি চোখ থেকে বিষাদের খোলস ছিঁড়ে ফেলেছি;
ফিরে এসো, কারণ আমি আমার যন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলেছি।)

এখানে آجاؤ (ফিরে এসো) হলো সাম্রাজ্যবাদ-পূর্ব আফ্রিকার ঢাকের তালে ও সামরিক নৃত্যের এক সরাসরি আহ্বান।

ফয়েজের 'سر وادیٔ سینا' কবিতায় এই একই আন্তর্জাতিকতা পূর্ণ শক্তিতে স্পষ্ট।

پھر برق فروزاں ہے سر وادیٔ سینا
پھر رنگ پہ ہے شعلۂ رخسار حقیقت[৩৯]

(তারপর বিদ্যুৎ চমকায়, উপত্যকার মাথা জ্বলছে
তারপর গালে আগুনের শিখা, বাস্তবতা মৃত্যুর বার্তা, বাস্তবতা দেখার আমন্ত্রণ।)

ফয়েজের মানবতাবাদ জাতি, বর্ণ এবং জাতির পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত। তিনি নিপীড়িতদের জন্য আওয়াজ তোলেন, চাই তারা যে অঞ্চলেরই হোক না কেন। আমেরিকান কর্তৃপক্ষ যখন এথেল এবং জুলিয়াস রোজেনবার্গকে ফাঁসি দেয়, তখন ফয়েজ তাদের স্মৃতিতে এমন একটি শোকগাথা তৈরি করেন যা বিপ্লবী কবিতার ইতিহাসে অতুলনীয়। তিনি লিখেছেন :

تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم
دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے
تیرے ہاتوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم
نیم تاریک راہوں میں مارے گئے

جب گھلی تیری راہوں میں شامِ ستم
ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم
لب پہ حرفِ غزل دل میں قندیلِ غم[৪০]

(তোমার ঠোঁটের ফুলের আকাঙ্খায়
গাছের শুকনো ডালে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম,
তোমার হাতের মোমবাতির আকাঙ্খায় আমরা
নিহত হয়েছিলাম আধা-অন্ধকার পথে,

যখন তোমার পথে অত্যাচারের সন্ধ্যা ছড়িয়ে পড়ে
আমরা চলে আসি যতদূর আমাদের কদম
ঠোঁটে গজলের অক্ষর আর হৃদয়ে দু:খের মোমবাতি।)

এই কবিতাটি কেবল একটি সংগ্রামের গল্পই বলে না, বরং নিপীড়ন ও অত্যাচারের অবসান ঘটাতে প্রতিটি নিপীড়িত ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানোর জন্য ফয়েজের দৃঢ় সংকল্পকেও প্রতিফলিত করে। তাঁর কবিতা আন্তর্জাতিক, কারণ তা স্থানীয় ক্ষেত্র থেকে নিপীড়ন ও বিদ্রোহকে বের করে এনে একটি বিশ্বব্যাপী চেতনায় রূপান্তরিত করে। এই কারণেই তার কবিতা তার যুগের সীমানা অতিক্রম করে একটি চিরজীবিত বাস্তবতায় পরিণত হয়।

জেনারেল জিয়াউল হকের সামরিক শাসনের সময় ফয়েজ নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন। সে সময় তিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে লেবাননে আশ্রয় নেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত তিনি লেবাননের রাজধানী বৈরুতে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। সে সময় তিনি লেবাননকে নিয়ে "ایک نغمہ کربلائے بیروت کے لیے" শিরোনামে একটা কবিতা লিখেন। কবিতাটি একটি রাজনৈতিক ও মানবতাবাদী কবিতা। এটি মূলত লেবাননের রাজধানী বৈরুতে সংঘটিত যুদ্ধ, ধ্বংস ও নিরীহ মানুষের দু:খ-বেদনার প্রেক্ষাপটে রচিত। বিশেষ করে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের ফলে বৈরুত যে ভয়াবহ ধ্বংসের মুখে পড়ে, সেই প্রেক্ষাপটই কবিতার পটভূমি। কবিতার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :

اس شہر کی گلیاں روشن ہیں
اور تاباں ہے ارضِ لبنان
بیروت نگارِ بزمِ جہاں
ہر ویراں گھر، ہر ایک کھنڈر
ہم پایۂ قصرِ دارا ہے
ہر غازی رشکِ اسکندر
ہر دختر ہمسر لیلیٰ ہے
یہ شہر ازل سے قائم ہے
یہ شہر ابد تک دائم ہے
بیروت نگارِ بزمِ جہاں

بیروت بدیل باغِ جناں[৪৯]

(এই শহরের গলিগুলো আলোকিত,
আর জ্বলজ্বল করছে লেবাননের মাটি।
বৈরুত, বিশ্ব-সম্ভারের সভার অলংকার।
প্রতিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর, প্রতিটি ধ্বংসস্তূপ
দারার প্রাসাদের সমকক্ষ,
প্রতিটি বীর যেন আলেকজান্ডারের ঈর্ষার কারণ,
প্রতিটি কন্যা যেন লাইলার সমান সৌন্দর্যের অধিকারী।
এই শহর আদিকাল থেকে অটুট,
এই শহর অনন্তকাল পর্যন্ত টিকে থাকবে।
বৈরুত, বিশ্ব-সম্ভারের সভার অলংকার,
বৈরুত যেন জান্নাতের বাগানের বিকল্প।)

এই কবিতায় ফয়েজ বৈরুত শহরকে প্রতীকীভাবে 'কারবালার' সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেমন কারবালার ট্র্যাজেডিতে সত্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল, তেমনি বৈরুতের সাধারণ মানুষও যুদ্ধের মধ্যে অসীম কষ্ট সহ্য করছে। কবি শহরের ধ্বংসস্তূপ, রক্তপাত এবং মানুষের দু:খকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

ফয়েজের দৃষ্টিতে বৈরুত শুধু একটি শহর নয়, বরং নিপীড়িত মানুষের সংগ্রাম, সাহস এবং আত্মত্যাগের প্রতীক। তাই তিনি এই কবিতায় শোক প্রকাশের পাশাপাশি প্রতিরোধ ও মানবিক সংহতির আহ্বান জানিয়েছেন।

ফিলিস্তিনের সর্বত্র আগুন আর রক্তের স্রোত। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ এবং বিমান হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি। এতে শহীদ হয়েছেন অসংখ্য ফিলিস্তিনি। বিশ্ব শান্তির পক্ষে এবং মানবতার শিক্ষাদানকারী দেশগুলির নীরবতা এবং অসহায়ত্ব দেখে নিপীড়িত ফিলিস্তিনিরা বিস্মিত। ফিলিস্তিনের এই করুণ অবস্থা দেখে ফয়েজ চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। তিনি নির্যাতিত ও নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠেন। তাদেরকে নিয়ে লিখেন কবিতা।

ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক নেতা এবং প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও) এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত এবং ফিলিস্তানের আরব কবি মাহমুদ দারবিশের সাথে ফয়েজের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তিনি ফিলিস্তিনকে তার দ্বিতীয় স্বদেশ বলে মনে করেন। তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতায় সরাসরি ফিলিস্তিন এবং এর বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর এ সকল কবিতায় ফিলিস্তিনিদের বেদনা, ক্রোধ ও স্থিতিস্থাপকতার কণ্ঠস্বর ফুটে উঠেছে।

ফিলিস্তিনকে নিয়ে লেখা ফয়েজের একটি কবিতা হলো 'فلسطینی بچے کے لیے لوری' যেখানে ফিলিস্তিন শিশুদের প্রতি কবির গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। কবি বলেন :

مت رو بچے
رو رو کے ابھی
تیری امی کی آنکھ لگی ہے
مت رو بچے
کچھ ہی پہلے

تیرے ابا نے

اپنے غم سے رخصت لی ہے

مت رو بچے

تیرا بھائی

اپنے خواب کی تتلی پیچھے

دور کہیں پردیس گیا ہے

مت رو بچے

تیری باجی کا

ڈولا پرائے دیس گیا ہے

مت رو بچے

تیرے آنگن میں

مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں

چند رما دفنا کے گئے ہیں

مت رو بچے

امی، ابا، باجی، بھائی

چاند اور سورج

تو گر روئے گا تو یہ سب

اور بھی تجھ کو رلوائیں گے

تو مسکائے گا تو شاید

سارے اک دن بھیس بدل کر

تجھ سے کھیلنے لوٹ آئیں گے[۸۲]

(কেঁদো না সোনা
তোমার মা ঘুমিয়ে পড়েছে
কাঁদতে কাঁদতে ।
কেঁদো না সোনা
কিছুক্ষণ আগে
তোমার বাবা ছুটি নিয়েছেন
তার সকল দু:খ থেকে।
কেঁদো না সোনা
তোমার ভাই চলে গেছে
অন্য কোন ভূমির দিকে
তার প্রিয় প্রজাপতির পিছনে ছুটতে ছুটতে ।

কেঁদো না সোনা
তোমার বোনের কফিন
দূর দেশে চলে গেছে।
কেঁদো না সোনা
মৃত সূর্য তোমার উঠোনে স্নান করতে গেছে
চাঁদ তাকে কবর দিতে গেছে।
কেঁদো না সোনা
মা, বাবা, বোন, ভাই
চাঁদ এবং সূর্য
তুমি কাঁদলে তারা সবাই
তোমাকে আরো কাঁদাবে
তুমি হাসলে, সম্ভবত
সকলে একদিন ছদ্মবেশে
তোমার সাথে খেলতে ফিরে আসবে।)

' فلسطینی شہدا جو پردیس میں کام آئے ' কবিতায় ফয়েজ সরাসরি ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের আত্মত্যাগের প্রশংসা করেছেন, যারা দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে শহীদ হয়েছেন। কবিতার শিরোনামই ফয়েজের সরাসরি অবস্থান নির্দেশ করে। একজন স্বাধীনতাযোদ্ধার আত্মত্যাগ অসংখ্য নতুন ফিলিস্তিনি যোদ্ধার জন্ম দেয়। কবি বলেন :

جس زمیں پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم
لہلہاتا ہے وہاں ارضِ فلسطیں کا عَلَم
تیرے اعدا نے کیا ایک فلسطیں برباد
میرے زخموں نے کئے کتنے فلسطیں آباد[৪৩]

(যে মাটিতে আমার রক্তের পতাকা উত্তোলিত হোক না কেন
ফিলিস্তিনের ভূমির জ্ঞান ভেসে উঠে সেখানে।
তোমার শত্রুরা কি ধ্বংস করেছে একটি ফিলিস্তিন
আমার ক্ষত সৃষ্টি করেছে অসংখ্য ফিলিস্তিন।)

১৯৮৩ সালে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফয়েজ "ایک ترانہ مجاہدین فلسطنین کے لئے" নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর কবিতায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে এবং বিজয়ের সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে। কবিতাটি নিম্নরূপ :

ہم جیتیں گے
حقا ہم اک دن جیتیں گے
بالآخر اک دن جیتیں گے
کیا خوف زیلغار اعدا
ہے سینہ سپر ہر غازی کا

کیا خوف زیورش جیش قضا

صف بستہ ہیں ارواح الشہدا

ڈر کاہے کا

ہم جیتیں گے

حقا ہم اک دن جیتیں گے

قد جاء الحق وزھق الباطل

فرمودۂ رب اکبر

ہے جنت اپنے پاؤں تلے

اور سایۂ رحمت سر پر ہے

پھر کیا ڈر ہے

ہم جیتیں گے

حقا ہم اک دن جیتیں گے

بالآخر اک دن جیتیں گے[88]

(আমরা জিতবোই,
সত্যিই আমরা একদিন জিতবো,
অবশেষে আমরা একদিন জিতবোই।
শত্রুর ভয়,
প্রতিটি বীরের বুকে কীসের ভয় ?
বিচারের বাহিনীতে কী ভয়,
শহীদদের আত্মারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে,
বিচারের বাহিনীতে কী ভয় ?
আমরা জিতবো,
সত্যিই আমরা একদিন জিতবো।
সত্য এসেছে এবং বাতিল ধ্বংস হয়েছে
প্রভুর বাণী সর্বশ্রেষ্ঠ
জান্নাত তোমার পাঁয়ের নিচে
এবং রহমতের ছায়া তোমার মাথার উপরে।
তাহলে ভয়ের কি আছে?
আমরা জিতবোই,
সত্যিই আমরা একদিন জিতবো,
অবশেষে আমরা একদিন জিতবোই।)

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা চালায় বাংলাদেশে। বীর বাঙালী অস্ত্র হাতে রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। সে সময় বাংলাদেশে সংগঠিত পাক-বাহিনীর নির্মমতা ও বর্বরতা দেখে ফয়েজের অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। কলমের তুলিতে তাঁর সেই কষ্টের কথা তুলে ধরেন দরদভরা কণ্ঠে। বাংলাদেশকে নিয়ে লিখেন দুটি কবিতা।

১৯৭১ সালের আগে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক বৈষম্য, ভাষা-সংকট ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা চরম আকার ধারণ করে। এই উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে ফয়েজ ঢাকায় সফর করেন। তিনি এসে এখানকার মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অবিশ্বাস, ভাঙন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার বাস্তব চিত্র দেখেন।

ঢাকা থেকে ফিরে তিনি গভীর বেদনা ও আত্মসমালোচনার অনুভূতি নিয়ে "ڈھاکہ سے واپسی پر" কবিতাটি লিখেন। এই কবিতায় তিনি একদিকে বিভক্তির ট্র্যাজেডি, অন্যদিকে মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। কবিতাটি মূলত ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ ও রাষ্ট্রীয় অবিচারের বিরুদ্ধে এক মানবিক প্রতিবাদ।

"ڈھاکہ سے واپسی پر" কবিতাটি শুধু একটি শহর সফরের স্মৃতিচারণ নয়। এটি আসলে ইতিহাসের এক সংকটময় মুহূর্তের মানবিক দলিল। ফয়েজ তাঁর স্বভাবসুলভ কোমল ভাষায় যুদ্ধ, বিভক্তি এবং মানুষের বেদনার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন :

ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد
پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد
کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار
خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد
تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے
تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد
دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی
کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد[৪৫]

(এত স্নেহ-আপ্যায়নের পরও আমরা তো রয়ে গেলাম অপরিচিত,
তবে আবার কবে হব পরিচিত , আর কত সাক্ষাতের পরে ?
কবে চোখে ধরা দেবে কলঙ্কহীন সবুজ বসন্ত?
রক্তের দাগগুলো ধুয়ে যাবে আর কত বর্ষণের পরে?
ভালোবাসার বেদনার অবসানের পরও অনেক নিষ্ঠুর মুহূর্ত ছিল,
স্নিগ্ধ রাতগুলোর পরও অনেক নির্দয় সকাল এসেছে।
মন তো চেয়েছিল, কিন্তু ভাঙা হৃদয় আর সুযোগ দিলো না,
প্রার্থনার পর কিছু অভিযোগ-অভিমানও জানাতে পারতাম।)

ফারসি-উর্দু সাহিত্যধারার অন্যতম প্রিয় উপাদান হলো ইনভোকেশন বা প্রার্থনা। মানুষ একটি সামাজিক সত্তা, যার মধ্যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতার তীব্র আকাঙ্খা রয়েছে। এই নীরব মহাবিশ্বে মানুষ তার বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিউত্তরের প্রত্যাশা করে। যখন সে তার স্রষ্টার সঙ্গে সংলাপে লিপ্ত হয়, তখন তার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ও চারপাশের বিশাল জগতের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। প্রার্থনার এই ক্রিয়াটি মানুষের মধ্যে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে একটি সামষ্টিক বন্ধনের অনুভূতি জাগ্রত করে। ইসলামে দোয়া প্রার্থনার মূল সত্তা। ফয়েজও সমাজতান্ত্রিক কাব্যিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলামী ধর্মীয় উপাদান হিসেবে ইনভোকেশনকে (গোপন বক্তব্য হিসেবে) ব্যবহার করেছেন। ফয়েজের কবিতা 'دعا' (প্রার্থনা) শিল্পীর আদর্শিক অঙ্গীকারের ওপর সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কে কবির সচেতনতার প্রতিফলন ঘটায়।

'دعا' কবিতায় কবি তাঁর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যেন তিনি সমাজের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত মানুষদের শক্তি দান করেন, যাতে তারা শোষণমূলক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এবং পৃথিবীতে মানুষের খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের মিথকে বাস্তবায়িত করতে পারে, যেমনটি ঈশ্বর নির্ধারণ করেছেন। কবি বঞ্চিতদের সঙ্গে একত্রে সত্যের পুনরাবিষ্কারের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি মিথ্যা চেতনার শিকারদের জন্য প্রার্থনা করেন, যেন তারা অল্পসংখ্যক মানুষের দ্বারা বহু মানুষের শোষণ ও দমনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তিনি নিপীড়িতদের প্রতি অত্যাচার ও অবিচারের কারিগরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের আহ্বান জানান। কবিতার একটি অংশ প্রার্থনার রূপে নিপীড়িতদের জন্য এই বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহের বার্তাকে স্পষ্ট করে :

جن کا دیں پیروی کذب و ریا ہے ان کو
ہمت کفر ملے جرأت تحقیق ملے
جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو
دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے[৪৬]

(যাদের দ্বীন গড়ে উঠেছে মিথ্যা ও ভণ্ডামির অনুসরণে,
তাদের কুফরের সাহস মিলুক,
সত্য অনুসন্ধানের দু:সাহস মিলুক।
যাদের মাথার উপর নিরন্তর ঝুলে আছে জুলুমের তরবারি,
তাদের এমন শক্তি মিলুক
যাতে তারা ঘাতকের হাত ঝটকে দিতে পারে।)

ফয়েজের রাজনৈতিক কবিতার একটি বিশেষ দিক হলো গোপন বাচনিক রূপকের ব্যবহার। তাঁর ব্যবহৃত গোপন বাচনিক রূপক হলো রাত ও ভোর, শরৎ ও বসন্তের চিত্র। রাত ও শরৎ বর্তমান নিপীড়ন ও সামাজিক-রাজনৈতিক অবিচারকে নির্দেশ করে, আর ভোর ও বসন্ত ভবিষ্যৎ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রতি আশা ও আশাবাদকে প্রতীকায়িত করে। একইভাবে, ফয়েজের কবিতায় প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহারও গোপন বাচনিক সংকেত হিসেবে কাজ করে। কালো রঙ ঘন অন্ধকারকে নির্দেশ করার পাশাপাশি সকালের উজ্জ্বলতাকে আরও তীব্র করে তোলে। ভোরের লাল কিরণ মানব আত্মত্যাগের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের আগমনকে ইঙ্গিত করে, যেখানে রক্তের অর্থবোধকতা নিহিত। ভোর ও বসন্তের চিত্র সবসময় তাদের বিপরীত চিত্রের সঙ্গে উপস্থিত হয়; ভোর ও বসন্তের আগে অবধারিতভাবে রাত ও শরৎ আসে। "اگست 1952" (আগস্ট ১৯৫২) কবিতাটি প্রকৃতি-চিত্রকে গোপন বাচনিক রূপে ব্যবহারের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কবি বলেন :

روشن کہیں بہار کے امکاں ہوئے تو ہیں
گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں
اب بھی خزاں کا راج ہے، لیکن کہیں کہیں
گوشے رہِ چمن میں غزل خواں ہوئے تو ہیں
ٹھہری ہوئی ہے شب کی سیاہی وہیں، مگر
کچھ کچھ سحر کے رنگ پَر افشاں ہوئے تو ہیں[৪৭]

(বসন্তের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে কোথাও
কিছু ফুল সবুজ আবরণ ছিঁড়ে ফুঁটে উঠছে।
শরৎ এখনও বাতাসে কিন্তু কোথাও
বাগানের কোণে গজল গাওয়া হয়েছে
রাতের অন্ধকার এখনও স্থির হয়ে আছে , তবে
ভোরের কিছু রঙ ফুটে উঠেছে।)

এই কবিতায় ফয়েজ সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য না দিয়ে প্রতীক ও রূপকের মাধ্যমে রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রকাশ করেছেন। অন্ধকার, নীরবতা, ভাঙা স্বপ্ন ইত্যাদি প্রতীক ব্যবহার করে তিনি সময়ের সংকটকে তুলে ধরেছেন।

" اگست 1952" কবিতাটি ফয়েজের রাজনৈতিক সচেতনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এতে স্বাধীনতার পরবর্তী হতাশা, রাষ্ট্রের দমননীতি এবং জনগণের মুক্তির আকাঙ্খা একসাথে প্রতিফলিত হয়েছে। এই কারণে কবিতাটি শুধু সাহিত্যিক দিক থেকেই নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রকাশ্য বক্তব্যের পাশাপাশি, ফয়েজ তাঁর কবিতা ও গদ্যে নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ব্যাপকভাবে 'গুপ্ত বক্তব্য' বা hidden transcripts ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতায় প্রেমিক- স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রতিরোধ ও বিপ্লবের শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে; অন্যদিকে খলনায়ক- শাসক শ্রেণি, আধিপত্যবাদী শক্তি, পুঁজিপতি এবং অসামরিক-সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রতীক। 'প্রেয়সী' বা 'প্রেমিকা' প্রতীক হয়ে ওঠে স্বদেশের, যা বর্তমানে অত্যাচারী শক্তির দখলে রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজনের সময় ১৯৪৭ সালে রচিত ফয়েজের কবিতা "صبح آزادی " (স্বাধীনতার ভোর) স্বাধীনতা ও দেশভাগের নিঃসঙ্গতা ও হতাশাকে আড়াল করা শব্দের মাধ্যমে ধারণ করেছে। "صبح آزادی " (স্বাধীনতার ভোর) কবিতাটি থেকে একটি অংশ নিচে দেওয়া হলো :

جگر کی آگ نظر کی امنگ بدل کی جلن
کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں
کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی
ابھی چراغ سر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں[৪৮]

(যকৃতের আগুন, চোখের উথালপাথাল, হৃদয়ের দহন।
বিচ্ছেদের এই ওষুধে তাদের কারও কিছুই হলো না।
প্রিয় সকালের হাওয়া কোথা থেকে এসেছিল, আর কোথায়ই বা চলে গেল?
পথের ধারের প্রদীপটি এখনো কিছুই জানতে পারেনি।)

এটি এক প্রকার গীতিময় উপস্থাপনা, যা অপূর্ণ প্রেমের নান্দনিক আবহ তুলে ধরে এবং দেশভাগের সহিংসতা ও অমানবিকতার সরাসরি চিত্রণ এড়িয়ে যায়। " প্রিয় সকালের হাওয়া কোথা থেকে এসেছিল, আর কোথায়ই বা চলে গেল ?" এই ধরনের শব্দবন্ধ স্পষ্টভাবে উপমহাদেশের দেশভাগকালে সাধারণ মানুষের শোচনীয় অবস্থার প্রতি ফয়েজের হতাশাকে প্রতীকীভাবে প্রকাশ করে। "পথের ধারের প্রদীপটি এখনো কিছুই জানতে পারেনি " এই পংক্তিটি গোপন অর্থে ইঙ্গিত করে যে দেশভাগ সম্পন্ন হলেও তার ইতিবাচক ফল এখনো অর্জিত হয়নি। প্রকৃত অর্থে, স্বাধীনতার যাত্রা এখনো অসম্পূর্ণ। এডওয়ার্ড সাইদ ফয়েজকে এমন এক কবি হিসেবে দেখেছেন, যাঁর কবিতা সাহিত্যিক অভিজাত সমাজ ও সাধারণ মানুষের জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জ্বল। তিনি প্রেম ও সৌন্দর্যের কাব্যিক প্রকাশকে সমাজ ও রাজনীতির বাস্তবতায় যুক্ত করেছেন। তাঁর কবিতা শুধু রোমান্টিক আবেগে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মুক্তির সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। তিনি কবিতায় বাকস্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের আহ্বান করেছেন, স্বৈরাচারের পতন ও মানুষের জয়গান গেয়েছেন। এইভাবেই তাঁর কবিতায় প্রেম ও বিপ্লব, সৌন্দর্য ও সংগ্রাম এক হয়ে রাজনৈতিক চেতনার শক্তিশালী রূপ নিয়েছে। তাঁর কবিতা মানুষের অন্তরকে নাড়া দেয়, সংগ্রামে উজ্জীবিত করে এবং ন্যায়বিচারের জন্য লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত করে। এই কারণেই ফয়েজের কাব্য কেবল সাহিত্য ইতিহাসের অংশ নয়, বরং রাজনৈতিক ইতিহাসেরও এক অমূল্য দলিল।

তথ্যসূত্র :

১। রণেশ দাশগুপ্ত, *ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা*, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, জুলাই, ১৯৬৯, পৃ.- ভূমিকা দ্রষ্টব্য

২। প্রফেসর সৈয়দ শফীক্ব আহমদ আশরাফী, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : আফকার ওয়া ইকরার, নিউ পাবলিক প্রেস, দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ.- ২৭

৩। প্রাগুক্ত

৪। Russell, Ralph. *the Pursuit of Urdu Literature*. London : Zed Books, 1992, pp. 230–240.

৫। Ahmad, Aijaz. *In theory : Classes, Nations, Literatures*. London: Verso, 1992, pp. 170–176.

৬। Said, Edward W. *Culture and Imperialism*. New York : Vintage Books, 1993, p. 210.

৭। আলে আহমদ সুরুর, *তানকীদী ইশারে*, নিশাত পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ১৯৭৮, পৃ.-১৮৯

৮। ফিরাক গোরকপুরী, *উর্দু শায়েরী কা মেযাজ*, এলাহাবাদ, ১৯৬৫, পৃ.- ৩১২

৯। Kiernan, Victor G. *Poems by Faiz*. London: George Allen & Unwin, 1971, Introduction, pp. 14–18.

১০। মজনু গোরকপুরী, *তানকীদ ওয়া নযর*, কাওমী কাউন্সিল, ১৯৬৯, পৃ.- ২২১

১১। Justice Syed Shameem Husain Kadri, *Creation of Pakistan*, Army Book Club, 1983, p. 192.

১২। *পাকিস্তানে সামরিক শাসন*, দেশ রূপান্তর(পত্রিকা), প্রকাশকাল : ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

১৩। Russell, Ralph. *the Pursuit of Urdu Literature*. London: Zed Books, 1992, pp. 230–240.

১৪। *The last of the Mohicans (Progressive writers)* Dawn (Newspaper), Published : 1 October 2004

১৫। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *সুবহ-এ-আজাদী (দাস্ত-এ-সাবা)*, আযাদ কিতাব ঘর, দিল্লী, ১৯৫৩, পৃ.- ২৪

১৬। Ahsan Ul Haq, *Faiz Ahmad Faiz: A Study of Resistance, Protest and Voice for Society in his Poetry*, Creative Forum, Vol-33, No.-1-2, Jan-Dec, 2020, Page-13

১৭। *সুবহ-এ-আজাদী (দাস্ত-এ-সাবা)*, পৃ.-২৬

১৮। উইকিপিডিয়া, *সুবহ-এ-আজাদী* দ্রষ্টব্য

১৯। *নিসার মে তেরি* (*দাস্ত-এ-সাবা*), পৃ.-৮০

২০। মুহাম্মদ ইসহাক (প্রাক্তন মেজর), *রোয়ে দাদ-এ-কফস (জিন্দান নামা)*, কবির বুক ডিপো, দিল্লী, পৃ.- ৫৩

২১। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *কালাম-এ-ফয়েজ*, এডুকেশনাল বুক হাউস, আলীগড়, ২০১১, পৃ.- ১৯৭

২২। প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৯৮

২৩। *চাহা হায় ইসি রঙ্গ ম্যায় লায়লা-এ-ওয়াতন* (দাস্ত-এ-সাবা), কিতাব ঘর , দিল্লী, পৃ.-৬১

২৪। *মাতায়ে লওহে কলম (দাস্ত-এ-সাবা)*, পৃ.-১৩

২৫। Victor G. Kiernan, *Poems by Faiz ,* George Allen & Unwin, London, 1971.

২৬। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *হাম দেখেঙ্গে (মেরে দিল মেরে মুসাফির)*, শাহিন বুক সেন্টার, দিল্লী, ১৯৮২, পৃ.-২২-২৩
২৭। *জিন্দান কী এক শাম(দাস্ত-এ-সাবা)* পৃ.- ১০৪
২৮। মুসা আল হাফিজ, *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও কবির লড়াই*, দৈনিক আমাদের সময়, সাহিত্য-সংস্কৃতি সংখ্যা, ১৯ জানুয়ারী, ২০২৩
২৯। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *বোল (নকশ-এ-ফরিয়াদি)*, উর্দু ঘর, দিল্লী, ১৯৪১, পৃ.-৮৩-৮৪
৩০। Ralph Russell, *Faiz Ahmed Faiz: Selected Poems*, Oxford University Press, 1992 p. 233.
৩১। *তারানা (দাস্ত-এ-সাবা)*, পৃ.- ৫২
৩২। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, *নুসখাহা-এ-ওয়াফা*, এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউস, দিল্লী. ১৯৯২, পৃ.-৫৫১
৩৩। *Faiz Ahmad Faiz: A Study of Resistance, Protest and Voice for Society in his Poetry*, Page-13
৩৪। *মুঝছে পেহলি ছি মুহাব্বত মেরে মেহবুব না মাঙ্গ (নকশ-এ-ফরিয়াদি)* পৃ.- ৬১
৩৫। *য়াস (নকশ-এ-ফরিয়াদি)* পৃ.- ৪৯
৩৬। *আজ কী রাত (নকশ-এ-ফরিয়াদি)* পৃ.- ৫১
৩৭। *ইরানি তুলাবা কে নাম (দাস্ত-এ-সাবা)* পৃ.- ৭২
৩৮। *আজাও আফ্রিকা (জিন্দান নামা)* পৃ.- ১২৭
৩৯। *সারওয়াদি-এ-সিনা (সারওয়াদি-এ-সিনা)*, পৃ.- ৫২
৪০। *হাম যো তারিক রাহো মে মারে গায়ে (জিন্দান নামা)* পৃ.- ১১৩
৪১। *এক নাগমা-এ-কারবালা-এ-বৈরুত কে লিয়ে (নুসখাহা-এ-ওয়াফা)*, পৃ.- ৬৯৮
৪২। *ফিলিস্তিনি বাচ্চে কে লিয়ে লড়ি (নুসখাহা-এ-ওয়াফা)*, পৃ.- ৬৫৮
৪৩। *ফিলিস্তিনি শুহাদা যো পরদেশ ম্যায় কাম আয়ে (নুসখাহা-এ-ওয়াফা)*, পৃ.- ৬৫৭
৪৪। *এক তারানা মুজাহিদিন ফিলিস্তিন কে লিয়ে (নুসখাহা-এ-ওয়াফা)*, পৃ.- ৭০০
৪৫। *ঢাকা ছে ওয়াপেছি পর (নুসখাহা-এ-ওয়াফা)*, পৃ.- ৫৩৮
৪৬। *দোয়া*, *(নুসখাহা-এ-ওয়াফা)*, পৃ.- ৪৩০
৪৭। *আগস্ট ১৯৫২ (দাস্ত-এ-সাবা)*, পৃ.- ৭৮
৪৮। *সুবহ-এ-আযাদী (দাস্ত-এ-সাবা)* পৃ.- ২৬

চতুর্থ অধ্যায়

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সমকালীন কয়েকজন উর্দু কবি-সাহিত্যিক

সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ফয়েজ আহমদের সমকাল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম, দেশভাগ, নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থান, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা, সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ। এগুলো ব্যক্তি ও সমাজের পাশপাশি সাহিত্যকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই পরিবর্তনশীল সময়ে উর্দু কবিতা ও গদ্যসাহিত্য কেবল নান্দনিক চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং সমাজবাস্তবতা, মানবমুক্তি, শ্রেণিসংগ্রাম, প্রেম, বেদনা, নির্বাসন, স্বাধীনতা ও প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছিল। ফলে আধুনিক উর্দু সাহিত্যে এমন এক প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে, যাঁদের সাহিত্যকর্মে একই সঙ্গে রোমান্টিকতা, বাস্তববোধ, মানবতাবাদ এবং বিপ্লবী চেতনার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

এই প্রেক্ষাপটে উর্দু সাহিত্যে গড়ে উঠে প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন। এটি উর্দু সাহিত্যে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। ১৯৩৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলন সাহিত্যকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে এবং লেখক ও কবিদের মধ্যে একটি নতুন আদর্শিক চেতনার সঞ্চার ঘটায়। এর প্রভাবে সাহিত্যিকেরা মানুষের জীবনসংগ্রাম, দারিদ্র্য, শোষণ, বৈষম্য এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তাঁদের সৃষ্টির কেন্দ্রে স্থান দেন। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ একটি উজ্জ্বল ও প্রভাবশালী নাম হলেও তিনি একক কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিভা ছিলেন না; বরং তাঁর চারপাশে এমন এক শক্তিশালী সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, যেখানে সাহির লুধিয়ানভি, জোশ মালিহাবাদী, মজরূহ সুলতানপুরী, কাইফি আজমি, এহসান দানিশ, ফিরাক গোরখপুরী, কৃষণ চন্দর, রাজেন্দর সিং বেদী, সাদাত হাসান মান্টো, ইসমত চুগতাই প্রমুখ তাঁদের স্বতন্ত্র সৃজনশীলতা ও চিন্তাধারার মাধ্যমে উর্দু সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সমকালীন উর্দু কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস চালনা হবে।

জিগার মুরাদাবাদী

উর্দু কাব্য সাহিত্যের জনপ্রিয় মুখ জিগার মুরাদাবাদী (১৮৯০-১৯৬০)। উর্দু কাব্যধারার বিভিন্ন শাখায় কবিতা লিখার যোগ্যতা থাকলেও গজলকেই তিনি তাঁর ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

জিগার মুরাদাবাদীর আসল নাম আলী সিকান্দার। জিগার তাঁর কাব্যনাম। তিনি ১৮৯০ সালের ৬ এপ্রিল ভারতের উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সৈয়দ আলী নজর। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন।

জিগার প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গৃহ থেকে গ্রহণ করেন। এরপর তিনি স্থানীয় বিদ্যাপিঠ থেকে প্রাচ্য শিক্ষা অর্থাৎ আরবি ও ফারসি শিক্ষা লাভ করেন। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আপন চাচার কাছে লক্ষ্ণৌতে গমন করেন। সেখানে তিনি নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা তাঁর পছন্দ না হওয়ায় তিনি এর সাথে তাল মিলাতে পারেন নি। ফলে একই ক্লাসে দুইবার অকৃতকার্য হন। এই সময়ে তাঁর জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। তাঁর পিতা অকালে মৃত্যুবরণ করেন। পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে তাকে কর্মমূখী হতে হয়। এ সময় তাঁর চাচা লক্ষ্ণৌর একটি প্রতিষ্ঠানে তাকে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু সেখানে তিনি বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেননি। মুরাদাবাদে ফিরে আসেন। কিছুদিন পর সেখান থেকে আগ্রা গমন করেন। আগ্রায় তিনি একটি চশমা তৈরির কোম্পানিতে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে চাকুরী করেন। চাকুরীর সুবাদে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ফিরেন। অবশেষে গোন্ডায় এসে স্থায়ী হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি গোন্ডায় অবস্থান করেন। ১৯৬০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর গোন্ডায়েই তিনি শেষ নি:শ্বাষ ত্যাগ করেন।[১]

জিগার কাব্যচর্চা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতা ও চাচা দু'জনেই উর্দু কবি ছিলেন। তাদের নিকটেই তাঁর কবিতার হাতেখড়ি হয়। কাব্যচর্চার শুরুতে তিনি হায়াত বখশের কাছ থেকে কবিতাগুলো শুধরে নেন, এরপর দাগের কাছে গমন করেন। কিছুদিন তিনি আমীরুল্লাহ তাছলীমের কাছ থেকেও কবিতাগুলো শুধরে নিয়েছিলেন।

জিগর এমন একজন কবি, যাঁর গজল প্রাচীন গজল এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শেষভাগের রঙিন চিত্রকলার এক সুন্দর মিশ্রণ। তিনি কবিতায় যদিও নীতিশিক্ষা দেননি, কিন্তু তাঁর কবিতার নৈতিক মান অত্যন্ত উঁচু। তিনি গজলের আবরণে মানুষের দোষত্রুটিকে তুলে ধরে সংশোধনের চেষ্ঠা করেন। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সকল কবির চিন্তাধারা থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি খুব বেশি স্বাধীন ছিলেন না, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট চিন্তাধারার তোয়াক্কাও

করতেন না। পূর্ববর্তী কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি নিজস্ব চিন্তা ও গীতিময়তাকে বিসর্জন দেননি। তাঁর কবিতা স্বত:স্ফূর্ততা ও উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ। উদ্দীপনা ও আকর্ষণ, প্রভাব ও নিষ্ঠা তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবন ও কবিতার মধ্যে এক নিখুঁত সামঞ্জস্য রয়েছে। তিনি সৌন্দর্য ও প্রেমকে সমান মর্যাদা দেন। তাঁর মতে, সৌন্দর্য ও ভালোবাসা উভয়ই একে অপরের প্রতিচ্ছবি। জিগর গজলকে সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতায় নিয়ে গেছেন এবং এটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

ড. মুহাম্মদ হাসান জিগর সম্পর্কে বলেন :

> جگر مرادآبادی ان شعرا میں سے تھے جو جدید غزل کے آبرو تھے۔ جن شعرا نے غزل کو نئے زمانہ کے تقاضوں سے آشنا کیا اور اسے پھر سے مقبولیت بخشی ان میں حسرت موہانی، فانی اور اصغر کے ساتھ ساتھ جگر کا نام ضرور لیا جائیگا۔[২]

(জিগর মুরাদাবাদী ছিলেন আধুনিক গজলের অন্যতম দিকপাল কবিদের একজন। যে কবিরা গজলকে নতুন যুগের চাহিদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে পুনরায় জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হাসরাত মোহানি, ফানী এবং আসগরের পাশাপাশি জিগরের নামও অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।)

دائرۃ المعارف-এ জিগর সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> جگر مرادآبادی اردو شاعری کے چمکتے ستاروں میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ ان کی شاعری ان کی رنگارنگ شخصیت، رنگ تغزل اور نغمہ و ترنم کی آمیزش کا نتیجہ ہے جس نے انھیں اپنے زمانے بے حد مقبول اور ہر دلعزیز بنا دیا تھا۔[৩]

(জিগর মোরাদাবাদীকে উর্দু কবিতার অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ তাঁর কবিতা তাঁর বর্ণময় ব্যক্তিত্বের ফল; রঙিন গদ্য, গান এবং ছড়ার এক সংমিশ্রণ, যা তাঁকে তাঁর সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রিয় করে তুলেছিল।)

সাহিত্য সমালোচক আলে আহমদ সুরুর বলেন :

> جگر ایک رومانی شاعر ہیں۔ رومان کسی نہ کسی حقیقت کو ہی خوابوں میں پیش کرتا ہے۔ جگر کے یہاں بھی خواب اور حقیقت کی دھوپ چھاؤں نظر آتی ہے۔[৪]

(জিগর একজন রোমান্টিক কবি। রোমান্স স্বপ্নের মাঝে এক বাস্তবতা তুলে ধরে। এখানেও জিগর স্বপ্ন ও বাস্তবতার রোদ-ছায়া দেখেন।)

জিগার মুরাদাবাদীর উল্লেখযোগ্য রচনাবলি হলো - *দাগ-এ-জিগার* (১৯২৮), *শো'লা-এ-তুর* (১৯৩২), *আতিশ-এ-গুল* (১৯৫৪) ও *দিওয়ান-এ-জিগার* ইত্যাদি। জিগার তাঁর কাব্যগ্রন্থ *আতিশ-এ-গুল* এর জন্য ১৯৫৮ সালে 'সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন। উর্দু কাব্যকলায় বিশেষ অবদানের জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে তিনি 'পদ্মভূষণ' খেতাব লাভ করেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে।

জিগরের গজলের নমুনা–

محبت میں یہ کیا مقام آ رہے ہیں

کہ منزل پہ ہیں اور چلے جا رہے ہیں

یہ کہہ کہہ کے ہم دل کو بہلا رہے ہیں

وہ اب چل چکے ہیں وہ اب آ رہے ہیں

وہ از خود ہی نادم ہوئے جا رہے ہیں

خدا جانے کیا کیا خیال آ رہے ہیں

ہمارے ہی دل سے مزے ان کے پوچھو

وہ دھوکے جو دانستہ ہم کھا رہے ہیں"

ফিরাক গোরখপুরী

ফিরাক গোরখপুরী (১৮৯৬-১৯৮২) একজন ভারতীয় কবি, লেখক ও সমালোচক। তাঁর প্রকৃত নাম রঘুপতি সহায়। ফয়েজের সমকালে জন্ম নেয়া একজন প্রতিশ্রুতিশীল কবি। আজীজ নাবীল ফিরাকের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

> فراق گورکھپوری تخلیقی جوہر سے مزین ایک عظیم شاعر، اصولوں اور روایتوں کے تابعدار، ایک ذہین نقاد، دنیاوی علوم سے آشنا، وراک مفکر اور عالمی ادب سے باخبر اور اعلی درجے کے مترجم ہونے کے ساتھ ساتھ اردو کے سیکولر مزاج اور تہذیبی و ثقافتی اقدار کی ایک نمایاں علامت اور اہم استعارہ تھے۔[৬]
>
> (ফিরাক গোরখপুরী ছিলেন সৃজনশীল সত্তায় সজ্জিত এক মহান কবি, নীতি ও ঐতিহ্যের অনুসারী, জাগতিক বিজ্ঞানে পারদর্শী এক বুদ্ধিমান সমালোচক, গভীর চিন্তাবিদ, বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে সচেতন এবং একজন উচ্চমানের অনুবাদক। তিনি উর্দু ভাষার ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা এবং সভ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের এক বিশিষ্ট প্রতীক ও গুরুত্বপূর্ণ রূপকও ছিলেন।)

ফিরাক ১৮৯৬ সালের ২৮ আগস্ট গোরখপুর জেলার বানওয়ারপার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মুন্সি গোরখ প্রসাদ। তিনিও একজন কবি ছিলেন। তিনি ১৯১৩ সালে গোরখপুর জুবিলী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯১৫ সালে এলাহাবাদ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। এরপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৮ সালে বিএ এবং ১৯৩০ সালে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ করেন। এমএ-তে তাঁর বিষয় ছিল ইংরেজি সাহিত্য।

১৯১৭ সালে ফিরাক প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস (PCS)এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (ICS)এর জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিনি সরকারী চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন । অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিনি ১৮ মাস কারারুদ্ধও ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখানেই তিনি তাঁর বেশিরভাগ উর্দু কবিতা রচনা করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে গবেষণা অধ্যাপক এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও কর্তৃক প্রযোজনা ইমেরিটাম পদে নিযুক্ত হন।

সাহিত্যের প্রতি অপরিসীম আকর্ষণ থেকেই ফিরাক অল্প বয়সেই উর্দু কবিতায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে আল্লামা ইকবাল, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, কাইফি আজমী এবং সাহির লুধিয়ানবীর মতো বিখ্যাত উর্দু কবিরা থাকলেও তিনি তাঁর জায়গা করে নিয়েছেন।

ফিরাক গোরখপুরী গজল, নজম, রুবাঈ ও কিত'আ সহ সকল ছন্দোবদ্ধ রীতিতে কবিতা লিখেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা *গুল-এ-নাগমা*। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাবলির মধ্যে রয়েছে–*গুল-এ-রানা*, *মশাল*, *সরগম* ইত্যাদি। ফিরাক গোরখপুরী ৮৫ বছর বয়সে ১৯৮২ সালের ৩রা মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

ফিরাক গোরখপুরী তার শ্রেষ্ঠ রচনা *গুল-এ-নাগমা* -এর জন্য ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার '*জ্ঞানপীঠ পুরস্কার*' এবং ১৯৬০ সালে 'উর্দু সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন। এছাড়াও তিনি 'পদ্মভূষণ পুরস্কার' , 'গালিব একাডেমি পুরস্কার' , 'সাহিত্য একাডেমি ফেলোশিপ' লাভ করেন।[৭]

সাহিত্য সমালোচক আলে আহমদ সুরুর বলেন :

> فراق اس دور کے صف اول کے شعرا میں سے تھے۔ انہوں نے خاصی عمر پائی اور شاعری اور تنقید میں ایسا گراں قدر سرمایہ چھوڑا ہے کہ اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔[৮]

(ফিরাক ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং কবিতা ও সমালোচনায় এমন মূল্যবান উত্তরাধিকার রেখে গেছেন যে তাঁকে কখনো ভোলা যাবে না।)

ফিরাক গোরখপুরী'র কবিতার নমুনা :

دیتے ہیں جام شہادت مجھے معلوم نہ تھا — ہے یہ آئین محبت مجھے معلوم نہ تھا

مطلب چشم مروت مجھے معلوم نہ تھا — تجھ کو مجھ سے تھی شکایت مجھے معلوم نہ تھا

چشم خاموش کی بابت مجھے معلوم نہ تھا — یہ بھی ہے حرف و حکایت مجھے معلوم نہ تھا

عشق بس میں ہے مشیت کے عقیدہ تھا مرا — اس کے بس میں ہے مشیت مجھے معلوم نہ تھا

ہفت خواں جس نے کئے طے سر راہ تسلیم — ٹوٹ جاتی ہے وہ ہمت مجھے معلوم نہ تھا

آج ہر قطرۂ مے بن گیا اک چنگاری تھی — یہ ساقی کی شرارت مجھے معلوم نہ تھا[৯]

জোশ মালিহাবাদী

জোশ মালিহাবাদী (১৮৯৮-১৯৮২) উর্দু সাহিত্যের 'বিপ্লবী কবি' হিসেবে খ্যাত। তিনি ছিলেন নিপীড়িত মানবতার সোচ্চার কণ্ঠস্বর ও শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ গড়ার স্বপ্নদ্রষ্টা। গরিব ও মেহনতি মানুষের উপর পুঁজিবাদীদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল সর্বদা প্রতিবাদী। তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে সমাজে আশা ও ভালোবাসার বার্তা ছড়িয়েছেন।

জোশের প্রকৃত নাম শাবীর হাসান খান। প্রথম দিকে তাঁর কাব্যনাম ছিল শাবীর, পরবর্তীতে জোশ নাম ব্যবহার করেন। ৫ ডিসেম্বর ১৮৯৮ সালে লখনৌর মালিহাবাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আফ্রিদি পশতুন বংশোদ্ভূত উর্দুভাষী মুসলিম পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা বাশীর আহমদ খান বাশীরও একজন কবি ছিলেন। তাঁর কালাম-এ-বাশীর নামে একখানা কাব্যগ্রন্থ আছে। জোশের উপাধি ছিল বিপ্লবী কবি। কারো কাছে যৌবনের কবি।

জোশ জুবিলী হাইস্কুল (লখনৌ), সেন্ট পিটার্স কলেজ (আগ্রা), আলীগড় কলেজ প্রভৃতি নামকরা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু পিতার অকালমৃত্যুর (১৯১৬) কারণে তিনি আশানুরূপ শিক্ষা অর্জন করতে পারেননি। ১৯২৪ হতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি হায়দরাবাদ উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুবাদ বিভাগে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করেন। কিছুদিন পর সেখান থেকে দিল্লি গমন করে 'কলীম' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। পত্রিকাটি বেশি দিন না চালু থাকলেও এই স্বল্পকালীন সম্পাদনার মধ্য দিয়াই তাঁর কবি-প্রতিভা ও সাহিত্য-রসজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রমাণ সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়। দেশভাগের পর তিনি সরকারি পত্রিকা 'আজকাল'-এর প্রধান সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে তিনি পাকিস্তানে চলে যান এবং করাচিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৮২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি করাচিতে ইন্তেকাল করেন।[১০]

বাল্যকালেই জোশের প্রতিভা ও ধীশক্তির বিকাশ লক্ষিত হয়। পরবর্তীতে এটি কাব্যশক্তিতে রূপান্তর লাভ করে। জোশ মাত্র নয় বছর থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় অসংখ্য গজল, নজম, দোহা, রুবাঈয়াত ও অন্যান্য কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রুহ-এ-আদব* ১৯২১ সালে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ছাড়াও তাঁর আরও বেশ কিছু কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। যেমন- *নকশ-ও-নিগার*, *শো'লা-ও-শবনম*, *হর্ফ-ও-হিকায়েত*, *জুনুন-ও-হিকমত*, *ফিকর-ও-নিশাত* এবং *সম্বল-ও-সলাসিল*।

প্রফেসর রিয়াজুর রহমান শিরওয়ানী বলেন :

> جوش نے اردو شاعری کو ایک نئی لے اور نیا آہنگ عطا کیا ہے۔ انہیں زبان پر جو قدرت حاصل ہے اور ان کے لہجے میں جو تازگی اور مردانگی ہے، وہ اردو کے بہت کم شاعروں کے حصے میں آئی ہے۔[১১]

(জোশ উর্দু কবিতাকে এক নতুন আঙ্গিক ও নতুন ছন্দ দিয়েছেন। ভাষার ওপর তাঁর যে দখল এবং তাঁর বাচন ভঙ্গিতে যে সতেজতা ও পৌরুষ রয়েছে, তা খুব কম উর্দু কবির মধ্যেই দেখা যায়।)

খালীক আনজুম বলেন :

اردو کے عظیم شاعروں کی فہرست میں صرف چار نام آتے ہیں۔ میر، غالب، انیس اور اقبال۔ اس کے بعد دوسری فہرست بڑے شاعروں کی ہے۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام جوش ملیح آبادی کا ہے۔ اس بات کو ہم دوسرے لفظوں میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بیسویں صدی میں علامہ اقبال کے بعد دوسرے بڑے شاعر جوش ہیں۔ جوش انسان دوست ہیں، غریبوں کے ہمدرد ہیں، سامراج دشمن ہیں۔[১২]

(মহান উর্দু কবিদের তালিকায় মাত্র চারটি নাম রয়েছে। মীর, গালিব, আনিস এবং ইকবাল। এরপর দ্বিতীয় তালিকাটি মহান কবিদের। এই তালিকার প্রথম নামটি হলো জোশ মালিহাবাদী। অন্য কথায়, আমরা বলতে পারি যে আল্লামা ইকবালের পর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহান কবি হলেন জোশ। জোশ ছিলেন মানবদরদী, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সাম্রাজ্যবাদের শত্রু।)

জোশ মালিহাবাদী'র কবিতার নমুনা :

ہوشیار! اپنی متاعِ رہبری سے ہوشیار

اے جنوں نا آشنا پیری و شیب ہر زہ کار

اڑ گیا روئے نگار آسماں سے رنگ خواب

جھلملاتی شمع! رخصت ہو کہ ابھرا آفتاب

ہٹ، کہ اب سعی و عمل کی راہ میں آتا ہو نمیں

خلق واقف ہے کہ جب، آتا ہوں چھا جاتا ہو نمیں

اے قدامت! یہ کھلی ہے سامنے راہ فرار

بھاگ وہ آیا نئی تہذیب کا پروردگار!

کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب

میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب[১৩]

ইসমত চুগতাই

ইসমত চুগতাই (১৯১৫-১৯৯১) বিংশ শতাব্দীর উর্দু কথাসাহিত্যের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি একাধারে একজন উপন্যাসিক,ছোটগল্পকার ও নাট্যকার।তিনি মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীবাদ,মধ্যবিত্ত কৌলিন্য এবং শ্রেণিসংগ্রামের মতো বিষয়গুলো কবিতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর রচিত ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও চিত্রনাট্য উর্দু সাহিত্য ভান্ডারের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচ্য।

ইসমত চুগতাই ১৯১৫ সালের ২১শে আগস্ট উত্তর প্রদেশের বাদাউনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে জন্মেছিলেন। তাঁর বাবা মির্জা কাসিম বেগ চুগতাই একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন এবং মাতা নুসরাত খানম ছিলেন গৃহিণী। দশ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন নবম। তিনি আগ্রায় চতুর্থ শ্রেণি এবং আলিগড়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। অল্প বয়সেই তাঁর সব বোনের বিয়ে হয়ে যায়। তাঁর বাবা-মা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু ইসমতের জেদ এবং সাহসিকতার কাছে অবশেষে তাঁর বাবাকে নতি স্বীকার করতে হয়। তিনি তাকে আলিগড়ে দশম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। আলীগড় থেকে এফএ পাশ করার পর, তিনি লক্ষ্ণৌয়ের একটি আইটি কলেজে ভর্তি হন। আইটি কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করার পর তিনি লক্ষ্ণৌর বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি লক্ষ্ণৌ ছেড়ে বোম্বে চলে আসেন। এখানে তিনি স্কুল পরিদর্শক হিসেবে চাকরি করেন। বোম্বেতে এসে পূর্বপরিচিত শহীদ লতিফের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ইসমত চুগতাই ছোটগল্পের মাধ্যমে সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন। ১৯৩০-এর দশকে এগারো বা বারো বছর বয়সে লেখালেখি শুরু করেন। এ সময়ই তিনি প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর রচিত প্রথম গল্প *ফাসাদি* ১৯৩৯ সালে জনপ্রিয় উর্দু পত্রিকা 'সাকি'-তে প্রকাশিত হয়। একই বছরে রচিত তাঁর *কাফির*, *ধীত*, *খিদমতগার* এবং *বাচপন* -এর মতো গল্পগুলো সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ইসমত একজন বিশিষ্ট লেখিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে তাঁর ছোটগল্পের দুটি সংকলন *কালিয়াঁ* এবং *চুল্তি* নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথমদিকের গল্পগুলোর মধ্যে *গেন্দা*, *ছুঁইমুঁই* এবং *লিহাফ* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪২ সালে *লিহাফ* গল্পের মাধ্যমে সাহিত্য জগতে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এ গল্পটি প্রকাশের পর সমাজে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়। গল্পটিকে অশ্লীলতার অভিযোগে আদালত পর্যন্ত গড়াতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি এবং শেষ পর্যন্ত মামলায় জয়লাভ করেন। এই ঘটনা তাঁকে আরও বেশি পরিচিত করে তোলে।

ইসমতের স্বামী শহিদ লতিফ একজন চিত্র পরিচালক ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে ইসমত চলচ্চিত্রে জড়িয়ে পড়েন। *জিদ্দি* (১৯৪৮) ছবির মাধ্যমে চিত্রনাট্যকার হিসেবে ইসমতের চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে। এ সিনেমার পরিচালক শহিদ লতিফ ছিলেন। এই যুগলের হাত ধরে পঞ্চাশের দশক জুড়ে *আরজু* (১৯৫০), *দরওয়াজা* (১৯৫৪), *সোসাইটি* (১৯৫৫) *সোনে কি চিড়িয়া* (১৯৫৮) প্রভৃতি চলচ্চিত্র সৃষ্টি হয়। শেষোক্ত ছবিটিতে তিনি প্রযোজক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। পরিচালক হিসেবে প্রথম ছবি ছিল 'ফারেব' (১৯৫৩), যেটি তিনি লতিফের সাথে যৌথভাবে পরিচালনা করেছিলেন। চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া প্রযোজিত এবং তাঁর ও লতিফের পরিচালিত *জওয়াব আয়েগা* (১৯৬৮) ছবিটি খুব সমাদৃত হয়েছিল। তবে চলচ্চিত্রে ইসমতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো তাঁর একটি ছোটগল্পের আলোকে তৈরি যুগান্তকারী চলচ্চিত্র *গরম হাওয়া* (১৯৭৩), যা দেশভাগের ভয়াবহতা নিয়ে নির্মিত হয়েছিল। সত্তরের দশকে তিনি অমর কুমার পরিচালিত *বরখা বাহার* (১৯৭৩) ও *মেহফিল* (১৯৭৮) এবং শ্যাম বেনেগালের ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে নির্মিত মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র *জুনুন* (১৯৭৯)-এর জন্য সংলাপ রচনা করেন। এই শেষোক্ত চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে চুগতাই অভিনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি *মাই ড্রিমস* (১৯৭৫) শিরোনামে একটি আত্মজীবনীমূলক তথ্যচিত্রও পরিচালনা করেন।

সাহিত্যে ও চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ইসমত বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে ইসমত চুগতাই *গরম হাওয়া* চলচ্চিত্রের জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে "পদ্মশ্রী" পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়াও তিনি 'গালিব পুরস্কার' এবং 'ইকবাল সম্মাননা' পুরস্কারও লাভ করেন। আলঝেইমার রোগে ১৯৯১ সালেন ২৪ অক্টোবর ইসমত মুম্বাইতে মৃত্যুবরণ করেন।[১৪]

ইসমতের রচনায় নারীর দু:খ, অবদমন, যৌনতা, সামাজিক বৈষম্য ও কুসংস্কারের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। তিনি সাহিত্যে এমন সব বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন, যা সে সময় খুব কম লেখক সাহস করে প্রকাশ করতেন।

জনপ্রিয় উর্দু অনলাইন সাইট 'রিখতা' (Rekhta) - তে ইসমত চুগতাই সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> بدنامی اور شہرت، تنازعات اور مقبولیت کے اعتبار سے وہ اردو کے کسی بھی افسانہ نگار سے آگے، منفرد اور ممتاز ہیں۔ ان کی شخصیت اور ان کی تحریر ایک دوسرے کا تکملہ ہے اور جو بغاوت، سرکشی، درد مندی بے ساختگی، بے تکلفی، الھڑپن اور شگفتہ اکھڑپن سے عبارت ہے۔ انھوں نے اپنے چونکا دینے والے موضوعات، حقیقت پسندانہ طرز نگارش اور اپنے منفرد اسلوب کی بنا پر اردو افسانہ اور ناول نگاری کی تاریخ میں اپنے لئے امتیازی جگہ بنائی۔ انسانی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات ان کے افسانوں کا موضوع ہیں لیکن وہ ان واقعات کو اس چابکدستی اور فنکاری سے پیش کرتی ہیں کہ روز مرہ کی زندگی کی مکمل اور جیتی جاگی تصویر نگاہوں کے سامنے آجاتی ہے۔ انھوں نے اپنے کرداروں کے ذریعہ زندگی کی برائیوں کو باہر نکال پھینکنے اور اسے حسن، مسرت اور سکون کا پیکر بنانے کی کوشش کی۔[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

(খ্যাতি ও কুখ্যাতি, বিতর্ক ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে তিনি অন্য যেকোনো উর্দু ঔপন্যাসিকের চেয়ে এগিয়ে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও লেখনী একে অপরের পরিপূরক এবং এতে রয়েছে বিদ্রোহ, সহানুভূতি, সারল্য ও আন্তরিকতা। তাঁর চমকপ্রদ বিষয়বস্তু এবং বাস্তববাদী লেখনীর জন্য তিনি উর্দু কথাসাহিত্য ও উপন্যাস জগতে নিজের একটি স্বতন্ত্র স্থান তৈরি করেছেন। মানবজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু, কিন্তু তিনি এই ঘটনাগুলোকে এমন নিপুণতা ও শৈল্পিকতার সাথে উপস্থাপন করেন যে দৈনন্দিন জীবনের একটি সম্পূর্ণ ও জীবন্ত চিত্র ফুটে ওঠে। তাঁর চরিত্রগুলোর মাধ্যমে তিনি সমাজের অশুভ শক্তিকে দূর করে তাদেরকে সৌন্দর্য, সুখ ও শান্তির প্রতীকে পরিণত করার চেষ্টা করেন।)

মুখতাছার তারিখ-এ-আদাব-এ-উর্দু গ্রন্থে ড. এজায হোসাইন বলেন :

عصمت نے اپنے افسانوں کا مرکز مسلمان متوسط گھرانوں کو بنایا۔ لیکن اس محدود دائرے میں رہ کر بھی انھوں نے زندگی کا ایسا گہرا مشاہدہ کیا ہے کہ جو آج کل کی لڑکیوں اور عورتوں کے ذہنی خلفشار کو ابھار کر سامنے لا دیتا ہے۔ ان افسانوں میں ان بے زبان لڑکیوں کے بھی مسائل ہیں جو ازدواجی زندگی کی چکی میں پستے پستے خاموشی سے دم توڑ دیتی ہیں۔[১৮]

(ইসমত তাঁর গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকে। কিন্তু এই সীমিত গণ্ডির মধ্যেও তিনি জীবনকে এমন গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন, যা আজকের তরুণী ও নারীদের মানসিক অস্থিরতাকে সামনে নিয়ে আসে। এই গল্পগুলোতে সেইসব নির্বাক মেয়েদের সমস্যার কথাও বলা হয়েছে, যারা বিবাহিত জীবনের যাঁতাকলে নীরবে প্রাণ হারায়।)

ইসমত চুগতাইয়ের রচনার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল :

کون نہیں جانتا کہ چوری بری ہوتی ہے۔ پر بعض چوریاں ایسی مزیدار ہوتی ہیں کہ نیت بھٹک ہی جاتی ہے۔ پوشیدہ خطوط، پرانی کہتاہیں اور کاپیاں اور ہزاروں ڈھکی چھپی چیزیں جنہیں لوگ کپڑوں کی تہوں کے نیچے چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہاتھ لگ جائیں تو پھر کیا کہئے :۔

موسم غیر معمولی گرم اور غم آلود اور یوں ہی چھوٹی آپا کے لیکچروں سے اکتا کر میں پرانی کتابیں ٹٹولنے لگی۔

چھوٹی آپا کتنی ہوشیار تھیں۔ پروفیسروں نے کسی قدر اچھی رائے ان کے بارے میں دی تھی۔۔۔!

مجھے کچھ شک ہونے لگا۔ پچھلے مہینے تو پرنسپل نے کچھ مشتبہ سا جملہ میرے کارڈ پر لکھ دیا تھا جسے دیکھ کر چھوٹی آپا نے لیکچر یلا نے شروع کر دیئے!

وحشی ہو گئی ہو۔۔![১৯]

Dhaka University Institutional Repository

সাদাত হাসান মান্টো

সাদাত হাসান মান্টো (১৯১২-১৯৫৫) উর্দু সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী। উপন্যাসিক, সাংবাদিক, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, চলচ্চিত্রকার, অনুবাদক প্রভৃতি গুণগুলো তাঁর ব্যক্তিত্বকে করেছিল সুষমামণ্ডিত। তাকে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার হিসেবে গণ্য করা হয়।

মান্টো ১৯১২ সালের ১১ই মে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খাজা গোলাম হাসান একজন বিচারক এবং মাতা সরদার বেগম গৃহিণী ছিলেন। তিনি অমৃতসরের একটি মুসলিম হাইস্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের জন্য তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে (এএমইউ) ভর্তি হন। কিন্তু যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার কারনে মাত্র ৯ মাস পর তার পড়াশোনা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এই সময়টা তিনি কাশ্মীরে কাটান। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে কোনো এক সময়ে মান্টো সাফিয়া দীনকে বিয়ে করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি সাংবাদিকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এ সময় তিনি মাসিক ৪০ টাকা বেতনে উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পারেছ'-এ যোগ দেন। এরপর তিনি সাপ্তাহিক 'মুসাব্বির' পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৪০ সালে দিল্লীর অল ইন্ডিয়া রেডিওতে যোগদান করেন। অবশেষে তিনি তার প্রিয় শহর বোম্বেতেই স্থায়ী হন।

মান্টো এক উত্তাল সময়ের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর বেড়ে ওঠার দিনগুলোতে ভারত রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভের জন্য সংগ্রাম করছিল । ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তাকে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে ভারত ছাড়তে হয়েছিল। সে সময় তিনি ভারতের বোম্বে থেকে পাকিস্তানের লাহোরে চলে আসেন। এ শহরেই উর্দু সাহিত্যের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র ১৮ জানুয়ারি ১৯৫৫ সালে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[১৮]

মান্টো পাঁচটি সংকলনে প্রায় ১০০টি বেতার নাটক রচনা করেছিলেন, যেগুলোর বেশিরভাগই অল ইন্ডিয়া রেডিওতে কর্মরত থাকাকালীন লেখা। তাঁর গল্পের মতোই এগুলোও তিক্ত বাস্তবতায় পরিপূর্ণ। তাঁর নাটকের সংকলনগুলির মধ্যে রয়েছে *মান্টো কে ড্রামায়ে*, *আও* , এবং *তিন আউরাতিঁ*।

মান্টো বোম্বে টকিজ, ফিল্মিস্তান এবং ইম্পেরিয়াল ফিল্ম কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। তিনি তাদের জন্য চিত্রনাট্যের কাজ করতেন। এ সকল কোম্পানি থেকে নির্মিত *শিকারী* (১৯৪৬), *চল চল রে নওজোয়ান* (১৯৪৪),

Dhaka University Institutional Repository

এবং *মির্জা গালিব* (১৯৫৪) প্রভৃতি জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য রচনা করেন মান্টো। পরবর্তীকালে তিনি চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের জীবনীর ওপর প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর বন্ধু ও অভিনেতা অশোক কুমার, নৃত্যশিল্পী ও চলচ্চিত্র তারকা সিতারা দেবী, এবং অভিনেত্রী নার্গিস।

মান্টোর প্রথম গল্পগ্রন্থ *আতিশ পারে* ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মোট ৮টি গল্প রয়েছে। প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থটি তিনি তাঁর পিতাকে উৎসর্গ করেন। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয় মান্টোর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *মান্টো কে আফসানে*। মান্টোর বিখ্যাত ছোটগল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে– বু (১৯৪০), *কালি সেলোয়ার* (১৯৪১), *খোল দো* (১৯৪৮), *ঠান্ডা গোস্ত* (১৯৫১), *টোবা টেক সিং* (১৯৫৫) ইত্যাদি।

সাদাত হাসান মান্টো শুধু উপমহাদেশের উর্দু বা হিন্দি সাহিত্যে নয় বরং বিশ্বসাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। ২০০৫ সালে মান্টোর মৃত্যুর ৫০তম বার্ষিকীতে পাকিস্তান সরকার তাঁর প্রতিকৃতি সম্বলিত একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ২০১২ সালে তাঁকে মরণোত্তর পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'নিশান-ই-ইমতিয়াজ' প্রদান করা হয়।

মুখতাছার তারিখ-এ-আদাব-এ-উর্দু গ্রন্থে সাদাত হাসান মান্টো সম্পর্কে ড. এজায হোসাইন বলেন :

> منٹو کے اسلوب بیان میں روانی ہے، سادگی ہے۔ موضوع وہ ایسا لیتے ہیں کہ ذہنوں اور خصوصاً کچے ذہنوں پر اُن کے کردار اور پیش کیے ہوئے واقعات چھائے رہتے ہیں۔ ان کے تھیم آسانی سے بھلائے نہیں جاسکتے۔ اور جملوں کی کاٹ قیامت کی ہوتی ہے۔ ان کا نفسیات کا مطالعہ بھی وسیع ہے، متحرک کرنے والے جذبات یا متحرک ہو جانے والے اثرات کو بڑی اچھی طرح پیش کرتے ہیں۔[১৯]

(মান্টোর বর্ণনার ধরণ সাবলীল ও সরল। তিনি বিষয়বস্তু এমনভাবে তুলে ধরেন যে, তাঁর চরিত্র ও উপস্থাপিত ঘটনাগুলো মন, বিশেষ করে অপরিণত মনকে, আচ্ছন্ন করে রাখে। তাঁর বিষয়বস্তু সহজে ভোলা যায় না। আর বাক্যগুলোর তীক্ষ্ণতা যেন প্রলয়ঙ্করী। মনোবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর জ্ঞানও ব্যাপক; তিনি চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করা আবেগ বা তার প্রভাবগুলো অত্যন্ত ভালোভাবে উপস্থাপন করেন।)

Dhaka University Institutional Repository

সাদাত হাসান মান্টোর রচনার নমুনা নিম্নে দেয়া হল :

وہ کرسی پر اس انداز سے اکیلا بیٹھا تھا جیسے شطرنج کا پٹا ہوا مہرہ لسباط سے بہت دور پڑا ہے، سامنے میز پر اس کی پرانی تصویر، چمک دار فریم میں جڑی رکھی تھی۔ حمید نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو سات برس تصویر اور اس کے درمیان تھان کی طرح کھلتے چلے گئے۔

ٹھیک سات برس پہلے برسات کے ان ہی دنوں میں رات کو وہ ریلوے اس وقت ریسٹوران میں ملک عبدالرحمن کے ساتھ بیٹھا تھا۔۔۔۔ اس وقت کے حمید اور اس وقت کے حمید میں کتنا فرق تھا۔۔۔۔۔۔ کتنا فرق تھا، حمید نے یہ فرق اس شدت سے محسوس کیا کہ اُسے اپنی تصویر میں ایک ایسا آدمی نظر آیا جس سے ملے اس کو ایک زمانہ گذر گیا ہے۔[২০]

Dhaka University Institutional Repository

কৃষণ চন্দর

কৃষণ চন্দর (১৯১৪-১৯৭৭) উর্দু কথা সাহিত্যের এক অমর শিল্পি । তিনি বিংশ শতাব্দীর অত্যন্ত সৃষ্টিশীল একজন লেখক ছিলেন। উর্দু ও হিন্দি উভয় ভাষায় তিনি সমানতালে লিখে গেছেন। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র প্রভৃতি মাধ্যমে তিনি তাঁর মেধাকে প্রষ্ফুটিত করেছেন।

কৃষণ চন্দর জন্মেছিলেন ১৯১৪ সালের ২৩ নভেম্বর তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের পশ্চিম পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলার ওয়াজিরাবাদ নামক এক ছোট শহরে। তাঁর পুরো নাম কৃষণ চন্দর শর্মা। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি সবার বড় ছিলেন। তাঁর পিতা গৌরি শঙ্কর ছিলেন একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। পেশাগত কারনে তিনি পশ্চিম পাঞ্জাবের ওয়াজিরাবাদ থেকে কাশ্মীরের ভরতপুর নামক এক ছোট রাজ্যে চলে আসেন। এরপর সেখান থেকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পুঞ্চে চলে আসেন। এখানে তিনি পুঞ্চ মহারাজার ডাক্তার হিসাবে নিযুক্ত হন। পুঞ্চ শহরেই কৃষণের শৈশব কাটে। তিনি পড়াশোনা করেন পুঞ্চ ভিক্টোরিয়া জুবেলী হাইস্কুলে। পুঞ্চ হাইস্কুলের পাঠ শেষে করে তিনি লাহোরের ফার্মন খ্রিষ্টান (এফ সি) কলেজে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ভগৎ সিং-এর গদর পার্টিতে যোগ দেন এবং এর ফলে একবার তাঁকে দু'মাসের জন্য কারাবাসও করতে হয়েছিল। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৩৪ সালে লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এমএ এবং ১৯৩৭ সালে এলএলবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কৃষণ চন্দরের সাহিত্য সাধনার শুরু কলেজ জীবন থেকেই। এ সময়ই তাঁর প্রথম গল্প *য়র্কান* 'রিয়াসত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁর রম্যরচনা *হাওয়াই কিলা* তৎকালীন প্রগতিশীল পত্রিকা 'হুমায়ূঁ'-তে প্রকাশিত হলে রচনাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রশংসিত হয়। কিছুদিন পর ওই পত্রিকাতেই তাঁর গল্প 'ঝিলম মে নাও পর' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লেখক হিসাবে পরিচিতি পেয়ে যান।

কর্মসূত্রে প্রথম জীবনে তিনি লাহোর বেতার কেন্দ্রে এবং পরে দিল্লী বেতার কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কাশ্মীরী বাজারের একটি ছোট বাংলো হতে দিল্লী রেডিওর অনুষ্ঠান সম্প্রচার হত। কৃষণ চন্দর, সাদত হাসান মান্টো, উপেন্দ্রনাথ আশক্ - এঁরা তিনজন সেখানে কাজ করতেন। আর এঁদেরকে ঘিরেই দিল্লী রেডিও স্টেশন হয়ে উঠেছিল এক সাহিত্য-মজলিশ। আশরার উল হক মজাজ ছিলেন রেডিওর উর্দু ম্যাগাজিন 'আওয়াজ'-র সম্পাদক। তাদের সাথে যোগ দিতেন ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও চিরাগ হাসান হাসরত। এ মজলিশের মধ্যমণি ছিলেন কৃষণ।

১৯৪২ সালে সরকারি চাকুরি ছেড়ে কৃষণ পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতের সাথে তিনি সম্পৃক্ত হন। একে একে সিনেমার সংলাপ ও কাহিনী লিখতে থাকেন। যদিও এ কাজে তিনি ততটা সাফল্য পান নি। তাঁর গল্প অবলম্বনে *মা ভূমি*, *রাম ভরস*, *মনচালি*, *দো ফুল*, *আন্দোলন* এবং *শরাফত* ইত্যাদি ছবি নির্মিত হয়। ১৯৪৩ সালের বাংলার ভয়াবহ মতন্তর নিয়ে রচিত কৃষণ চন্দরের গল্প '*অন্নদাতা*' অবলম্বনে বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা খাজা আহমদ আব্বাস ১৯৪৬ সালে নির্মাণ করেন '*ধরতি কে লাল*'। কৃষণ চন্দরের অনেক গল্পকে অবলম্বন করে চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট রচনা করেন যৌথভাবে খাজা আব্বাস এবং বিখ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্রগতিশীল লেখক সংঘ'। এ বছরই লেখক হিসাবে কৃষণ চন্দরের আবির্ভাব। লখনৌয়ে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মুন্সী প্রেমচন্দ, সাজ্জাদ জহির ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আল্লামা ইকবাল ও কাজী নজরুলের আশীর্বাদে ধন্য হয়েছিল এ সম্মেলন। এ সংঘের পতাকাতলে উর্দু ও হিন্দি যে সকল কবি-সাহিত্যিকরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃষণ চন্দরও ছিলেন।

কৃষণ চন্দরের প্রথম প্রকাশিত গল্প-সংকলন *তিলিসম্-এ-খেয়াল*। প্রথম উপন্যাস *শিকস্ত*, এটি রচনা শুরু হয় ১৯৪০ সালে। বস্তুত, প্রথম গল্প থেকেই কৃষণ চন্দরের মানবতাবাদী সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। এরপর তিনি একে একে অজস্র গল্প ও উপন্যাস লিখে উর্দু এবং হিন্দি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। উর্দু ও হিন্দি ভাষায় তাঁর ৩০টি ছোটগল্প সংকলন এবং ২০টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। সারা ভারতেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা ও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা ছাড়াও রুশ, জার্মান, ইংরেজি, চেক, হাঙ্গেরি, পোলিশ, চীন ও জাপানি ভাষায় তাঁর সাহিত্য অনূদিত হয়েছে।

কৃষণ চন্দরের গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে *'তিলিসম্-এ-খেয়াল'*, *'টুটে তারে'*, *'পুরানে খুদা'*, *'অন্নদাতা'*, *'তিন গুন্ডে'*, *'অজন্তা সে আগে'*, *'নয়ে আফসানে'*, *'মজাহিয়া আফসানে'*, *'মিস নৈনিতাল'*, *'কাশ্মীর কি কহানী'*, *'নয়ে গুলাম'*, *'কিতাব কা কফন'*, *'কালা সুরাজ'*, *'হম্ বহশী হ্যাঁয়'* ইত্যাদি উলেস্নখযোগ্য। তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে *'শিকাস্ত'*, *'যব খেত জাগে'*, *'গদ্দার'*, *'কাগজ কি নাও'*, *'কাগজ কি নাও'*, *'কার্নিওয়ালা'*, *'বাওন পাত্তে'*, *'আয়নে একেলে হ্যাঁয়'*, *'আধা রাস্তা'*, *'তুফান কি কালিয়াঁ'* প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিশুদের জন্য রচিত *'দাদর পুলকে বাচ্চে'*, *'লাল তাজ'*, *'উল্টা দরখ্ৎ'*, *'চিড়িয়া কি আলিফ লায়লা'* শিশু-সাহিত্যের সীমানা ছাড়িয়ে মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। এছাড়া রয়েছে তাঁর শৈশব স্মৃতিচারণমূলক রচনা *'ইয়াদোঁ কি চিনার'*। *'দরওয়াজা'* তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্য সংকলন। তাঁর রম্যরচনা সংকলনগুলির মধ্যে *'দেওতা আওর কিষাণ'*, *'নজারে'*, *'এক গাধে কি সারগুজাস্ত'* বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর রম্যরচনাগুলি একাধারে হাস্য-কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সমুজ্জ্বল। তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো সেগুলি পাঠকের চোখের সামনে ঝলসিয়ে ওঠে। উর্দু সাহিত্যের এ অমর শিল্পি ১৯৭৭ সালের ৮মার্চ মুম্বাইতে মৃত্যুবরণ করেন।[২১]

সাহিত্য ও শিল্পে অনন্য অবদানের জন্য ১৯৬৯ সালে তাঁকে ভারতের অন্যতম সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'পদ্মভূষণ' দেওয়া হয়।তাঁর সাহিত্যকর্ম বিশ্বের ১৬টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ২০১৭ সালে ভারত সরকার তাঁর স্মরণে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

কাজী উবায়দুর রহমান হাশেমী বলেন :

> کرشن چندر ہمارے ان ادیبوں میں ہیں جنہوں نے آزادی سے قبل اور بعد کے ہندوستان کو نہ صرف دیکھا بلکہ بڑی دلسوزی اور ہمدردی کے ساتھ اس کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی مسائل پر غور بھی کیا۔ وہ صحیح معنوں میں ترقی پسند نظریے اور فکر کے ترجمان تھے جن کے افسانے اور ناولوں پر مبنی فلمیں بھی بنیں اور ان کی تحریروں کو عوامی شہرت اور مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ وہ ان معدودے چند ادیبوں میں تھے جنہوں نے کشمیری عوام کی زندگی اور دکھ درد کو بڑے خلوص اور دردمندی کے ساتھ محسوس کیا اور اس جنت ارضی میں جہنم کے گرم جھونکے محسوس کیے۔[২২]

Dhaka University Institutional Repository

(কৃষণ চন্দর সেইসব লেখকদের মধ্যে একজন, যিনি শুধু স্বাধীনতার আগে ও পরের ভারতকেই দেখেননি, বরং এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলোকেও গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনার সাথে চিন্তা করেছেন। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল আদর্শ ও চিন্তাধারার এক প্রকৃত মুখপাত্র, যাঁর গল্প ও উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে এবং তাঁর লেখাগুলো গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তিনি সেই অল্প কয়েকজন লেখকের মধ্যে একজন, যিনি কাশ্মীরি জনগণের জীবন ও দু:খ-কষ্টকে গভীর আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সাথে অনুভব করেছেন এবং এই পার্থিব স্বর্গে নরকের উত্তপ্ত বাতাস উপলব্ধি করেছেন।)

হাসান জিয়া বলেন :

کرشن چندر نے ادب کو افسانے، ناول، ڈرامے، رپورتاژ مختلف اصناف میں بے شمار تحریریں دیں۔ رومانیت سے رومانی حقیقت نگاری تک، فکر و فن کے اس سفر نے فکشن کی دنیا کو، اس کے بے شمار قارئین کو اپنے سحر میں رکھا اور خیال و خواب اور تخیل پسندی کے ساتھ ساتھ غور و فکر کا سامان بھی فراہم کیا، انسان دوستی کا جذبہ پیدا کیا اور اپنے گرد و پیش کی محرومیوں اور مایوسیوں کے تئیں ہمیں زیادہ حساس بنایا۔ کرشن چندر نے اپنی تحریروں کو صرف اپنی رومانی فکر اور اپنے تخیل کی بلند پروازی کے اظہار تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ سوئے ہوئے انسانی شعور کو بیدار کرنے کا کام بھی بخوبی انجام دیا۔[২৩]

(কৃষণ চন্দর কথাসাহিত্য, উপন্যাস, নাটক এবং প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন ধারার সাহিত্যে অগণিত রচনার অবদান রেখেছেন। রোমান্টিকতাবাদ থেকে রোমান্টিক বাস্তববাদ পর্যন্ত, চিন্তা ও শিল্পের এই যাত্রা কথাসাহিত্যের জগৎ এবং এর অগণিত পাঠককে মুগ্ধ করেছিল, কল্পনার পাশাপাশি চিন্তা ও মননের খোরাক জুগিয়েছিল, মানবতাবোধ জাগিয়ে তুলেছিল এবং আমাদের চারপাশের মানুষের বঞ্চনা ও হতাশার প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তুলেছিল। কৃষণ চন্দর তাঁর লেখাকে কেবল তাঁর রোমান্টিক চিন্তাভাবনা এবং কল্পনার উচ্চাঙ্গের বিচরণের প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং সুপ্ত মানব চেতনাকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।)

কৃষণ চন্দরের রচনার একটি নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

براڈکاسٹنگ کی بے ہودگیوں کا ذکر کرتے ہوئے مجھے کچھ تامل محسوس ہوتا ہے۔ میرے خیال میں براڈکاسٹنگ کی بے ہودگیوں کا اعتراف ہی خود سب سے بڑی بیہودگی ہے۔ بہر حال اب تو یہ فتنہ جگایا جا چکا۔ اب اس کے متعلق کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑے گا۔ چاہے آپ اسے منظور ہے گزارش احوال واقعی سمجھتے یا کچھ اور۔ اب یہ داستان غم آپ سے کہنی پڑے گی۔

براڈکاسٹنگ میں دو چیزیں کام کرتی ہیں، مشین اور آدمی، اکثر اوقات ان دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایک عامی ہونے کی وجہ سے میرے ذہن میں ان دونوں اشیاء کا وجود الگ الگ ہے۔ براڈکاسٹنگ کی بیہودگیاٹ ہوتی رہتی ہیں، انہیں دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے براڈکاسٹنگ کی بیہودگیوں کو بہ آسانی دو قسموں میں الگ کیا جا سکتا ہے۔[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

এহসান দানিশ

এহসান দানিশ (১৯১৪-১৯৮২) পাকিস্তানের বিখ্যাত কবি ও লেখক। ফয়েজের সমসাময়িক কবি এহসান উর্দু সাহিত্যে "শায়ের-এ-মজদুর" নামে পরিচিত।

এহসান দানিশের আসল নাম ছিল কাজী এহসানুল হক । এহসান ছিল তাঁর ছদ্মনাম। ১৯১৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের কান্ধলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী দানিশ আলী মিরাটের বাসিন্দা ছিলেন কিন্তু পরে কান্ধলায় এসে স্থায়ী হন। দারিদ্রতার জন্য এহসান পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে পারেননি। তিনি আরবী ও ফার্সি ভাষা নিজে নিজে শিখেছিলেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি শ্রমিকের কাজ বেছে নেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলে তিনি ভারত ছেড়ে পরিবারে সাথে পাকিস্তানের লাহোরে চলে আসেন। এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

কবিতা লেখায় এহসান বিশেষ পান্ডিত্য দেখান। রোমান্টিক কবিতা দিয়ে তাঁর কাব্য চর্চা শুরু হলেও তিনি মূলত বিপ্লবী কবিতা লিখতেন। তাকে জোশ মালিহাবাদীর সাথে তুলনা করা হয়। কবিতায় তিনি সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতি তুলে ধরেছেন। তাঁর কাব্যশৈলী সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। রোমান্টিক এবং বিপ্লবী কবিতার জন্য তিনি উর্দু সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন।

এহসান দানিশ ৮০ টির উপরে বই লিখেছেন। যার মধ্যে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে কবিতা, প্রবন্ধ, ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, জীবনীসাহিত্য ও অনুবাদ গ্রন্থ। তাঁর জীবনীগ্রন্থ– *জাহান-এ-দানিশ* যা ১৯৭৩ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।এই গ্রন্থের জন্য তিনি 'আদমজি সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাবলির মধ্যে রয়েছে- *নওয়া কারগারন*, *চিরাগ আতিশ-এ-খামোস*, *জাদা নাউ*, *জাখুম মারহাম*, *মাকামত*, *গোরিস্তান*, *শিরাজাহ*, *লুগাতুল-ইসলাহ*, *দস্তুর-এ-উর্দু*, *খিজির-এ-উরুজ*, *রোশনি এবং টিবাবা* প্রভৃতি। ১৯৭৮ সালে তিনি 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮২ সালের ২২মার্চ উর্দু সাহিত্যের এই গুণধর কবি মৃত্যুবরণ করেন।[২৫]

دائرۃ المعارف-এ এহসান দানিশ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> ان کی (احسان دانش) شاعری قدرت کی اور اس ماحول کی عکاسی کرتی ہے جس میں انھوں نے مزدوری کی۔ چونکہ وہ خود مزدور تھے اس وجہ سے مزدور اور کمزور طبقہ کے لوگوں کے درد کو محسوس کرتے تھے۔[২৬]

> (তাঁর [এহসান দানিশ] কবিতায় প্রকৃতি এবং তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের প্রতিফলন ঘটে। যেহেতু তিনি নিজেও একজন শ্রমিক ছিলেন, তাই তিনি শ্রমিকদের এবং সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের কষ্ট অনুভব করতেন।)

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয় উর্দু অনলাইন সাইট 'রিখতা' (Rekhta) - তে এহসান দানিশ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

احسان دانش ایک ترقی پسند شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ ترقی پسند حضرات انہیں اپنے زمرے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل احسان دانش بھی ویسے ہی رومانی تصورات رکھتے ہیں جو ترقی پسندوں کی روش رہی ہے۔ چانچہ ان کا ذہن بھی انقلابی ہے۔ طبقاتی کشمکش سے بیزار، مروجہ نظام حکومت سے متنفر اور عدم مساوات سے دکھی نظر آتے ہیں۔ احسان برابری اور بھائی چارگی کی تلقین کرتے ہیں۔ گویا ان کی نگاہ میں شعر وادب زندگی سے جوجھنے کا نام ہے لیکن ان تمام امور کے باوجود احسان شاعری کی موسیقی سے ہمکنار رکھنے میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے یہاں بے ساختگی کے ساتھ ساتھ نغمگی اور ترنم کا احساس ہوتا ہے۔[২৭]

(এহসান দানিশকে একজন প্রগতিশীল কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রগতিশীলরা তাকে নিজেদের গণ্ডির মধ্যেই রাখতে চান। প্রকৃতপক্ষে, প্রগতিশীলদের যে রোমান্টিক চিন্তাধারা, এহসান দানিশেরও সেই একই চিন্তাধারা রয়েছে। তার মনও বিপ্লবী। শ্রেণি-সংঘাত, প্রচলিত শাসনব্যবস্থা এবং বৈষম্যের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ বলে মনে হয়। এহসান সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পক্ষে কথা বলেন। যেন তার চোখে কবিতা ও সাহিত্য জীবনের সংগ্রামের নাম, কিন্তু এতকিছুর পরেও এহসান কবিতাকে সুরের সাথে মিলিয়ে রাখতে আনন্দ পান। তাই তার কবিতায় স্বত:স্ফূর্ততার পাশাপাশি সুর ও ছন্দের এক আবহ রয়েছে।)

এহসান দানিশের কবিতার নমুনা :

یہ تو نہیں کہ تم سے محبت نہیں مجھے

اتنا ضرور ہے کہ شکایت نہیں مجھے

میں ہوں کہ اشتیاق میں سر تا قدم نظر

وہ ہیں کہ اک نظر کی اجازت نہیں مجھے

آزادئ گناہ کی حسرت کے ساتھ ساتھ

آزادئ خیال کی جرأت نہیں مجھے

دو بھر ہے گرچہ جور عزیزاں سے زندگی

لیکن خدا گواہ شکایت نہیں مجھے[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

রাজিন্দর সিং বেদী

রাজিন্দর সিং বেদী (১৯১৫-১৯৮৪) একজন ভারতীয় উর্দু লেখক ও নাট্যকার। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের অন্যতম একজন পথিকৃত। তিনি ছিলেন একজন আদর্শবাদী কবি। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর আদর্শকে লালন করে গেছেন।

বেদী ১৯১৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ছিল হীরা সিং আর মার নাম শিবা দেবী। বাবা ছিলেন একজন শিখ আর মা ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের। তাঁর বাবা পোষ্টঅফিসের একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনি লাহোর ক্যান্টনমেন্ট স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি এসবিবিএস খালসা স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৩১ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ম্যাট্রিকুলেশনের পর তিনি লাহোরের ডিএভি কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়ার পরেই তাঁর যক্ষ্মারোগী মা মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর বাবা চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। বাবার অনুরোধে ১৯৩৩ সালে বেদীকে পোস্ট অফিসে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

বেদীর সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল খালসা কলেজে পড়াকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৩২ সালে। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় সতেরো বা আঠারো বছর। এই সময়ে তিনি ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। এর পাশাপাশি উর্দু ও পাঞ্জাবিতেও ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন। ছাত্রজীবনে তিনি মহসিন লাহোরী ছদ্মনামে লিখতেন। পোস্ট অফিসে চাকরির পাশাপাশি তিনি রেডিওর জন্যও লিখতেন। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'দানা ওয়া দাম' ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। এ সংকলনটি প্রকাশের পর তিনি সাহিত্য মহলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'গ্রহণ' ১৯৪২ সালেই প্রকাশিত হয়। তিনি লাহোর থেকে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পত্রিকা 'আদাব লতিফ'-এর সাম্মানিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই কাজের জন্য তিনি কোনো পারিশ্রমিক পেতেন না। ১৯৪৩ সালে ডাকঘরের চাকরি থেকে পদত্যাগ করে তিনি লাহোর রেডিও স্টেশনে চিত্রনাট্যকার হিসেবে যোগ দেন। এই চাকরিকালে তিনি রেডিওর জন্য বেশ কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁকে বর্ডার রেডিও স্টেশনে বদলি করা হয়। এক বছর কাজ করার পর তিনি পদত্যাগ করে লাহোরে চলে আসেন এবং মহেশ্বরী ফিল্ম কোম্পানিতে মাসে ছয়শ টাকা বেতনে চাকরি নেন। এরপর তিনি সঙ্গম পাবলিশার্স লিমিটেড নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই ছাপাখানা থেকে তাঁর রেডিও নাটকের সংকলন 'সেভেন গেমস' প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে বেদীকে লাহোর ছাড়তে হয়েছিল। তিনি কিছুদিন রূপার ও শিমলায় কাটান। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর

Dhaka University Institutional Repository

দেখা হয়, যিনি তাঁকে জম্মু রেডিও স্টেশনের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এখানে তাঁর বনিবনা না হওয়ায় তিনি বোম্বে চলে আসেন। বোম্বেতে ফেমাস পিকচার কোম্পানিতে মাসিক ১০০০ টাকায় চাকুরি নেন। ১৯৪৯ সালে তাঁর তৃতীয় সংকলন "কখ জলি" প্রকাশিত হয়।

বেদী বিভিন্ন সময়ে বহু পুরস্কার লাভ করেন। তিনি মোট তিনবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পান। ১৯৫৬ সালে তিনি গরমকোটের জন্য সেরা গল্পের জন্য তিনি মধুমতির জন্য সেরা সংলাপের জন্য দ্বিতীয় ফিল্মফেয়ার পুরস্কারে ভূষিত হন এবং আবার ১৯৭১ সালে সত্য কামের সংলাপের জন্য। ১৯৬৫ সালে তিনি 'এক চাদর মেলী সি' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৮ সালে তিনি নাটকের জন্য গালিব পুরস্কারে ভূষিত হন। বেদীর জীবনের শেষ দিনগুলো চরম একাকীত্ব ও অসহায়ত্বে কেটেছিল। অবশেষে ১৯৮৪ সালের ১১ অক্টোবর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে পাঞ্জাব সরকার 'রাজিন্দর সিং বেদী' পুরস্কার চালু করেন।[২৯]

জনপ্রিয় উর্দু অনলাইন সাইট 'রিখতা' (Rekhta) - তে রাজিন্দর সিং বেদী সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> راجندر سنگھ بیدی جدید اردو فکشن کا وہ نام ہیں جس پر اردو افسانہ بجا طور پر ناز کرتا ہے۔ وہ یقیناً منفرد، بے مثال اور لاجواب ہیں۔ بیدی کے افسانے انسانی شخصیت کے لطیف ترین عکس ہیں۔ ان کے آئینہ خانے میں انسان اپنے سچّے روپ میں نظر آتا ہے اور بیدی اس کی تصویر کشی اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی شخصیت کے لطیف گوشے ہی سامنے نہیں آ جاتے بلکہ فرد اور سماج کے پیچیدہ رشتے اور انسان کی شخصیت کے پُر اسرار تانے بانے بھی روشن ہو جاتے ہیں۔[৩০]

> (আধুনিক উর্দু কথাসাহিত্যের এমন একটি নাম, যা নিয়ে উর্দু কথাসাহিত্য যথার্থই গর্বিত। তিনি নিঃসন্দেহে অনন্য, অদ্বিতীয় এবং তুলনাহীন। বেদী'র গল্পগুলো মানব ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে সূক্ষ্ম প্রতিচ্ছবি। তাঁর দর্পণে মানুষ তার প্রকৃত রূপে প্রতীয়মান হয়, এবং বেদী তাকে এমনভাবে চিত্রিত করেন যে, তাতে কেবল তার ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম দিকগুলোই উন্মোচিত হয় না, বরং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার জটিল সম্পর্ক এবং মানব ব্যক্তিত্বের রহস্যময় বুননও উদ্ভাসিত হয়।)

মুখতাছার তারিখ-এ-আদাব-এ-উর্দু গ্রন্থের রচয়িতা ড. এজায হোসাইন বলেন :

> بیدی نے انسانوں کا مواد گرد و پیش کی زندگی سے حاصل کیا ہے معمولی واقعات زندگی کی مختلف کشمکشیں، ازدواجی زندگی کی پیچیدگیاں، معاشی الجھنیں، یہی موضوعات ان کے افسانوں میں رنگ بھرتے ہیں اور ان تمام تر خشک، بے نمک و ادر معمولی باتوں کو بیدی اس دل چسپی اور دل نشینی سے پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والا ان کی جادو بیانی میں مسحور ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی با دگہ ان کے بجائے

Dhaka University Institutional Repository

ایک ایسا خوش نما سمندر معلوم ہوتی ہے جس کی موجیں خوفناک ہوتے ہوئے بھی نہیں اپنی طرف کھینچتی جاتی ہیں اور ہم خوشی خوشی ان کی آغوش میں خود کو ڈال دیتے ہیں۔[৩১]

(বেদী তাঁর চারপাশের মানুষের জীবন থেকেই মানবসত্তার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ছোটখাটো ঘটনা, জীবনের নানা দ্বন্দ্ব, দাম্পত্য জীবনের জটিলতা, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন–এইসব বিষয়ই তাঁর গল্পকে রাঙিয়ে তোলে। আর বেদী এই সমস্ত নীরস, নিরস ও তুচ্ছ বিষয়কে এমন আগ্রহ ও মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন যে পাঠক তাঁর জাদুকরী বর্ণনায় মোহিত হয়ে পড়েন।)

রাজিন্দর সিং বেদী'র রচনার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল :

آج رات چاند گرہن تھا۔ سر شام چاند گرہن کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے-ہولی کو اجازت نہ تھی کہ وہ کوئی کپڑا پھاڑ سکے پیٹ میں بچے کے کان پھٹ جائیں گے، وہ سی نہ سکتی تھی منہ سالا بچہ پیدا ہو گا۔ اپنے میکے خط نہ لکھ سکتی تھی اس کے ٹیڑھے میڑھے حروف بچے کے چہرے پر لکھے جائیں گے۔ اور اپنے میکے خط لکھنے کا اُسے بڑا چاؤ تھا۔

میلے کا نام آتے ہی اس کا تمام جسم ایک نامعلوم جذبہ سے کانپ اٹھتا۔ وہ میکے تھی تو اسے سسرال کا کہنا چاؤ تھا۔ لیکن اب وہ سسرال سے اتنی سیر ہو چکی تھی۔ کہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس بات کا اس نے کئی مرتبہ تہیہ بھی کیا لیکن ہر دفعہ ناکام رہی۔ اس کے میکے اساڑھی گاؤں سے پچیس میل کے فاصلہ پر تھے۔ سمندر کے کنارے ہر پھول بندر پر شام کے وقت سٹیمر لانچ مل جاتا تھا اور ساحل کے ساتھ ساتھ ڈیڑھ دو گھنٹہ کی مسافت کے بعد اُس کے میکے گاؤں کے بڑے مندر کے زنگ خوردہ کلس دکھائی دینے لگتے۔[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

কাইফি আজমি

বিশ শতকের প্রখ্যাত ভারতীয় উর্দু কবি ও চলচ্চিত্র গীতিকার কাইফি আজমি (১৯১৯-২০০২) । তিনি একজন কমিউনিস্ট ঘরানার কবি ছিলেন। প্রথিতযশা উর্দু কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ তাঁর সমসাময়িক কবি ছিলেন। গজল দিয়ে কবিতা চর্চা শুরু করেন, যার প্রধান বিষয় ছিল প্রেম। পরবর্তীতে তিনি সামাজিক সচেতনতামূলক কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন।

কাইফি আজমী ১৯১৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি আজমগড়ের মাজওয়ান নামক এক ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল সৈয়দ আতহার হুসেন রিজভী। তাঁর পিতা সৈয়দ ফতেহ হুসেন রিজভী একজন জমিদার ছিলেন। বাড়িতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর লক্ষ্ণৌয়ের সুলতান মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এরপর তিনি লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারসিতে কামিল এবং আরবিতে আলিম ডিগ্রী অর্জন করেন। লক্ষ্ণৌ থেকে তিনি কানপুরে যান। সেখানে কাইফি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং মার্কসবাদ নিয়ে পড়াশোনা করেন। এ সময় তাঁর সাজ্জাদ জহিরের সাথে পরিচয় হয়। তিনি তাঁকে সঙ্গে করে বোম্বে নিয়ে যান। বোম্বে গিয়ে কাইফি কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণকালীন কর্মী বনে যান।

কাইফির প্রথম কবিতার সংকলন ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে হায়দ্রাবাদে প্রগতিশীল লেখকদের এক সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে শওকত খানমের দেখা হয়। এরপর ১৯৪৭ সালের ২৩শে মে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতিতে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বাধীনতার পর সরকার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে। অনেক দলীয় কর্মীকে জেলে পাঠানো হয়, বাকিরা আত্মগোপন করেন বা দলত্যাগ করেন। কাইফিকেও দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকতে হয়েছিল। এ সময় কাইফি আর্থিকভাবে খুবই শোচনীয় অবস্থায় পড়ে যান। আর্থিক দূরাবস্থা দূর করার জন্য শওকত খানম থিয়েটারে এবং কাইফি চলচ্চিত্রে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে শহীদ লতিফ তার 'বজদিল' ছবির জন্য কাইফি দিয়ে দুটি গান লেখান এবং এক হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেন। এরপর থেকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে কাইফির সম্পৃক্ততা বেড়ে যায়। চলচ্চিত্রের জন্য গান লেখার পাশাপাশি তিনি সংলাপ ও চিত্রনাট্যও লিখতে থাকেন। *পেপার ফ্লাওয়ার্স*, *হাক্কিকাত*, *হির রানঝা* এবং *গরম হাওয়া* তাঁর গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র। ২০০২ সালের ১০ই মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

কাইফি মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রথম গজল লিখেন 'ইতনা তো জিন্দেগী মে কিসি কি খালাল পড়ে' নামে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝংকার* ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে– *আখির-ই-সাব*,*শারমায়া*,

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ারা সাজদে, *কৈফিয়াত*, *নঈ গুলিস্তাঁ* প্রভৃতি। তাঁর বিখ্যাত কবিতা *আওরাত*, *মাকান*,*দায়েরা*, *সাপ ও বহুরূপী প্রভৃতি*।[৩৩]

উর্দু কবিতায় কাইফি আজমীর এক বিশিষ্ট ও অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। তিনি একজন ভাববাদী কবি ছিলেন। তবুও তাঁর রোমান্টিক স্বভাবের কারণে তাঁর মধ্যে গীতিময়তাও বিদ্যমান। তিনি তাঁর যুগের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও ঘটনাগুলোকে সৃজনশীলভাবে অনুভব করতেন এবং তারপর সেগুলোকে তাঁর নিজস্ব অনন্য শৈলীতে উপস্থাপন করতেন। তাঁর শেষ পর্বের কবিতায় বাস্তববাদের উপস্থিতি দেখা যায়। তাঁর কবিতা চিন্তা ও শিল্পের সর্বোচ্চ মান পূরণ করে। পরিশেষে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কাইফি আজমীর কবিতা উর্দু কবিতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকবে।

কাইফি আজমী তাঁর জীবনে বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি তিনবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন। '*আওয়ারা সাজদে*' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমি এবং উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্র উর্দু একাডেমি থেকে পুরস্কৃত হন। তিনি সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কারও লাভ করেন। মহারাষ্ট্র সরকার তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য তাঁকে এক লক্ষ টাকার গুরু পুরস্কার প্রদান করে। অন্যদিকে দিল্লি সরকার তাঁকে এগারো লক্ষ টাকার মিলেনিয়াম পুরস্কার প্রদান করে। তিনি আন্তর্জাতিক লোটাস পুরস্কারেও ভূষিত হন। ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী পদক প্রদান করে। উর্দুর প্রতি সরকারের অবিচারের প্রতিবাদে তিনি পদ্মশ্রী পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এছাড়া ২০০২ সালে সাহিত্য একাডেমী ফেলোশীপ লাভ করেন। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে তাকে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদান করেন।

ড. ওয়াসিম আনওয়ার বলেন :

> ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند شاعری کا نام آتے ہی جو نام ذہن میں ابھرتے ہیں، ان میں کیفی اعظمی اپنی متعدد حیثیتوں سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کیفی ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند شاعری کے اہم ستون ہیں۔ انھوں نے اردو شاعری کو اپنے فکر و فن سے مالا مال کیا ہے۔[৩৪]

(প্রগতিশীল আন্দোলন ও প্রগতিশীল কবিতার কথা উঠলে যে নামগুলো মনে আসে, তাদের মধ্যে কাইফি আজমি তাঁর বহুবিধ অবস্থানের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাইফি প্রগতিশীল আন্দোলন ও প্রগতিশীল কবিতার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তিনি তাঁর চিন্তা ও শিল্প দিয়ে উর্দু কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন।)

Dhaka University Institutional Repository

শাকিলা রাফত আলী বলেন :

> کیفی صاحب ایک عالم گیر انسانی برادری کے علم بردار ہیں اس لیے وہ کسی خاص ملک اور عقیدے سے بیزار ہیں جو انسانی افکار کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ کیفی قوم پرست اور رحم دل انسان ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ کیفی صاحب کی زندگی، شخصیت اور شاعری کے مطالعے سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ان کی شخصیت ایک ایکسٹر ووورٹ انسان کی شخصیت ہے جو اکثر شعرا کی نہیں ہوتی۔[৩৫]

(কাইফি সাহেব এক সার্বজনীন মানব সম্প্রদায়ের ধারক, তাই তিনি এমন কোনো বিশেষ দেশ ও ধর্মের প্রতি রুষ্ট যা মানব চিন্তাকে কলুষিত করে। কাইফি একজন জাতীয়তাবাদী ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি। সংক্ষেপে, কাইফি সাহেবের জীবন, ব্যক্তিত্ব ও কবিতা অধ্যয়ন করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল একজন বহির্মুখী মানুষের মতো, যা কবিদের ক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় না।)

কাইফি আজমীর লিখার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল :

حوصلہ

تو خورشید ہے بادلوں میں نہ چھپ

تو مہتاب ہے جگ مگانا نہ چھوڑ

تو شوخی ہے شوخی رعائت نہ کر

تو بجلی ہے بجلی جلانا نہ چھوڑ

ابھی عشق نے ہار مانی نہیں

ابھی عشق کو آزمانا نہ چھوڑ[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

মাজরুহ সুলতানপুরী

বিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা উর্দু কবি,ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রভাবশালী সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব মাজরুহ সুলতানপুরী (১৯১৯-২০০০)। তাঁর প্রকৃত নাম আসরার হাসান খান।

মাজরুহ ১৯১৯ সালের ১লা অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের উত্তর প্রদেশের সুলতানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ হাসান খান। তিনি পুলিশ বিভাগে চাকরি করতেন। মাজরুহ ছিলেন তাঁর একমাত্র সন্তান। খিলাফত আন্দোলনের প্রভাবে মুহাম্মদ হাসান খান তাঁর ছেলেকে ইংরেজি শিক্ষা না দিয়ে একটি মাদ্রাসায় ভর্তি করান। সেখানে তিনি উর্দুর পাশাপাশি আরবি ও ফারসি অধ্যয়ন করেন। মাদ্রাসার পরিবেশ কঠোর ছিল, যার কারণে মাজরুহকে মাদ্রাসা ছাড়তে হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে ইউনানি চিকিৎসায় ডিগ্রি অর্জনের জন্য তিনি লক্ষ্ণৌয় ইউনানী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে হাকিম হিসেবে সনদ লাভ করেন। চিকিৎসাবিদ্যায় পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি ফৈজাবাদের টান্ডা শহরে একটি ক্লিনিক স্থাপন করেন। কিন্তু এতে তিনি সফল হতে পারেননি। ফলে তাকে টান্ডা ছেড়ে সুলতানপুরে ফিরে আসতে হয়।

ইউনানী কলেজে পড়ার সময় সঙ্গীতের প্রতিও মাজরুহ আগ্রহী হয়ে উঠেন। এ সময়ে তিনি একটি সঙ্গীত কলেজে ভর্তিও হন। কিন্তু তাঁর বাবা এ কথা জানতে পেরে ভীষণ রেগে যান এবং তাকে সঙ্গীত শিখতে নিষেধ করে দেন। ফলে তাঁর এই অনুরাগ পূরণ হতে পারেনি।

ইউনানী কলেজের ছাত্রকালীন অবস্থায় মাজরুহ কবিতা লেখায় মনোযোগী হন। উর্দু মুশায়ারায় নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকেন। ১৯৩৫ সালে তিনি প্রথম কবিতা লিখেন। সুলতানপুরের একটি কবিতা প্রতিযোগিতায় তিনি তাঁর প্রথম গজল আবৃত্তি করেন। তাঁর কাব্যরীতি ছিল ক্রোধপূর্ণ। তাঁর মানসিক প্রশিক্ষণে জিগর মুরাদাবাদী এবং অধ্যাপক রশিদ আহমেদ সিদ্দিকী বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। রশিদ আহমেদ সিদ্দিকী তাঁকে ফারসি ও উর্দুর ধ্রুপদী কবিতা অধ্যয়নের পরামর্শ দেন। রশিদ সাহেব তাঁকে তিন বছর নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন।

জিগর মুরাদাবাদী উদীয়মান কবিদের সম্ভাব্য সব উপায়ে উৎসাহিত করতেন। মাজরুহ'র কাব্য প্রতিভা দেখে তিনি তাকে বিশেষভাবে স্নেহ করতেন ও উৎসাহিত করতেন। জিগর মাজরুহকে সঙ্গে নিয়ে মুশায়ারায় যেতে শুরু করেন। এরকমই এক কবিতা আবৃত্তির আসরে তৎকালীন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক এ. আর. করদারও উপস্থিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মাজরুহ'র কবিতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর সাথে পরিচিত হন এবং তাঁকে তাঁর চলচ্চিত্রের জন্য গান লেখার জন্য অনুরোধ করেন। মাজরুহ রাজি হয়ে যান। সেই সময় তিনি 'শাহজাহান' চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করছিলেন, যার সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন নওশাদ এবং নায়ক ছিলেন কে. এল. সেহগাল, যিনি চলচ্চিত্রে নিজের কণ্ঠেই গান গাইতেন। এই চলচ্চিত্রের জন্য গান রচনা করাই ছিল মাজরুহ'র প্রথম কাজ। প্রথম কাজেই তিনি বাজিমাত করে দেন। এ চলচ্চিত্রে তাঁর লেখা এবং সেহগালের গাওয়া 'জব দিল হি টোট গায়া হাম জি কে কিয়া কারেঙ্গে' গানটি অমর হয়ে যায়। সেহগালের ইচ্ছা ছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর এই গানটি যেন তাঁর আরতির সাথে বাজানো হয়।

মাজরুহ গীতিকার হিসেবে 'শাহজাহান' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করে প্রায় ৫৫ বছর এ শিল্পের সাথে জড়িত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি অসংখ্য গান লিখেছেন, যার বেশিরভাগই ছিল হিট। তিনি চলচ্চিত্রের গানে যথাসম্ভব সাহিত্যের ছোঁয়া বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর পেশায় সম্পূর্ণ পেশাদার ছিলেন এবং অপ্রয়োজনীয় দম্ভ করতেন না। ১৯৬৫ সালে 'দোস্তি' ছবির 'চাহুঁ গা ম্যায় তুঝে সাঁঝ সাওয়ারে' গানটির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে 'ফিল্মফেয়ার' পুরস্কারে ভূষিত হন। এরপর ১৯৯৩ সালে তিনি চলচ্চিত্র জগতের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৯৭ সালে শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন। সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি 'গালিব পুরস্কার' এবং 'ইকবাল সম্মান'-এও ভূষিত হন। তাঁর সাহিত্য ও চলচ্চিত্র কর্মকাণ্ডের সূত্রে তিনি রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন এবং উপসাগরীয় দেশসহ কয়েক ডজন দেশ ভ্রমণ করেন। বার্ধক্যে তিনি ফুসফুসের রোগে ভুগছিলেন। ২০০০ সালের ২৪শে মে মাজরুহ মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৭]

শাহজাদ নিয়াজ মাজরুহ'র চলচ্চিত্র জগত সম্পর্কে মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বলেন :

> مجروح سلطان پوری ایک لیجنڈری گیت نگار تھے جنہوں نے ہندوستانی سنیما پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ ان کے گیت آج بھی مقبول ہیں اور ادب اور فنون میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔[৩৮]

> (মাজরুহ সুলতানপুরী ছিলেন একজন কিংবদন্তী গীতিকার, যিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর গান আজও জনপ্রিয় এবং সাহিত্য ও শিল্পকলায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।)

Dhaka University Institutional Repository

ড. সৈয়দ মা'ছুম রেজা বলেন :

بیسویں صدی میں اردو شاعری کے افق پر جو چاند ستارے جگمگائے ان میں ایک نام مجروح سلطانپوری کا بھی ہے۔ مجروح سلطانپوری نے اپنی شاعری کے شروعاتی دور میں ہی اپنے کلام کا لوہا منوالیا۔[৩৯]

(বিংশ শতাব্দীতে উর্দু কবিতার দিগন্তে যে তারকারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাজরোহ সুলতানপুরীর নাম অন্যতম। মাজরোহ সুলতানপুরী তাঁর কাব্যের প্রাথমিক পর্যায়েই শব্দচাতুর্যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।)

প্রফেসর জগন্নাথ আযাদ বলেন :

مجروح کی شاعری خیال اور جذبہ کی امتزاج کا ایک نگار خانہ ہے جس میں زندگی کے کئی رنگ جھلک رہے ہیں۔ انسان کی عظمت میں مجروح کا یقین ایک اٹل یقین ہے اور عظمت انسان کا بیان مجروح کی غزل میں خالی خولی جذباتی انداز کا نہیں ہے بلکہ زندگی کی ٹھوس حقیقتوں پر مبنی ہے۔ روایت کا احترام اور روایت میں توسیع مجروح کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے جس کے حسن میں پیکر تراشی کے نقوش جابجا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔[৪০]

(মাজরুহ'র কবিতা হলো ভাবনা ও অনুভূতির এক চিত্রশালা, যা জীবনের বহু রঙের প্রতিফলন ঘটায়। মানুষের মহত্ত্বের প্রতি মাজরোর বিশ্বাস এক অটল আস্থা, এবং তাঁর গজলে সেই মহত্ত্বের প্রকাশ কোনো অন্তঃসারশূন্য আবেগঘন শৈলী নয়, বরং তা জীবনের বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে রচিত। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও তার সম্প্রসারণ মাজরোর কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, যার সৌন্দর্য ভাস্কর্যের ছাপে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পায়।)

মাজরুহ'র কবিতার নমুনা–

مسرتوں کو یہ اہل ہوس نہ کھو دیتے
جو ہر خوشی میں ترے غم کو بھی سمو دیتے
کہاں وہ شب کہ ترے گیسوؤں کے سائے میں
خیال صبح سے ہم آستیں بھگو دیتے
بہانے اور بھی ہوتے جو زندگی کے لیے
ہم ایک بار تری آرزو بھی کھو دیتے
بچا لیا مجھے طوفاں کی موج نے ورنہ
کنارے والے سفینہ مرا ڈبو دیتے[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

সাহির লুধিয়ানবি

সাহির লুধিয়ানবি (১৯২১-১৯৮০) বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা ভারতীয় কবি ও গীতিকার ছিলেন । উর্দুর পাশাপাশি তিনি হিন্দি ভাষাতেও কবিতা লিখেছেন।

সাহির ১৯২১ সালের ৮ই মার্চ লুধিয়ানার এক সামন্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল হাই। তাঁর পিতার নাম ছিল চৌধুরী ফজল মুহাম্মদ এবং মাতার নাম ছিল সরদার বেগম। তিনি তাদের প্রথম সন্তান ছিলেন। সাহির তাঁর মামার বাড়িতে বড় হন। স্কুলে যাওয়ার বয়স হলে, তাঁকে মালওয়া খালসা স্কুলে ভর্তি করা হয়। এখান থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৯ সালে একই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি লুধিয়ানার সরকারি কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় তাঁর রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হতে শুরু করে এবং তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিএ-র শেষ বর্ষে তিনি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। লুধিয়ানা সরকারী কলেজ ছেড়ে তিনি লাহোরে গিয়ে দয়াল সিং কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে সেখান থেকেও বহিষ্কৃত হন, এরপর তাঁর মন আবার শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

লুধিয়ানা ছিল উর্দু ভাষার এক প্রাণবন্ত ও সক্রিয় কেন্দ্র। এখানে থাকতেই তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ জন্মায়। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার আগেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *তালখিয়াঁ* ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর এ গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বেশ সাড়া ফেলে। তিনি তৎকালীন জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা 'আদব-এ-লতিফ'-এর সম্পাদক হন। পরে তিনি 'সাবেরা' এবং 'শাহকার' পত্রিকা দু'টিরও সম্পাদনা করেন। সেই সময় তাঁর কলেজের এক বন্ধু স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর 'আজাদি কি রাহ পর' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করছিলেন। তিনি সাহিরকে এই সিনেমার জন্য গান লেখার অনুরোধ করেন। এরপর তিনি বোম্বেতে এসে চলচ্চিত্রে স্থায়ী হওয়ার চেষ্ঠা করেন। চলচ্চিত্র জগতে থিতু হতে তাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল, এর অন্যতম কারণ ছিল যে তিনি গতানুগতিক গান লিখতে রাজি ছিলেন না। পরবর্তীতে এক বন্ধুর মাধ্যমে তাঁর সাথে এস ডি বর্মনের দেখা হয়। দু'জনের মধ্যে বেশ ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই জুটি বলিউড চলচ্চিত্রে অনেক স্মরণীয় গান উপহার দেয়।

কবিতায় সাহিরের মতো এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুব কম লোকই করেছেন। তিনি রাজনৈতিক কবিতা, রোমান্টিক কবিতা, মনস্তাত্ত্বিক কবিতা এবং বিপ্লবী কবিতা লিখেছেন, যা কৃষক ও শ্রমিকদের অভ্যুত্থানের ঘোষণা দেয়। তাঁর কবিতাগুলিতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সাহির তাঁর সাহিত্যকর্মের বেশ কিছু পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৭১ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭২ সালে মহারাষ্ট্র সরকার তাঁকে 'জাস্টিস অফ পিস' পুরস্কার প্রদান করে। ১৯৭৩ সালে 'আভ কে কোই খাব বুন্নেঁ' কাব্যটির সাফল্যের জন্য তিনি 'সুইটল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার' এবং মহারাষ্ট্র রাজ্য 'সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে মহারাষ্ট্র সরকার তাঁকে 'বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট' হিসেবে মনোনীত করে। তাঁর কবিতা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ২০১৩ সালে তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের ডাক বিভাগ একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ১৯৮০ সালের ২৫ অক্টোবর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৪২]

খাজা আহমদ আব্বাস বলেন :

> ساحر نے جتنے تجربات شاعری میں کئے ہیں وہ دوسروں نے کم ہی گئے ہوں گے۔ انھوں نے سیاسی شاعری کی ہے، رومانی شاعری کی ہے، نفسیاتی شاعری کی ہے جس میں کسانوں اور مزدوروں کی بغاوت کا اعلان ہے۔ ایسی بھی شاعری کی ہے جو تخلیقی طور سے پیغمبری کی سرحدوں کو چھو گئی ہے۔ اور ایسی بھی شاعری کی ہے جس میں رنگینی مزاج اور شوخی جھلکتی ہے۔[৪৩]

(কবিতায় সাহির যে পরিমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তেমন অভিজ্ঞতা খুব কম লোকেরই হয়েছে। তিনি লিখেছেন রাজনৈতিক কবিতা, প্রেমের কবিতা, কৃষক ও শ্রমিকদের বিদ্রোহ ঘোষণাকারী মনস্তাত্ত্বিক কবিতা। এমন কবিতাও আছে যা সৃজনশীলভাবে ভাববাদী কবিতার সীমানাকে ছুঁয়ে গেছে। আবার এমন কবিতাও আছে যা রঙিন মেজাজ ও রসবোধের প্রতিফলন ঘটায়।)

ড. নাগমা পারভীন বলেন :

> ساحر لدھیانوی اسی ماحول اور فضاء کی پیداوار تھے جس میں سارا ہندوستان سانس لے رہا تھا۔ ترقی پسند شعرا رومانی و انقلابی شاعری کر رہے تھے۔ جن میں فیض، مجاز، مخدوم کا نام نمایاں ہے۔ ان شعراء کا خاص مقصد عوامی زندگی کی بحالی، امن و آشتی قائم کرنا، ملک کو آزاد کرانا، سرمایادارانہ سماج کی بنیادوں کو ہلانا، فرقہ واریت کو ختم کرنا اور نسوانی معاشرے کی بہتری کے لئے قلمی جہاد کرنا تھا۔ ساحر نے بھی انھیں موضوعات پر قلم اٹھایا۔[৪৪]

(সাহির লুধিয়ানবি সেই আবহ ও পরিবেশের ফসল ছিলেন, যে আবহে সমগ্র ভারত শ্বাস নিচ্ছিল। প্রগতিশীল কবিরা রোমান্টিক ও বিপ্লবী কবিতা লিখছিলেন। তাঁদের মধ্যে ফয়েজ, মাজাজ, মখদুমের নাম উল্লেখযোগ্য। এই কবিদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের জীবন পুনরুদ্ধার করা, শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা, দেশকে মুক্ত করা, পুঁজিবাদী সমাজের ভিত্তি কাঁপিয়ে দেওয়া, সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা

Dhaka University Institutional Repository

এবং নারীবাদী সমাজের উন্নতির জন্য কলম-জিহাদ করা। সাহিরও এই বিষয়বস্তুগুলোকেই গ্রহণ করেছিলেন।)

সাহির লুধিয়ানবি'র কবিতার নমুনা :

چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں

نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی

نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے

نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے تیری باتوں سے

نہ ظاہر ہو تمہاری کشمکش کا راز نظروں سے

تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے

مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوں پرائے ہیں

تعارف روگ ہو جائے تو اسکا بھولنا بہتر

تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا

وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن

اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ ফরাজ

আহমেদ ফরাজ পাকিস্তানি উর্দু কবি ও চিত্রনাট্যকার। তিনি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আর্বিভূত আধুনিক উর্দু কবিতার অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর। তিনি তাঁর কবিতায় বিশেষত গজলে সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক ও রোমান্টিক বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তাঁর লেখায় কর্তৃত্ববাদ ও সামাজিক অবিচারের বিরোধিতা স্পষ্ট।

ফরাজের জন্ম ১৯৩১ সালের ১২ জানুয়ারি পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়ায়। তিনি পশতুন-সৈয়দ পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল সৈয়দ আহমেদ শাহ। পরে তিনি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের পরামর্শে আহমেদ ফরাজ নামে কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর মাতৃভাষা ছিল পশতু কিন্তু উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল। তাঁর পিতা আগা সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ বারক কোহাতি একজন শিক্ষক ছিলেন;যিনি ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখতেন। তাঁর ভাই মাসুদ কাউসার খাইবার পাখতুনখোয়ার গভর্নর ছিলেন। তিনি পেশোয়ার এডওয়ার্ডেস কলেজে পড়াশোনা করেন এবং পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উর্দু ও ফার্সিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি রেডিও পাকিস্তান পেশোয়ারে চিত্রনাট্যকার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন, কিন্তু পরে তিনি পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৭৬ সালে পাকিস্তান সরকার যখন দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য প্রতিষ্ঠান 'একাডেমি অফ লেটার্স' প্রতিষ্ঠা করে, তখন আহমেদ ফরাজকে এর প্রথম মহাপরিচালক করা হয়। আহমদ ফরাজ কিডনি বিকল হয়ে ২৫ আগস্ট ২০০৮ সালে ইসলামাবাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতার বই *তানহা তানহা*। ১৯৬৬ তে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *দরদ-এ-আশুব*। এই বই প্রকাশের পরপরই তিনি আলোচিত হয়ে ওঠেন পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণীর কাব্যমোদীদের কাছে। জড়িয়ে পড়েন প্রগতিশীল রাজনীতিতে। এ সময় তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন রেডিও পাকিস্তান ও পিটিভিতে। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে-- কবিতা সংগ্রহ দশটি, নাটক একটি এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকার একটি। ওসব বই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচুর প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হল *তানহা তানহা*, *জানাঁ জানাঁ*, *খাব-এ-গুল পেরেশাঁ হ্যায়*, *শব-এ-খুন*, *মেরে খোয়াব রেজা রেজা*, *পেশ আন্দাজ-এ-মওসম*, *বে আওয়াজ গলি কুচুঁ ম্যায়*, *নায়াফাত* প্রভৃতি।[৪৬]

আহমদ ফরাজ ছিলেন দেশ-কাল সচেতন কবি। কবিতা-বিচারে তাকে প্রেম ও দ্রোহের কবি বলা যায় । তিনি ব্যাপক নন্দিত ছিলেন তরুন ও জনসাধারণের কাছে । মিলিটারি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কলম ধরায় ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউল হক সরকারের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন এবং ছয় বছরের জন্য পাকিস্তান থেকে নির্বাসিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

ফরাজ সর্বস্তরে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। তাঁর প্রাপ্ত কয়েকটি পুরস্কারের নাম হলো :- 'আদমজী পুরস্কার', 'আবাসিন পুরস্কার', 'ফিরাক গোরখপুরী পুরস্কার' (ভারত), 'উর্দু সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার' (কানাডা), 'টাটা পুরস্কার' (ভারত), পাকিস্তান সাহিত্য একাডেমির 'কামাল ফান' পুরস্কার, উর্দু সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য আহমদ ফরাজ 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' ও 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' পুরস্কার লাভ করেন।

জনপ্রিয় উর্দু অনলাইন সাইট 'রিখতা' (Rekhta) - তে আহমেদ ফরাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فراز کی شاعری جن دو بنیادی جذبوں، رویوں اور تیوروں سے مل کر تیار ہوتی ہے وہ احتجاج، مزاحمت اور رومان ہیں۔ان کی شاعری سے ایک رومانی، ایک نوکلاسیکی، ایک جدید اور ایک باغی شاعر کی تصویر بنتی ہے۔انہوں نے عشق، محبت اور محبوب سے جڑے ہوئے ایسے باریک احساسات اور جذبوں کو شاعری کی زبان دی ہے جو ان سے پہلے تک ان چھوے تھے۔[৪৭]

(ফরাজের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দুটি মৌলিক আবেগ, মনোভাব ও মেজাজ: প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং প্রেম। তাঁর কবিতায় একজন রোমান্টিক, একজন নব্য-ধ্রুপদী, একজন আধুনিক এবং একজন বিদ্রোহী কবির প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। তিনি প্রেম, স্নেহ এবং প্রিয়জন সম্পর্কিত এমন সব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগকে কাব্যিক ভাষা দিয়েছেন, যা আগে অনালোচিত ছিল।)

প্রফেসর খালেদা জহুর বলেন :

فراز نے اپنے پہلے شعری مجموعہ "تنہا تنہا" سے لے کر آخری شعری مجموعہ "اے عشق جنوں پیشہ "تک رومانیت کے ساتھ ساتھ حریت فکر اور ناموس قلم کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ تیس برس تک پاکستان میں فراز سے زیادہ کوئی شاعر اپنی تخلیقات پر رائلٹی وصول نہیں کر سکا اس کے شعری مجموعوں کو فروخت کا ریکارڈ کوئی شاعر نہیں توڑ سکا۔وہ فن کا سمندر ہے، لفظوں کا جادوگر ہے، محبتوں کا امین ہے، خوابوں کا بادشاہ ہے اور زندگی کی حقیقتوں کا آئینہ گر بھی۔[৪৮]

(ফরাজ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তানহা তানহা' থেকে শুরু করে সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'আয়ে ইশক জিনুঁ পেশা' পর্যন্ত রোমান্টিসিজমের সাথে সাথে চিন্তার স্বাধীনতার পতাকা এবং কলমের সম্মানকে ধ্বংস হতে দেননি। গত ত্রিশ বছরে পাকিস্তানের কোনো কবি সৃষ্টিকর্ম দিয়ে ফরাজের চেয়ে বেশি রয়্যালটি আদায় করতে পারেননি এবং তাঁর কাব্যগ্রন্থ বিক্রির রেকর্ড কোনো কবিই ভাঙতে পারেননি। তিনি শিল্পের মহাসাগর, শব্দের জাদুকর, প্রেমের নিরাপদস্থল, স্বপ্নের রাজা এবং জীবনের বাস্তবতার দর্পণ।)

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ ফরাজের কবিতার একটি উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হলো :

چلو ہم پھر صف آراہوں

صف آراہوں

کہ دشمن چار سُو آئے

کہ قاتل رُوبرُو آئے

کہ اُن کے کاسۂ خالی میں

کچھ اپنا لہو آئے

کہ بُجھ جائے ہر اِک مشعل

تو ظلمت کُو بکُو آئے[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১। ড. মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন আনসারী, *জিগার মুরাদাবাদী*, সাহিত্য একাডেমী, ২০০৬, দিল্লী, পৃ.- ৭,৮, ৫০

২। ড. মুহাম্মদ হাসান, *জিগর কী শায়েরী (কুল্লিয়াত-এ-জিগর)*, আযাদ বুক ডিপো, অমৃতসর, ১৯৭৭, পৃ.- ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩। *দায়েরাতুল মাআরিফ*, *জিগর মুরাদাবাদী* পরিচিতি দ্রষ্টব্য

৪। *কুল্লিয়াত-এ-জিগর*, এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউজ, দিল্লী, ২০০৫, পৃ.- ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৫। কৃষণ কান্ত (সম্পাদিত), *কুল্লিয়াত-এ-জিগর*, আযাদ বুক ডিপো, অমৃতসর, ১৯৭৭, পৃ.- ২১।

৬। আজীজ নাবীল, *ফিরাক গোরখপুরী : সখছিয়্যাত,শায়ের আউর সানাখাত*, মজলিছে ফখরে বাহরাইন বরায়ে ফুরুগে উর্দু, বাহরাইন, ২০১৪, পৃ.- ১

৭। প্রফেসর আমীর আরিফী, *ফিরাক আউর নয়ী নছল*, সাকী বুক ডিপো, দিল্লী, ১৯৯৭, পৃ.- ৭

৮। *ফিরাক গোরখপুরী : সখছিয়্যাত,শায়ের আর সানাখাত*, প্রাগুক্ত, পৃ.- ৩০

৯। ফিরাক গোরখপুরী, *গুল-এ-নাগমা*, ইদারা-এ-এলম ওয়া আদব, দিল্লী, ২০০৬, পৃ.-২০

১০। ড. মো: ইস্রাফীল, *উর্দু সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও কবিতা*, টি এন্ড টি পাবলিশার, ঢাকা, ২০১৪, পৃ.- ১৪৫

১১। *আফকার* (উর্দু পত্রিকা), সাহেবা লক্ষ্ণৌবী (সম্পাদক), জোশ সংখ্যা, বর্ষ-১৭, সংখ্যা-১২২-১২৩, মাকতাবা- এ-আফকার, করাচি, পৃ.- ৬৬৬

১২। খালীক আনজুম, *জোশ মালিহাবাদী : তানকীদী জায়েযা*, আঞ্জুমান-এ-তরক্কী উর্দু, দিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ৭

১৩। জোশ মালিহাবাদী, *শো'লা-ওয়া-শবনম*, হিমালয়া বুক হাউস, দিল্লী, ১৯৩৬, পৃ.- ১৭

১৪। ড. এম সুলতানা বখশ, *ইসমত চুগতাই: সখছিয়্যাত আউর ফন*, ওয়ার্ড ভিশন পাবলিশার্স, ইসলামাবাদ, ১৯৯২, পৃ.- ৯-১৩

১৫। *রিখতা(Rekhta)*, ইসমত চুগতাই পরিচিতি দ্রষ্টব্য

১৬। ড. এজায হোসাইন, *মুখতাছার তারিখ-এ-আদাব-এ-উর্দু*, জাভেদ পাবলিশার্স, এলাহাবাদ, ১৯৮৪, পৃ.- ৩৮২

১৭। ইসমত চুগতাই, *ইসমত চুগতাঈ কে আফছানে*, এস এইচ অফসেট প্রিন্টার্স, দিল্লী, ২০১৩, পৃ. ৩২২

১৮। ড. ফারজানা আসলাম, *সাদাত হাসান মান্টো : হায়াত আউর কারনামে*, এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউস, দিল্লী, ২০০৯, পৃ.- ১১-২২

১৯। ড. এজায হোসাইন, *মুখতাছার তারিখ-এ-আদাব-এ-উর্দু*, জাভেদ পাবলিশার্স, এলাহাবাদ, ১৯৮৪, পৃ.- ৩৮১

২০। সাদাত হাসান মান্টো, *কালী শেলওয়ার*, যাফর আহমদ কুরায়শী প্রিন্টার্স পাবলিশার, দিল্লী, ১৯৪১, পৃ.-১২

২১। মাহে নূর জামানী বেগম, *কৃষণ চন্দর কে নভেলোঁ ম্যায় নিছওয়ানী কেরদার*, ন্যাশনাল ফাইন প্রিন্টিং প্রেস, হায়দ্রাবাদ, ১৯৮৭, পৃ.- ১১-২৫

২২। ড. আব্দুস সালাম সিদ্দিকী, *কৃষণ চন্দর কে নভেলোঁ কা তানকীদী মোতালেআ*, আঞ্জুমান-এ-তরক্কী উর্দু, দিল্লী ২০০৪, পৃ.- পরিচিতি দ্রষ্টব্য

২৩। *আজকাল* (উর্দু পত্রিকা), কৃষণ চন্দর সংখ্যা, হাসান জিয়া (সম্পাদক), সংখ্যা-৪, মাস- নভেম্বর, সাল- ২০১৪, পৃ.-২

২৪। কৃষণ চন্দর, *ঘোনট ম্যায় গুরী জলে*, ছাকী বুক ডিপো, দিল্লী, ১৯৫৩, পৃ.- ৫০

২৫। শবনম পারভীন, *গজলিয়াত-এ-এহসান দানিশ*, আসগর পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০৬, পৃ.- ৩১৭

Dhaka University Institutional Repository

২৬। *দায়েরাতুল মাআরিফ*, এহসান দানিশ পরিচিতি দ্রষ্টব্য

২৭। *রিখতা (Rekhta)*, এহসান দানিশ পরিচিতি দ্রষ্টব্য

২৮। শবনম পারভীন, *গজলিয়াত-এ-এহসান দানিশ*, আসগর পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০৬, পৃ.- ৩১৭

২৯। প্রফেসর ওয়াহাব আশরাফী, *রাজিন্দর সিং বেদী কী আফসানা নিগারী*, এডকেশনাল পাবলিশিং হাউস, দিল্লী, ২০০১, পৃ.- ২৯-৩০

৩০। *রিখতা(Rekhta)*, রাজিন্দর সিং বেদী পরিচিতি দ্রষ্টব্য

৩১। ড. এজায হোসাইন, *মুখতাছার তারিখ-এ-আদাব-এ-উর্দু*, জাভেদ পাবলিশার্স, এলাহাবাদ, ১৯৮৪, পৃ.- ৩৮৫

৩২। রাজিন্দর সিং বেদী, *গ্রহণ*, মাকতাবা-এ-উর্দু, লাহোর, ১৯৪২, পৃ.- ১১-১২

৩৩। ড. ওয়াসিম আনোয়ার, *কাইফি আজমী : সখছিয়্যাত, শায়েরী আউর আহাদ*, প্রাইম পাবলিশার, মধ্যপ্রদেশ ২০০৫, পৃ.- ১৭,২৮,৩৬ এবং কাশাহেদ মাহেলী, *কাইফি আজমী : ফন আউর সখছিয়্যাত*, মে'য়ার পাবলিকেশন্স, দিল্লী, ২০০৪, পৃ.-১৫-১৭

৩৪। ড. ওয়াসিম আনওয়ার, *কাইফি আজমী : সখছিয়্যাত*, *শায়েরী আউর আহাদ*, প্রাইম পাবলিশার, মধ্যপ্রদেশ, ২০০৫, পৃ. ৯

৩৫। ড. শাকিলা রাফত আলী, *কাইফি আজমী : ফিকর ওয়া ফন*, মে'য়ার পাবলিকেশন্স, দিল্লী, ২০০৫, পৃ. ৫৪

৩৬। কাইফি আজমী, *আখেরি শব*, কুতুব পাবলিশার্স লিমিটেড, মুম্বাই, ১৯৪৭, পৃ.- ১০

৩৭। খালীক আনজুম, *গুলকারিয়ে ওয়াহশাত কা শায়ের মাজরুহ*, আঞ্জুমান-এ-তরক্কী উর্দু, দিল্লী, ২০০০, পৃ.- ১১-১৪

৩৮। শাহজাদ নিয়াজ, *মাজরুহ সুলতানপুরী: ফন ওয়া সখছিয়্যাত কা ছরছরি জায়েযা*, এক্সপ্রেস নিউজ (অনলাইন পত্রিকা), পাকিস্তান, প্রকাশকাল- ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

৩৯। তাজ সাঈদ (সম্পাদিত), *কুল্লিয়াত-এ-মাজরুহ সুলতানপুরী*, আল-হামদ পাবলিকেশন্স, লাহোর, ২০০৩, পৃ.- ৪২

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ.- ৩১

৪১। মাজরুহ সুলতানপুরী, *গজল*, আঞ্জুমানে তরক্কী উর্দু, আলীগড়, ১৯৫৮, পৃ.- ১১

৪২। *ফন আওর সখছিয়্যাত* (উর্দু পত্রিকা), সাবের দাত (সম্পাদক), সাহির লুধিয়ানবী সংখ্যা, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, পৃ.- ১২

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ.- ৫৫০

৪৪। ড. নাগমা পারভীন, *সাহির লুধিয়ানবি : হায়াত আওর কারনামে*, স্বরসতী প্রেস, এলাহাবাদ, ২০০৭, পৃ.-১৪৩

৪৫। সাহির লুধিয়ানবী, *কুল্লিয়াত-এ-সাহির*, হুসামী বুক ডিপো, হায়দ্রাবাদ, ১৯৯৮, পৃ.- ৪৩

৪৬। প্রফেসর ড. আব্দুল কাদের গিয়াসউদ্দীন ফারুকী, *আহমেদ ফরাজ : সখছিয়্যাত আউর শায়েরী*, বেলুষ্টার প্রিন্টার্স, বিজাপুর, ২০১৫, পৃ.- ৪০-৪১

৪৭। *রিখতা(Rekhta)*, আহমেদ ফরাজ পরিচিতি দ্রষ্টব্য

৪৮। প্রফেসর ড. আবদুল কাদির গিয়াসউদ্দীন ফারুকী, *আহমেদ ফরাজ : সখছিয়্যাত আউর শায়েরী* , বেলুষ্টার প্রিন্টার্স, বিজাপুর, ২০১৫, পৃ.- ২৮-২৯

৪৯। আহমেদ ফরাজ, *শব-এ-খুন*, জামেয়া ইমারাতু আরাবিয়্যাতু আলমুতাহাদ্দেত, ১৯৮৭, পৃ.-৩২

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উর্দু সাহিত্যের কাব্যজগতে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। তাঁর নাম বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন, বিশ্বশান্তির সপক্ষের আন্দোলনে দারুণভাবে যুক্ত। চার দশকের অধিককাল তিনি উর্দু কাব্যচর্চার প্রতিটি মুহূর্তে বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আফ্রো-এশীয় মানুষের মুক্তি ও শান্তির সপক্ষে সংগ্রাম করে গেছেন। জেল খেটেছেন, দেশত্যাগী হয়েছেন কিন্তু নিজের সংকল্প ও আদর্শ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন ধ্বনিত হয়েছে মানব প্রেমের সুর অন্যদিকে ধ্বনিত হয়েছে দ্রোহের সুর। তিনি সবসময় সামগ্রিকভাবে মানব কল্যাণের প্রত্যাশি ছিলেন। নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের পক্ষে ছিল তাঁর জোরালো কণ্ঠস্বর। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণীবেষম্য এবং দেশে দেশে গৃহযুদ্ধ- এ সবকিছুর বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। সমতা ভিত্তিক সত্য সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। এ সমস্ত ভাবনা ও কল্পনাগুলো ফয়েজ তাঁর কর্মে ও কবিতায় ব্যাপকভাবে প্রকাশ করে গেছেন।

রাজনৈতিক চেতনা বলতে সাধারণত সেই সচেতনতাকে বোঝায় যা মানুষকে সামাজিক ব্যবস্থার অবিচার, শোষণ, শ্রেণী বৈষম্য, এবং ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে সজাগ করে। সাহিত্যে রাজনৈতিক চেতনা শুধু রাজনৈতিক ঘটনা বর্ণনা করে না, বরং সেই ঘটনাগুলির মূলে থাকা কাঠামোগত অবিচার ও মানব মর্যাদার হননের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে প্রকাশ পায়। ফয়েজের কবিতায় এই চেতনা এক অনন্য কাব্যিক রূপ নেয়। তিনি কখনও সরাসরি রাজনৈতিক স্লোগান ব্যবহার করেননি, কখনও কঠোর রাজনৈতিক ভাষাও ব্যবহার করেননি। বরং কাব্যের ভাষায়, প্রতীকের মাধ্যমে, এবং মানব অনুভূতির গভীরতায় রাজনৈতিক বার্তা প্রচার করেছেন।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ছিলেন নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর এবং দ্রোহের প্রতীক। তার কবিতায় রাজনীতি কোনো আলাদা অনুষঙ্গ নয়, বরং তার শিল্পসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি রোমান্টিকতাকে বিপ্লবের সাথে এমনভাবে মিশিয়েছেন যে, তার বিরহগাথাগুলো শেষ পর্যন্ত গণমানুষের অধিকারের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

পরিশেষে এটা অনায়াসে বলা যায় যে, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ শুধু একজন কবি নন, বরং একজন চিন্তাবিদ, মানবতাবাদী, সামাজিক ন্যায়বিচারের সংগ্রামী এবং রাজনৈতিক চেতনার প্রতীক। তাঁর কবিতা শুধু ভাব ও ভাষার সৌন্দর্যে সীমাবদ্ধ নয় ; বরং তা সমাজের অবিচার, শোষণ, অসাম্য এবং মানব মর্যাদার লড়াইয়ের প্রতিধ্বনি। তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা এমন এক গভীর স্তরে প্রবেশ করেছে যে, তাঁর কবিতাগুলি শুধু সাহিত্য নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি :

ড. মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন আনসারী : *জিগার মুরাদাবাদী*, সাহিত্য একাডেমী, দিল্লী, ২০০৬

ড. মুহাম্মদ হাসান : *জিগর কী শায়েরী (কুল্লিয়াত-এ-জিগর)*, আযাদ বুক ডিপো, অমৃতসর, ১৯৭৭

জিগার মুরাদাবাদী : *কুল্লিয়াত-এ-জিগর*, এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউজ, দিল্লী, ২০০৫

আজীজ নাবীল : *ফিরাক গোরখপুরী : সখছিয়্যাত,শায়ের আউর সানাখাত*, মজলিছে ফখরে বাহরাইন বরায়ে ফুরুগে উর্দু, বাহরাইন, ২০১৪

প্রফেসর আমীর আরিফী : *ফিরাক আউর নয়ী নছল*, সাকী বুক ডিপো, দিল্লী, ১৯৯৭

ফিরাক গোরখপুরী : *গুল-এ-নাগমা*, ইদারা-এ-এলম ওয়া আদব, দিল্লী, ২০০৬

ড. মো: ইস্রাফীল : *উর্দু সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও কবিতা*, টি এন্ড টি পাবলিশার, ঢাকা, ২০১৪

খালীক আনজুম : *জোশ মালিহাবাদী : তানকীদী জায়েযা*, আঞ্জুমান-এ-তরক্কী উর্দু, দিল্লী, ১৯৯২

জোশ মালিহাবাদী : *শো'লা-ওয়া-শবনম*, হিমালয়া বুক হাউস, দিল্লী, ১৯৩৬

ড. এম সুলতানা বখশ : *ইসমত চুগতাই: সখছিয়্যাত আউর ফন*, ওয়ার্ড ভিশন পাবলিশার্স, ইসলামাবাদ, ১৯৯২

ড. এজায হোসাইন : *মুখতাছার তারিখ-এ-আদাব-এ-উর্দু*, জাভেদ পাবলিশার্স, এলাহাবাদ, ১৯৮৪

ইসমত চুগতাই : *ইসমত চুগতাঈ কে আফছানে*, এস এইচ অফসেট প্রিন্টার্স, দিল্লী, ২০১৩

ড. ফারজানা আসলাম : *সাদাত হাসান মান্টো : হায়াত আউর কারনামে*, এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউস, দিল্লী, ২০০৯

সাদাত হাসান মান্টো : *কালী শেলওয়ার*, যাফর আহমদ কুরায়শী প্রিন্টার্স পাবলিশার, দিল্লী, ১৯৪১

মাহে নূর জামানী বেগম : *কৃষণ চন্দর কে নভেলোঁ ম্যায় নিছওয়ানী কেরদার*, ন্যাশনাল ফাইন প্রিন্টিং, প্রেস, হায়দ্রাবাদ, ১৯৮৭

ড. আব্দুস সালাম সিদ্দিকী : *কৃষণ চন্দর কে নভেলোঁ কা তানকীদী মোতালেআ*, আঞ্জুমান-এ-তরক্কী উর্দু, দিল্লী , ২০০৪

কৃষণ চন্দর : *ঘোনট ম্যায় গুরী জলে*, ছাকী বুক ডিপো, দিল্লী, ১৯৫৩

শবনম পারভীন : *গজলিয়াত-এ-এহসান দানিশ*, আসগর পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০৬,

প্রফেসর ওয়াহাব আশরাফী : *রাজিন্দর সিং বেদী কী আফসানা নিগারী*, এডকেশনাল পাবলিশিং হাউস, দিল্লী, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

রাজিন্দর সিং বেদী : *গ্রহণ*, মাকতাবা-এ-উর্দু, লাহোর, ১৯৪২

ড. ওয়াসিম আনোয়ার : *কাইফি আজমী : সখছিয়্যাত*, *শায়েরী আউর আহাদ*, প্রাইম পাবলিশার, মধ্যপ্রদেশ, ২০০৫

ড. শাকিলা রাফত আলী : *কাইফি আজমী : ফিকর ওয়া ফন*, মে'য়ার পাবলিকেশন্স, দিল্লী, ২০০৫

কাইফি আজমী : *আখেরি শব*, কুতুব পাবলিশার্স লিমিটেড, মুম্বাই, ১৯৪৭

খালীক আনজুম : *গুলকারিয়ে ওয়াহশাত কা শায়ের মাজরুহ*, আঞ্জুমান-এ-তরক্কী উর্দু, দিল্লী, ২০০০,

তাজ সাঈদ (সম্পাদিত) : *কুল্লিয়াত-এ-মাজরুহ সুলতানপুরী*, আল-হামদ পাবলিকেশন্স, লাহোর, ২০০৩

ড. নাগমা পারভীন : *সাহির লুধিয়ানবি : হায়াত আওর কারনামে*, স্বরসতী প্রেস, এলাহাবাদ, ২০০৭

সাহির লুধিয়ানবী : *কুল্লিয়াত-এ-সাহির*, হুসামী বুক ডিপো, হায়দ্রাবাদ, ১৯৯৮

প্রফেসর ড. আব্দুল কাদের গিয়াসউদ্দীন ফারুকী : *আহমেদ ফরাজ : সখছিয়্যাত আউর শায়েরী*, বেলুষ্টার প্রিন্টার্স, বিজাপুর, ২০১৫

আহমেদ ফরাজ : *শব-এ-খুন*, জামেয়া ইমারাতু আরাবিয়্যাতু আলমুতাহাদ্দেত, ১৯৮৭

গোলাম মোস্তফা : *বঙ্গভঙ্গ ও তৎকাল*, *সন্দেশ*, *ঢাকা*, *২০০৫*

ড. শান্তনু মজুমদার (সম্পাদনায়) : *পৌরনীতি ও সুশাসন (দ্বিতীয় পাঠ)*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭,

প্রফেসর হাসান আলী চৌধুরী : *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৬

শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড)*, দিব্য প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০২১,

প্রফেসর ড. আশফাক হোসেন (সম্পাদনায়) : *উপমহাদেশের ইতিহাস (১৫২৬-১৯৭১)*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয,

প্রফেসর হাসান আলী চৌধুরী : *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৬

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী (সম্পাদনায়) : *উপমহাদেশ ও বাংলার ইতিহাস (১৫২৬-১৯৪৭)*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২

ড. তারেক শামসুর রহমান (সম্পাদনা) : *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪

মো: ইনসান আলী গাজী : *পৌরবিজ্ঞানের আলো*, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯০

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী (সম্পাদনায়) : *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস (১৭৯৫-১৯৯১)*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫

প্রফেসর এস ঘোষ : *আধুনিক ভারতের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭) দ্বিতীয় খন্ড*, ঊষা পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা, প্রকাশের সন উল্লেখ নেই

Dhaka University Institutional Repository

মো: শাহজাহান মিয়া ও মো: দেলোয়ার হোসেন খান : *বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০১৯

ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন ও ড. শান্তনু মজুমদার (সম্পাদনায়) : *বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই, ২০১৭

রণেশ দাশগুপ্ত : *ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা*, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, জুলাই, ১৯৬৯

প্রফেসর সৈয়দ শফীক্ব আহমদ আশরাফী : *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : আফকার ওয়া ইকরার*, নিউ পাবলিক প্রেস, দিল্লী, ১৯৯৩

আলে আহমদ সুরুর : *তানকীদী ইশারে*, নিশাত পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ১৯৭৮

ফিরাক গোরকপুরী : *উর্দু শায়েরী কা মেযাজ*, এলাহাবাদ, ১৯৬৫, পৃ.- ৩১২

মজনু গোরকপুরী : *তানকীদ ওয়া নযর*, কাওমী কাউন্সিল, ১৯৬৯

ওয়াছী আহমদ সিন্দীলবী : *ইনকিলাবী শায়ের ফয়েজ আহমদ ফয়েজ*, নাছিম বুক ডিপো, লক্ষ্ণৌ, ১৯৭৭

জাফর আলম (অনুবাদ ও সম্পাদনা): *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ*, ফেব্রুয়ারি, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ২০১৫,

ড. নুসরাত চৌধুরী : *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ (রেওয়ায়াত আউর ইনফেরাদিয়্যাত)*, সিমান্ত প্রকাশন, দিল্লী, ১৯৯৫

ড. তওসিফ আহমদ বাট : *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : আসরে জাদীদ কা মকবুল শায়ের*, উর্দু বিসার্চ জার্নাল,দিল্লী, অক্টোবর সংখ্যা, ২০২০

সুম্বুল নিগার : *উর্দু শায়েরী কা তানকীদী মুতালেআ*, এডুকেশনাল বুক হাউস, আলীগড়, ১৯৯৫

আসমা ফারুকী (অনুবাদক) : *ফয়েজ : হায়াত আউর তাখলীকাত*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭,

উজিরে আগা : *নযম-এ-জাদীদ কী কারওয়াটি*, এডুকেশনাল বুক হাউস, আলীগড়, ২০০০,

মির্জা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব : *দিওয়ান-এ-গালিব*, এডুকেশনাল বুক হাউস, আলীগড়, ১৯৯৫

রণেশ দাশগুপ্ত : *ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা*, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, জুলাই, ১৯৬৯

ড. আকীল আব্বাস জাফরী : *ফয়েজ কী কিতাব জিস সে উর্দু ম্যায় নয়ী রেওয়ায়াত কা আগায হুয়া*, ইন্ডিপেন্ডেন্ট উর্দু, ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০২২

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : দাস্ত-এ-সাবা, আযাদ কিতাব ঘর, দিল্লী, ১৯৫৩

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : *জিন্দান-নামা*, কবির বুক ডিপো, দিল্লী

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : *দাস্ত-এ-তাহ-এ-সঙ্গ*, ইদারা-এ-ফুরুগ-এ-আদব, দিল্লী, সন উল্লেখ নেই

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : *সার ওয়াদি-এ-সিনা*, কিতাবী দুনিয়া, লক্ষ্ণৌ, সন উল্লেখ নেই

Dhaka University Institutional Repository

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : *শাম-এ-শহরয়ারাঁ*, মাকতাবা-এ জামেয়া লিমিটেড, দিল্লী, ১৯৭৮

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : *মেরে দিল মেরে মুসাফির*, শাহিন বুক সেন্টার, দিল্লী, ১৯৮২

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : *হরফ হরফ*, কিতাবকার পাবলিকেশন্স, রামপুর, ১৯৬৫

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : *মীযান*, উর্দু একাডেমি সিন্দ, করাচি, ১৯৬০

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : *দামান-এ-ইউসুফ*, আঞ্জুমান-এ-তরক্কী উর্দু, দিল্লী, ১৯৮৯

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : *নকশ-এ-ফরিয়াদী*, উর্দু ঘর, দিল্লী, ১৯৪১

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : *মাহ ওয়া সাল আশনায়ী*, দারুল ইশাআত-এ-তরক্কী, মস্কো

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : *নুসখাহা-এ-ওয়াফা*, এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউস, দিল্লী. ১৯৯২

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : *কালাম-এ-ফয়েজ*, এডুকেশনাল বুক হাউস, আলীগড়, ২০১১

খালীক আনজুম : *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : তানকীদী জায়েযা*, আঞ্জমান-এ-তরক্কী উর্দু, দিল্লী, ১৯৮৫

আবদুল মান্নান : *ফয়েজ কী নছর (ফয়েজ শিনাছী)*, মাগরিবী বাঙ্গাল উর্দু একাডেমি, কোলকাতা, ১৯৯০

ড. ফারজানা আসলাম, ড. আবু বকর রিজভী (সম্পাদনায়): *মুআছের-এ-উর্দু আউর ফয়েজ আহমদ ফয়েজ*, এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউস, ২০১৪

মির্জা জাফরুল হাসান (সম্পাদনায়) : *মাতায়ে লওহে কলম*, মাকতাবা-এ-দানিয়াল, করাচি, ১৯৭৩

বেলালআহমদ দার : *ফয়েজ কা নছরী আছলুব 'মাহ ওয়া সাল আশনায়ী' কে হাওয়ালে ছে*,উর্দু রিসার্চ জার্নাল,২০১৬

ড. আওরঙ্গজেব নিয়াজী : *পাকিস্তান ম্যায় উর্দু তানকীদ*, বেকান বকস, মুলতান, ২০১৫

ড. শফিক আশরাফি : *ফয়েজ বেহায়ছিয়্যাত-এ-নাক্কাদ*, নুসরাত পাবলিশার্স, লক্ষ্ণৌ, ১৯৯৩

ড. এরতেজা করিম : *ফয়েজ কা তানকীদী রোয়া-এ-মওজুআত*, রহমান পাবলিকেশন্স, এলাহাবাদ,২০০৯

গৌতম রায় : *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ : কাল থেকে কালান্তরে অভিযাত্রা*, *inscrit.me* (ডিজিটাল প্লাটফরম), ফেব্রুয়ারি, ২০২২

প্রফেসর সৈয়দ শফীক আহমদ আশরাফী : *ফয়েজ আহমদ ফয়েজ কী ছিয়াছী শায়েরী*, উর্দু বিসার্চ জার্নাল,মার্চ,২০১৭

Kiernan, Victor G. : *Poems by Faiz*. London: George Allen & Unwin, 1971,

Surendranath Banerjea : *A Nation in Making* , Oxford University Press, Calcutta, 1925,

Russell, Ralph. : *The Pursuit of Urdu Literature*. London: Zed Books, 1992

Dhaka University Institutional Repository

Ahmad, Aijaz : *In theory: Classes, Nations, Literatures*. London : Verso, 1992

Said, Edward W. : *Culture and Imperialism*. New York: Vintage Books, 1993

Justice Syed Shameem Husain Kadri : *Creation of Pakistan,* Army Book Club, 1983

Ahsan Ul Haq : *Faiz Ahmad Faiz: A Study of Resistance, Protest and Voice for Society in his Poetry,* Creative Forum, Vol-33, No.-1-2, Jan-Dec, 2020.

Ralph Russell : *Faiz Ahmed Faiz: Selected Poems*, Oxford University Press, 1992

Kyle Haddad-Fonda : *Afro-Asian Writer's Conferences (1958-1979),*BlackPast.org Washington, USA, August, 2017

Amir Suhail Wani : *Remembering Faiz Ahmad Faiz and His poetry of Passion*, Janata Weekly, India, March, 2025.

Fatima Shahzad : *Faiz in Cuba : a revolutionary poet's accout: and why it still matters,* Peoples Dispatch (an international media outlet), March , 2026.

Rajat Singh : *Why We Need Revolutionary Poet Faiz Ahmed Faiz More than Ever, Literary Hub*, December, 2016

Gopi Chand Narang : *The tradition and Innovation in the Poetry of Faiz ,* Indian Literature, Vol. 28, No. 2 (March-April, 1985)

Nikola Benin : *Faiz Ahmad Faiz's poetry,* Research Gate, February, 2020

পত্র-পত্রিকা

আফকার (উর্দু পত্রিকা) : জোশ সংখ্যা, বর্ষ-১৭, সংখ্যা-১২২-১২৩,

আজকাল (উর্দু পত্রিকা) : কৃষণ চন্দর সংখ্যা, সংখ্যা-৪, মাস- নভেম্বর, সাল- ২০১৪

ফন আওর সখছিয়্যাত (উর্দু পত্রিকা) : সাহির লুধিয়ানবী সংখ্যা, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫

ডন (ইংরেজি পত্রিকা) : প্রকাশকাল- অক্টোবর, ২০০৪

সঙ্গত (উর্দু পত্রিকা) : কোয়েটা, মে, ২০২১